লাস্ট থ্রি মিনিটস

মূল: পল ডেভিস

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ মো. শহীদুল্লাহ শাহীন ভাই

যিনি সবসময় স্নেহের বাঁধনে আটকে রেখেছেন আমাকে

ভূমিকা (মূল লেখক)

১৯৬০ এর দশকের শুরুর দিকের কথা। আমি ছাত্র তখন। মহাবিশ্বের শুরুর রহস্য জানার অপরিসীম কৌতূহল সবার চোখে-মুখে। বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম সেই ১৯২০ এর দশকে হলেও একে গুরুত্বের সাথে নেওয়া শুরু ১৯৫০ এর দশকের পরে। সবাই এর সাথে পরিচিত থাকলেও তত্ত্বটি তখনও তেমন কোনো আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ওদিকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছে স্থির অবস্থা তত্ত্ব (steady-state theory)। মহাবিশ্বের কোনো শুরু থাকতে পারে সে সম্ভাবনাই এটি নাকচ করে দিয়েছে। বিভিন্ন মহলের কাছে এটি তখনও সবচেয়ে গহণযোগ্য তত্ত্ব। এরপর ১৯৬৫ সালে এল রবার্ট পেনজিয়াস ও আর্নো উইলসনের আবিষ্কার এল। মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে গেল। পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো, একটি উত্তপ্ত, উন্মত্ত ও আকস্মিক অবস্থা থেকে শুরু মহাবিশ্বের।

কসমোলজিস্টরা এই আবিষ্কারের ফলাফল বের করতে উঠেপড়ে লাগলেন। বিগ ব্যাংয়ের ১০ লাখ বছর পরে মহাবিশ্ব কতটা উত্তপ্ত ছিল? এক বছর পর? এক সেকেন্ড পর? সেই প্রারম্ভিক চুল্লিতে কোন ধরনের ভৌত প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল? সৃষ্টির শুরর কোনো ধ্বংসাবশেষ বাকি আছে কি? যা থেকে জানা যাবে সেই সময়ের চরম অবস্থার খবর।

আমার ভালোমতো মনে আছে, ১৯৬৮ সালে একটি লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। সবশেষে অধ্যাপক পটভূমি তাপ বিকিরণের (cosmic background heat radiation) আবিষ্কারের আলোকে বিগ ব্যাং নিয়ে কথা বললেন। হাসিমুখে বললেন, “বিগ ব্যাং এর পরের প্রথম

তিন মিনিটে সংঘটিত নিউক্লিয় প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কিছু তাত্ত্বিক মহাবিশ্বের রাসায়নিক উপাদানের বিবরণ দিয়েছেন।" দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়লেন। মহাবিশ্বের জন্মের মাত্র সামান্য সময় পরের অবস্থার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা কতই না হাস্যকর! এমনকি সপ্তদশ শতকের যাজক জেমস উশারও এমন দুঃসাহস করেননি। অথচ তিনিই কিন্তু বাইবেলের ক্রমানুপুঞ্জির ওপর ভিত্তি করে দাবি করেছিলেন, ৪০০৪ খৃষ্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের। প্রথম তিন মিনিটের ঘটনা প্রবাহের নিখুঁত বর্ণনা কিন্তু তিনিও দিতে চেষ্টা করেননি।

কিন্তু মহাজাগতিক তাপ বিকিরণ আবিষ্কারের মাত্র এক দশকের মধ্যেই পাল্টে গেল বিজ্ঞানের গতি । প্রথম তিন মিনিট ছাত্রদেরও মনোযোগ কেড়ে নিল। বই লেখা হতে লাগল। ১৯৭৭ সালে অ্যামেরিকান পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্ট স্টিভেন উইনবার্গ লিখলেন একটি বেস্ট সেলার বই। শিরোনাম দ্য *ফার্স্ট থ্রি মিনিটস* বা প্রথম তিন মিনিট। জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রকাশনার জগতে এটি নতুন ধারার প্রবর্তন করে। লেখক বিশ্ববিখ্যাত একজন পণ্ডিত। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের প্রক্রিয়াগুলো সাধারণ পাঠকের জন্যে লিখেছেন বিস্তারিত ও বোধগম্য করে।

এক দিকে উত্তেজক আবিষ্কারগুলো সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করেছেন। ওদিকে বিজ্ঞানীরাও বসে নেই। আগ্রহের বিষয় গেল পাল্টে। এক সময় আগ্রহের বিষয় ছিল মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার খোঁজ জানা। মানে জন্মের প্রায় কয়েক মিনিট পরের কথা। আর এখন আগ্রহের বিষয় হয়ে গেলে তারও অনেক আগের খবর। জন্মের এক সেকেন্ডের প্রায় অসীম ভগ্নাংশ সময় পরের অবস্থা। তার প্রায় এক দশক পরে ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং লিখলেন অ্যা *ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম।* এক সেকেন্ডের দশ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে কী ঘটেছিল তাও বললেন তিনি। ১৯৬৮ সালের সেই লেকচারের শেষ হাসিটুকই আজ হাস্যকর হয়ে গেছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব এখন বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে ফেলেছে। ফলে এখন বেশি চিন্তা-ভাবনা চলছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যত নিয়ে। মহাবিশ্বের শুরুর খবর আমরা ভালোই জানি। কিন্তু এর পরিণতি কেমন হবে? এর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে কী বলা যায়? শেষও কি হবে ব্যাং (বিস্ফোরণ) বা আর্তনাদের মাধ্যমে? বা আদৌ কি এর শেষ আছে? আমাদেরই বা কী হবে? আমরা বা আমাদের পরের প্রজন্ম কি চিরকাল টিকে থাকবে? যদিওবা সেটা হয় রক্ত-মাংসের গড়া বা রোবোটিক শরীর।

বিষয়গুলো নিয়ে কৌতূহলী না হয়েও উপায় নেই। যদিও পৃথিবীর শেষ এখনও দূরে আছে বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানে মানব-সৃষ্ট নানা সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীতে আগে আমরা নিছক পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে চিন্তা করতাম। এখন ঘুরে গেছে সে চিন্তার মোড়। আমাদেরকে এখন আমাদের অস্তিতের মহাজাগতিক দিক নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। দ্য *লাস্ট থ্রি মিনিটস* বইয়ে বলব ভবিষ্যত মহাবিশ্বের গল্প। বিখ্যাত কিছু পদার্থবিদ ও কসমোলজিস্টদের সর্বশেষ চিন্তার আলোকে সবচেয়ে সেরা অনুমানটুকুই আমরা তুলে ধরব। এটা কল্পনানির্ভর হবে না। সত্যি বলতে, ভবিষ্যতে নজিরবিহীন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যেটা একবার অস্তিত্বে আসতে পারে, সেটা অস্তিত্ব হারাতেও পারে।

এ বইটি সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা। বিজ্ঞান বা গণিতের কোনো পূর্ব জ্ঞান না থাকলেও চলবে। তবে, মাঝেমাঝেই আমাকে অনেক বড় বা অনেক ছোট সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে হবে। এ ক্ষেত্রে ১০ এর ঘাত (পাওয়ার) ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। যেমন, দশ হাজার কোটিকে লিখতে গেলে ১০০,০০০,০০০,০০০ লিখতে হয়। এটা অসুবিধাজনক। এখানে ১ এর পরে ১১টি শূন্য আছে। ফলে, আমরা একে $১০^{১১}$ বা ১০ এর ১১তম ঘাত আকারে লিখতে পারি। একইভাবে দশ লক্ষ হলো ১০৬, এক লক্ষ কোটি হলো $১০^{১২}$ ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, এই প্রতীকের মাধ্যমে সংখ্যাগুলোর বৃদ্ধির হার সরাসরি বোঝা কঠিন। $১০^{১২}$ সংখ্যাটি $১০^{১০}$ এর একশ গুণ। প্রায় একই মনে হলেও পার্থক্যটা কিন্তু বিশাল। ১০ এর পাওয়ার ঋণাত্মক বসিয়ে আবার খুব ছোট সংখ্যাদেরকেও প্রকাশ করা যায়। যেমন, একশ কোটির এক ভাগ বা ১/১,০০০,০০০,০০০ কে $১০^{-৯}$ (টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন) লেখা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের হরে ১ এর পরে ৯টি শূন্য আছে।

শেষমেশ পাঠককে একটা কথা বলে রাখি। স্বাভাবিকভাবেই বইটির অনেকটাই অনুমান নির্ভর। হ্যাঁ, বইয়ের অধিকাংশ কথাই বর্তমান বিজ্ঞানের সেরা তথ্যের আলোকেই বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও ভবিষ্যদের পূর্বাভাস অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমান মর্যাদা পেতে পারে না। তবুও মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে অনুমান করার লোভ সামলানো সম্ভব নয়। এই খোলা মনের আলোকেই বইটি লেখা। বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথাগুলো মোটামুটি স্বীকৃত যে বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে, এখন এটি শীতল ও প্রসারিত হতে হতে বিপরীত ধর্মের কোনো চূড়ান্ত অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অথবা হয়ত উন্মত্তভাবে সংকুচিত হয়ে যাবে। তবে যে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাতে কোন ভৌত প্রক্রিয়া যে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে তা খুব বেশি নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। সাধারণ নক্ষত্রের পরিণতি সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাক হোলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু যদি মহাবিশ্ব আরও লক্ষ কোটি বছর বা তারও বেশি সময় টিকে থাকে, তাহলে এতে এমন কোনো সূক্ষ্ম ভৌত প্রতিক্রিয়া ঘটতেও পারে, যা সম্পর্কে আমাদের অনুমান করা ছাড়া কিছু করার নেই। এক সময় হয়ত সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিন্তু অসম্পূর্ণ। ফলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি জানার চেষ্টা ও অনুমান করার উপায় আছে একটিই। আমাদের

হাতে যেসব তত্ত্ব আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই যুক্তিভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। কিন্তু এতেও সমস্যা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি বিষয়ক অনেকগুলো তত্ত্বেরই এখন পর্যন্ত প্রায়োগিক পরীক্ষা হয়নি। এমন কিছু বিষয়েও আলোচনা করেছি যেগুলো নিয়ে তাত্ত্বিকরা খুব আশাবাদী, কিন্তু এখনও তার প্রমাণ মেলেনি। যেমন, মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমন[১], প্রোটন ক্ষয় (p r o t o n d e c a y) ও ব্ল্যাক হোল রেডিয়্যান্স। আবার একইভাবে এমন কোনো ভৌত প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই থাকবে যা আমরা এখন একেবারেই জানি না। হয়ত সেটা এ বইয়ের কথাগুলোকে বহুলাংশে পাল্টে দেবে।

মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাব্য কার্যক্রমের কথা ভাবলে এই অনিশ্চয়তাই আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। এবারে আমরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনির জগতে প্রবেশ করে ফেলেছি। তবুও এমনটাতো হতেই পারে যে কালের আবর্তনে এক সময় জীবিত প্রাণীরা ভৌত সিস্টেমের আচরণ ক্রমেই বড় পরিসরে উল্লেখযোগ্য রকম পরিবর্তন করে ফেলল। মহাবিশ্বের প্রাণ সম্পর্কেও আমি আলোচনা করেছি। কারণ, অনেক পাঠক মহাবিশ্বের পরিণতি জানতে চান মূলত মানুষ বা তার পরবর্তী প্রজন্মের পরিণতি জানার জন্যেই। তবে মনে রাখতে হবে মানুষের চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সঠিক করে কিছুই জানেন না। এটাও জানা নেই যে দূর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে চেতনার মধ্যে কোন কোন গুণাবলীগুলো থাকা প্রয়োজন।

বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহায়ক আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্যে কয়েকজন মানুষকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এঁরা হলেন জন ব্যারো, ফ্র্যাংক টিপলার, জ্যাসন টমলি, রজার পেনরোজ ও ডানকান স্টিল। সিরিজের সম্পাদক জেরি লিয়ন পাণ্ডুলিপি গুরুত্বের সাথে পড়ে দিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকেও ধন্যবাদ। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতে কাজ করার জন্যে স্যারা লিপিনকটকেও ধন্যবাদ।

অনুবাদকের নোট:

1. ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ তরঙ্গ পাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল আগের বছরের অক্টোবরেই। ফলে বইটির গুরুত্ব বাড়ল বলা চলে।

অনুবাদকের ভূমিকা

মহাবিশ্ব নিয়ে সবচেয়ে বড় দুটি প্রশ্নের একটি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। আরেকটি তো জানাই। মহাবিশ্বের অতীত। মানে কীভাবে জন্ম হয়েছিল মহাবিশ্বের। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর পেলেই পুরো মহাবিশ্বের ইতিহাস জানা হয়। মহাবিশ্বের অতীত নিয়ে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন উইনবার্গ লিখেছেন কালজয়ী বই দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস। এই বইটির নাম দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস। বলাই বাহুল্য, নামটি যথেষ্ট সার্থক হয়েছে। দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস বইটি নব্বইয়ের দশকে লেখা। বর্তমান সময়ের আলোকে তাই একে কিছুটা সেকেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।
বইটি লেখার পরে কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটেছে জ্যোতির্বিদ্যায়। বইটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক একটি আবিষ্কার হলো ১৯৯৮ সালের মহাবিশ্বের ত্বরিত প্রসারণ। এর মাধ্যমে জানা গেল, দূরের ছায়াপথরা কোনো পর্যবেক্ষক থেকে যত দূরে সরছে ততই তাদের দূরে সরার বেগ বাড়ছে।
এ আবিষ্কারের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণায় কিছু পরিবর্তন আসে। এর ফলে বইয়ের অল্প কিছু তথ্য আপাতদৃষ্টিতে সেকেলে হয়ে গেছে। তবে পুরোপুরি সেকেলে হয়নি। বইটির শেষের দিকে মহাসঙ্কোচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান জ্ঞান বলছে, মহাবিশ্ব আবার গুটিয়ে যাবে সে সম্ভাবনা কম। তবে ঘটবেই না এমনটা বলা সম্ভব না। ফলে, বইটির ঐ আলোচনা অর্থহীন নয়। তাছাড়া মহাসঙ্কোচন একেবারে বাতিল হয়ে গেলেও এর সম্ভাব্য কৌশল ও ফলাফল কী হবে সেটা নিয়ে বইটির আলোচনা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

বইটির আলোচ্য বিষয়কে যুগোপযোগী করে তুলতে বইটির পরিশিষ্ট অংশে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতিগুলো বিষয়ক একটি লেখা যুক্ত করেছি। যুক্ত করেছি বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে একটি অংশও। বিজ্ঞানের সঠিক রূপ সম্পর্কে আমাদের দেশে ভুল ধারণা সঠিক ধারণার চেয়ে বেশি দেখা যায়। এ কারণে আমরা অনেকসময় নানান বিষয় নিয়ে অহেতুক তর্কে জড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার অংশ হয়ে পড়ি।

অত্যন্ত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। যেকোনো ধরনের ত্রুটি চোখে পড়লে ইমেইলের মাধ্যমে আমাকে জানালে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। কোনো পরামর্শ থাকলেও জানানোর অনুরোধ রইল।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে সহধর্মিনী সালমা সিদ্দিকার অকৃত্রিম উৎসাহ ও পরমার্শের জন্য তাঁদের সবার প্রতি ঐকান্তিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বরাবরের মতোই বইটি প্রকাশে বিজ্ঞানচিন্তার বাসার ভাই ও রনির ভাইয়ের ক্রমাগত ও নিঃসার্থ উৎসাহ দেওয়ার কথা আজীবন মনে থাকবে। এজন্য তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বইটির প্রকাশ করার জন্যে প্রথমা প্রকাশনের প্রকাশক ও প্রকাশনার সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত সবার প্রতিও অপরিসিম কৃতজ্ঞতা।

মাহমুদ
০৮ অক্টোবর, ২০২০
পাবনা ক্যাডেট কলেজ

প্রথম অধ্যায়

মহাপ্রলয়

তারিখ: ২১ আগস্ট, ২১২৬। মহাপ্রলয়

স্থান: পৃথিবী।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে হতাশায় আচ্ছন্ন অনেকগুলো মানুষ লুকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। কোটি কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ পালিয়েছে ভূমির গভীরে। আশ্রয় নিয়েছে গুহা বা খনির দেয়ালে। কেউ আবার সাবমেরিনে চেপে সাগরে ডুব দিয়েছে। কেউ কেউ বেপরোভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। তবে অধিকাংশ মানুষই হতবুদ্ধি ও বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে শেষ পরণতির জন্যে।

আকাশের অনেক উঁচুতে আলোর একটি বড় রেখা দেখা যাচ্ছে। শুরুতে শুধু দেখা গিয়েছিল হালকা ধোঁয়ার মৃদু বিকিরণ। একদিন সেটাই মহাশূন্যের বুকে গড়ে তুলল ফুটন্ত গ্যাসের প্রচণ্ড ঘুর্ণি। গ্যাসের ওপরের দিকে একটি কালো, কুৎসিত ও ভয়ানক জিনিস দেখা যাচ্ছে। ধূমকেতুটির ক্ষুদ্র মাথা দেখে এর ভয়ানক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আঁঁচ করা কঠিন। সেকেন্ডে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে এটি ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। প্রতি সেকেন্ডে দশ মাইল। লক্ষ কোটি টন বরফ ও পাথর শব্দের সত্তর গুণ বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত।

দেখা ও অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের করার কিছুই নেই। অনিবার্য পরিণতির মুখে পড়ে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন। নিরবে বন্ধ করে দিয়েছেন কম্পিউটার। দূর্যোগের সঠিক আচরণ এখনও সঠিকভাবে বোঝ যাচ্ছে না। যেটুকু জানা গেছে, সেটাই এত ভয়াবহ যে তা সাধারণ মানুষকে জানানো ঠিক হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী টিকে থাকার কিছু পূর্ণাঙ্গ কৌশল তৈরি করেছেন। নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার ইচ্ছে তাদের। কেউ কেউ দূর্যোগটিকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণের চেষ্টারত। শেষ দিনটি পর্যন্তও তাঁরা তাঁদের সত্যিকার বিজ্ঞানীসুলভ আচরণ বজায় রাখতে চাচ্ছেন। পৃথিবীর গভীরে রাখা টাইম ক্যাপসুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সে উপাত্ত। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যত্ বংশধররা যাতে সেটা কাজে লাগাতে পারেন।

সংঘর্ষের মুহূর্ত আরও ঘনিয়ে এল। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। শেষ তিনটি মিনিট।

গ্রাইন্ড জিরোর ঠিক ওপরে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার ঘন মাইল পরিমাণ বায়ু ছুটে গেল একদিকে। একটি শহরের আকারের চেয়েও বেশি পরিমাণ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। পনের সেকেন্ড পরেই আঘাত হানল ভূপৃষ্ঠে। দশ হাজার ভূমিকম্পের সমান আঘাতে কেঁপে ওঠল পৃথিবী। স্থানান্তরিত বাতাসের শক ওয়েভ উড়ে যাচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে। ভেঙে পড়ল স্থাপনাগুলো। যেটাই সামনে পড়ল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সংঘর্ষের স্থানের চারপাশে সমতল ভূমিতে একটি বৃত্তাকার তরল পাহাড় তৈরি হলো। উচ্চতা কয়েক মাইল। একশো মিটার চওড়া গর্ত দিয়ে পৃথিবীর ভেতরের বস্তু বেরিয়ে আসছে। গলিত পাথরের দেয়াল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এ তীব্র আঘাতের সামনে ভূপৃষ্ঠ যেন সামান্য একটি কম্বল।

গর্তের ভেতরের লক্ষ কোটি টন পাথর বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ছিটকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছু কিছু চলে যাচ্ছে মহাকাশের দিকেও। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অর্ধ-মহাদেশ এলাকা জুড়ে। এরপর পতিত হচ্ছে শত শত, এমনকি হাজার হাজার মাইল দূরের এলাকায়। যেখানেই তা পড়ছে, ঘটাচ্ছে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ। কিছু কিছু নিক্ষিপ্ত পদার্থ গিয়ে পড়ছে সাগরে। সেট থেকে শুরু হচ্ছে সুনামি। ফলে দূর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। ধুলোময় ধ্বংসাবশেষের একটি বড় অংশ বায়ুমণ্ডলে উঠে গেল। সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সূর্যের আলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না পৃথিবীর কোথাও থেকেই। তার বদলে দেখা যাচ্ছে শত কোটি উল্কার পৈশাচিক ঝলকানি। তীব্র উত্তাপ পাঠিয়ে এরা ঝলসে দিচ্ছে মাটির পৃথিবী। কারণ বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলো মহাশূন্য থেকে ফের ফিরে আসছে বায়মণ্ডলে।

উপরের দৃশ্যপটটি একটি অনুমান। সুইফট টাটল (Swi f t -Tut t l e) নামের একটি ধূমকেতু ২১২৬ সালের ২১ আগস্ট তারিখে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। যদি সেটাই ঘটে, বৈশ্বিক দূর্যোগ অবধারিত। ইতি ঘটবে মানুষেরও। ১৯৯৩ সালে একে দেখার পরে হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল ২১২৬ সালে আসলেও একটি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে। পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, এটি এক সপ্তাহের জন্যে পৃথিবীকে মিস করবে। অল্পের জন্য বাঁচা। আমরা এর দিক থেকে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারি। তবে বিপদ যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। আজ হোক, কাল হোক, সুইফট টাটল বা এরই মতো কেউ পৃথিবীতে আঘাত হানবেই। হিসেব করে দেখা গেছে, অর্ধ-কিলোমিটার বা তারও বেশি চওড়া দশ হাজার বস্তুর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ওপর দিয়ে গেছে। বিশাল বিশাল এই উপদ্রপগুলোর জন্ম সৌরজগতের বহিঃস্থ শীতল এলাকায়। কিছু কিছু হলো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ। আটকা পড়ে আছে গ্রহদের মহাকর্ষীয় বাঁধনে। অন্যদের উৎপত্তি গ্রহাণু বেষ্টনীতে (a s t e r o i d b e l t)। জায়গাটা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে। কক্ষপথের ভারসাম্যহীনতার কারণে এরা নিয়মিত সৌরজগতে আসা-যাওয়া করছে। আকারে ছোট হলেও এদের প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর। পৃথিবী ও অন্য গ্রহদের স্থায়ী বিপদের কারণ।

এ বস্তুগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পৃথিবীর সবগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চেয়েও বেশি ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। যে-কোনো সময় কোনো একটি আঘাত হানতে পারে। সেটা মানুষের জন্যে একটি খারাপ খবরই হবে। সেটা হবে মানব ইতিহাসের একটি আকস্মিক ও নজিরবিহীন প্রতিবন্ধক। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা মোটামুটি নিয়ম মেনে চলে। ধূমকেতু বা গ্রহাণুর এ মাত্রার সংঘর্ষ গড়ে কয়েক মিলিয়ন[১] বছরে একবার ঘটে। অনেকের বিশ্বাস, এ ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার ফলেই সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরের বার হয়ত আমাদের পালা।

অনেক ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষেরা অ্যারমাগেডন[২] দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। বাইবেলের বুক *অব রিভিলেশন* পুস্তকে এ যুদ্ধে সংঘটিত হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির ভালো একটি বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা এ রকম:

> এরপর এল বিদ্যুত চমক, বজ্রধ্বনি ও গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। সাথে একটি তীব্র ভূমিকম্প। মানুষ পৃথিবীতে পা ফেলার পরে এত বড় ভূমিকম্প আর কখনও আর ঘটেনি। এটা এতই তীব্র ছিল। বিভিন্ন দেশের শহরগুলো ভেঙে পড়ল। দ্বীপগুলো হারিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে না পাহাড়গুলোও। আকাশ থেকে এক একটি একশো পাউন্ড[৩] ওজোনোর শিলাবৃষ্টি পড়ল মানুষের মাথা ওপর। শিলাবৃষ্টির প্রকোপে মানুষ ঈশ্বরকে গালাগাল করতে লাগল। প্রকোপটা আসলেই ভয়াবহ ছিল।

অবশ্যই পৃথিবী আরও নানা রকম প্রতিকূল ঘটনার শিকার হতে পারে। বিপুল পরিমাণ বলের বাঁধনে পরিব্যপ্ত মহাবিশ্বে পুঁচকে একটি বস্তু এই পৃথিবী। এত কিছুর পরেও অন্তত সাড়ে তিন শ কোটি বছর ধরে আমাদের গ্রহটি প্রাণ ধারণের উপযোগী হিসেবেই আছে। তবে গ্রহটিতে আমাদের সাফল্যের পেছনে রহস্য কিন্তু মহাকাশই। সেটা অনেকভাবেই। বিশাল শূন্যতার মহাসাগরে আমাদের সৌরজগত ক্ষুদ্র একটি সক্রিয় অঞ্চল। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের (সূর্যের পরে) অবস্থান চার আলোকবর্ষ[৪] দূরে। এই দূরত্ব কত বেশি সেটা বুঝতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সূর্য থেকে মাত্র সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে আলো নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পথ পেরিয়ে আসে। চার বছরে তো অতিক্রম করে ২০ ট্রিলিয়ন (২০ লক্ষ কোটি) মাইলেরও বেশি পথ।

সূর্য একটি আদর্শ বামন নক্ষত্র। অবস্থান আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের (Mi l ky Way gal axy) একটি আদর্শ অঞ্চলে। এ ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। কারও ভর সূর্যের কয়েক শতাংশ। কারও কারও ভর আবার সূর্যের এক শ গুণ। এরা ধীরে ধীরে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। ঘুরছে ছায়াপথে থাকা প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় মেঘ ও ধুলো, অজানা সংখ্যক ধূমকেতু ও গ্রহাণু, গ্রহ এবং কৃষ্ণগহ্বরও। এই বিপুল পরিমাণ বস্তুর উপস্থিতির কথা শুনে মনে হতে পারে, ছায়াপথটি বুঝি বিভিন্ন বস্তু দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। এ ধারণা ভুল। আসলে, ছায়াপথটির দৃশ্যমান অংশ প্রায় এক লাখ আলোকবর্ষ পরিমাণ চওড়া। আকৃতি হলো থালার মতো। কেন্দ্রীয় অংশটা একটু স্ফীত। একে ঘিরে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি সর্পিল বাহু। বাহুগলো গড়া নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা। এমনই একটি সর্পিল বাহুতে রয়েছে আমাদের সূর্য। কেন্দ্র থেকে এটি আছে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

আমরা যতদূর জানি, আকাশগঙ্গা ছায়াপথে খুব ব্যতিক্রমধর্মী কিছুই নেই। একই রকম আরেকটি ছায়াপথ হলো অ্যান্ড্রোমিডা। এটি আছে আমাদের থেকে বিশ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। আকাশের অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলের দিকে এর অবস্থান[৫]। খালি চোখে একে ঝাপসা ছোপ ছোপ আলোর মতো মনে হয়। বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র সাজিয়ে রেখেছে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্ব। কোনোটি সর্পিল, কোনোটি উপবৃত্তাকার, কোনোটি আবার নির্দিষ্ট আকারহীন। দূরত্বের মাপাকাঠি এখানে বিশাল। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথও আলাদাভাবে দেখা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছতেই পৃথিবীর বয়সের (সাড়ে চারশো কোটি বছর) চেয়ে বেশি সময় লেগে গেছে।

এই বিশাল ফাঁকা স্থানের উপস্থিতির অর্থ হলো মহাকাশে সংঘর্ষের ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে আছে এর আশেপাশেই। গ্রহাণুদের কক্ষপথ সাধারণত পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে না। এদের বড় অংশই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণু বেষ্টনীতেই

থাকে সব সময়। তবে বৃহস্পতির বিপুল ভর গ্রহাণুদেরকে কক্ষপথ থেকে ছিটকে দিতে পারে। ফলে এদের কোনো কোনোটি সূর্যের দিকে চলে আসে। ডেকে আনে পৃথিবীর বিপদ।

আরেকটি বিপদ হলো ধূমকেতু। মনে করা হয়, দর্শনীয় এ বস্তুগলোর উৎপত্তি সূর্য থেকে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরের একটি মেঘপুঞ্জে। এখানে দোষ বৃহস্পতির নয়। দায়ী বরং নিকটস্থ নক্ষত্ররা। ছায়াপথ স্থির বসে নেই। শুধু নক্ষত্রগুলোই ছায়াপথ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে না, ছায়াপথ নিজেও ধীরে ধীরে আবর্তন করছে। সূর্য তার সঙ্গী গ্রহদেরকে নিয়ে প্রায় ২০ কোটি বছরে ছায়াপথকে পুরো একবার ঘুরে আসে। এ যাত্রাপথে মুখোমুখি হতে হয় নানা রকম অভিজ্ঞতার। নিকটবর্তী নক্ষত্ররা ধূমকেতুর মেঘকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কিছু কিছু ধূমকেতু তখন ছিটকে আসবে সূর্যের দিকে। ধূমকেতুরা সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলে সূর্যের উত্তাপে এদের উদ্বায়ী পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সৌর বায়ুর ধাক্কায় একটি লম্বা প্রবাহ তৈরি হয়। এটাই ধূমকেতুর বিখ্যাত লেজ। সৌরজগতের ভেতরের দিকে চলে এলেও ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা খুব কম। ক্ষতি ধূমকেতুও করে। তবে তার দোষ কিন্তু পড়ে পথে দেখা হওয়া নক্ষত্রের ওপর। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে নক্ষত্রের মাঝের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

ছায়াপথের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরও কিছু বস্তু আমাদের দিকে চলে আসতে পারে। যেমন ছায়াপথে ভেসে চলা গ্যাসের বড় বড় মেঘপুঞ্জ। এরা অনেক চিকন হলেও সৌরবায়ুকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করতে পারে সূর্য থেকে আসা তাপের প্রবাহকে। অন্ধকার মহাশূন্যে আরও নানান ভয়নাক জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন, বিচ্ছিন্ন গ্রহ, নিউট্রন নক্ষত্র, বাদামী বামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি[৬]। এরাসহ আরও অনেকেই আমাদের অজান্তেই আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। সৌরজগতে ঘটে যেতে পারে টালমাটাল অবস্থা।

বিপদ আরও ভয়াবহও হতে পারে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, সূর্য হয়ত একটি দ্বি-তারা[৭] জগতের অংশ। আমাদের ছায়াপথের আরও বহু নক্ষত্রের অবস্থাই এমন। প্রস্তাবিত সূর্যের এই সঙ্গী তারাটির নাম নেমেসিস। তবে অস্তিত্ব থাকলেও এটা হবে অনেক বেশি অনুজ্জ্বল। দূরত্ব হবে অনেক বেশি। এজন্যই এখনও একে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে এর গতি ধীর হলেও মহাকর্ষের মাধ্যমে এটি উপস্থিতির জানান দিতে পারে। মাঝে মাঝে দূরের ধূমকেতুদের গতিপথ পাল্টে পাঠিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর দিকে। পরিণতিতে ঘটবে একের পর এক সাংঘাতিক সংঘর্ষ। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন যে নিয়মিত বিরতিতে বড় আকারের বাস্তুগত (e c o l o g i c a l) বিপর্যর ঘটে। এটা ঘটে প্রতি ৩০ লাখ বছর পরে একবার।

আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদরা জানলেন, সম্পূর্ণ ছায়াপথরাই সংঘর্ষ বাঁধাতে পারে। আকাশগঙ্গার সাথে আরেকটি ছায়াপথের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কেমন? এমন কিছু প্রমাণ অবশ্য আছেই। নক্ষত্রদের দ্রুত চলাচল দেখে বোঝা যায়, ইতোমধ্যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিকটস্থ ছায়াপথদের সাথে সংঘর্ষ করে নড়েচড়ে বসেছে। তবে নিকটস্থ দুটো ছায়াপথের সংঘর্ষ বাঁধলেই যে ছায়াপথ পরিবারের নক্ষত্রদেরও বিপর্যয় ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। ছায়াপথদের ঘনত্ব এত কম যে নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়েও এরা একে অন্যের সাথে মিশে যেতে পারে।

মহাপ্রলয়ের আলোচনা অধিকাংশ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁদের কাছে মহাপ্রলয় মানে আকস্মিক ও দৃষ্টিকাড়া উপায়ে পৃথিবীর মৃত্যু। তবে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যেই বিপদ কম। অনেকগুলো উপায়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন, বাস্তুসংস্থানের ক্রমানবনতি, জলবায়ু পরিবর্তন বা সূর্য থেকে আসা তাপের পরিমাণের একটুখানি তারতম্য। ভঙ্গুর পৃথিবীতে এগুলো আমাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে না ফেললেও আরাম-আয়েশের জীবনে ইতি অবশ্যই ঘটাবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার বা এমনকি লক্ষ লক্ষ বছরও লেগে যায়। আধুনিক প্রযক্তির সাহায্যে মানুষ হয়ত এগুলোকে প্রতিরোধও করতে পারবে। যেমন, নতুন করে ধীরে ধীরে বরফ যুগের সূচনা হতে থাকলেও আমাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটবে না। সেটা ঘটার আগে সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে আমাদের। ধরে নেওয়া যায় যে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে থাকবে। ফলে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে মানুষ বা তার বংশধররা ক্রমেই জগতের বড় কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। ঠেকাতে পারবে বড় বড় সব দূর্যোগও।

তাত্ত্বিকভাবে কি মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে? হয়ত পারে। কিন্তু আমরা দেখব, অমরত্ব অর্জন করা সোজা কথা নয়। হয়ত সেটা অসম্ভবই। মহাবিশ্ব নিজেই ভৌত সূত্রের অধীন। সূত্রগুলোই এর জীবনচক্র বেঁধে দিয়েছে: জন্ম, বিবর্তন এবং হয়ত মৃত্যু। নক্ষত্রের নিয়তির সাথে আমাদের নিয়তি অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে।

অনুবাদকের নোট:

1. এক মিলিয়ন সমান দশ লক্ষ

2. বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশ অনুসারে পৃথিবীর শেষের দিকে একটি বড় যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধের ময়দানের সত্যিকার বা প্রতীকি নাম হলো অ্যারমাগেডন।

3. এক পাউন্ড সমান ০.৪৫৩৬ কেজি। মানে, ১০০ পাউন্ড সমান প্রায় ৪৫ কেজি।

4. এক আলোকবর্ষ হলো আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্ব।

5. অ্যান্ড্রোমিডা একই সাথে একটি ছায়াপথ এবং একটি তারামণ্ডলের নাম। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্যে পুরো আকাশের দৃশ্যমান গোলককে ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রতিটিকে এক একটি তারামণ্ডল (c o n s t e l l a t i o n) বলে।

6. এদের পরিচয় ও পার্থক্য দেখুন পরিশিষ্ট অংশে।

7. বর্তমানে দ্বি-তারা বা ডাবল স্টার বলা হয় এমন দুটো তারাকে যাদেরকে পৃথিবী থেকে দেখতে খুব কাছাকাছি মনে হয়। বাস্তবে এরা নিজেদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও পৃথিবীর আকাশে কাছাকাছি অবস্থানে থাকতে পারে। আবার হতে পারে এরা একে অপর কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এদেরকে বাইনারি স্টার বা জোড়া তারা বলে। আলোচ্য অংশে দ্বি-তারা বলতে আসলে জোড়াতারাকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুমূর্ষু মহাবিশ্ব

১৮৫৬ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিদ হেরম্যান ভন হেলমহলজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে হতাশাজনক অনুমানটি করেন। হেলমহলজ বললেন, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। তাঁর এ অনুমানের ভিত্তি হলো তথাকথিত তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র। সূত্রটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে। উদ্দেশ্যে ছিল তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার (e f f i c i e n c y) সংজ্ঞা দেওয়া। অল্প দিনের মাথায়ই সূত্রটির বিশ্বজনীন গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেল। (অনেক সময় একে সহজ করে দ্য সেকেন্ড ল্য বা দ্বিতীয় সূত্রও বলা হয়)। প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক অর্থেই এর গুরুত্ব বিশ্বজনীন, তথা সমগ্র মহাবিশ জুড়ে।

সবচেয়ে সহজ কথায় দ্বিতীয় সূত্রের বক্তব্য হলো, তাপ প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুর দিকে। হ্যাঁ, ভৌত পরিবেশের একটি পরিষ্কার ও পরিচিত বৈশিষ্ট্য এটি। খাবার রান্না করতে গেলে বা গরিম কফি ঠাণ্ডা করতে গেলেই সূত্রটির দেখা পাই আমরা। উচ্চ তাপমাত্রার এলাকা থেকে তাপ নিম্ন তাপমাত্রার এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। এতে কোনো রহস্য নেই। পদার্থের অণুর জগতের কম্পনের মাধ্যমে তাপ নিজের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গ্যাসের মধ্যে (যেমন বায়ু) অণুরা এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি ও সংঘর্ষ করে। এমনকি কঠিন পদার্থের মধ্যেও পরমাণুরা প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। পদার্থের উষ্ণতা যত বেশি হবে, অণুর কম্পনের প্রাবল্যও তত বেশি হবে। ভিন্ন তাপমাত্রার দুটো বস্তুকে সংস্পর্শে আনা হলে উত্তপ্ত বস্তুটির অধিকতর প্রবল কম্পন অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা বস্তুটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

চিত্র ২.১

অ্যারো অব টাইম বা সময়ের তীর

বরফের গলন থেকে সময় প্রবাহের দিক সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাপ গরম পানি থেকে ঠাণ্ডা বরফের দিকে প্রবাহিত হয়। কোনো মুভিতে যদি ওপরের ছবির ঘটনাটি গ, খ, ক আকারে দেখানো হয়, তবে ভুলটি সহজেই সবার চোখে ধরা পড়বে। এনট্রপি নামে একটি রাশি এ অপ্রতিসাম্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বরফ গললে এর পরিমাণ বাড়ে।

তাপের প্রবাহ যেহেতু একমুখী, তাই প্রক্রিয়াটিতে সময়ের ভারসাম্য নেই। কোনো মুভিতে যদি দেখানো হয় ঠাণ্ডা বস্তু থেকে তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গরম বস্তুতে যাচ্ছে, সেটা খুবই হাস্যকর হবে। একই রকম হাস্যকর হবে নদীর পানি ঢালু বেয়ে উঠে যাচ্ছে বা বৃষ্টির ফোটা মেঘে গিয়ে জমা হচ্ছে দেখানোটা। ফলে আমরা তাপ প্রবাহের একটি মৌলিক দিকমুখিতা দেখতে পাচ্ছি। একে অনেক সময় অতীত থেকে

ভবিষ্যতের দিকে চিহ্নিত একটি তীরের মাধ্যমে দেখানো হয়। সময়ের এই 'তীর' তাপগতীয় প্রক্রিয়ার অপ্রত্যাগামী[১] আচরণ প্রকাশ করে। দেড়শ বছর ধরে বিষয়টি পদার্থবিজ্ঞানীদের অভিভূত করেছ চলেছে। (দেখুন চিত্র ২.১)

তাপগতিবিদ্যার অপ্রত্যাগামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্যে এনট্রপি রাশিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির স্বীকৃতি মেলে হেলমহলজ, রুডলপ ক্লসিয়াস ও লর্ড কেলভিনের কাজের মাধ্যমে। একটি সহজ বিষয় চিন্তা করা যাক। একটি উষ্ণ বস্তু একটি ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে আছে। এক্ষেত্রে তাপ শক্তি ও তাপমাত্রা অনুপাতকে এনট্রপির সংজ্ঞা হিসেবে চিন্তা করা যায়। মনে করুন, অল্প পরিমাণ তাপ উষ্ণ বস্তুটি থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হচ্ছে। উষ্ণ বস্তুটি কিছু এনট্রপি হারাবে, আর শীতল বস্তুটি কিছু এনট্রপি লাভ করবে। এখানে তাপ শক্তির পরিমাণ একই থাকলেও তাপমাত্রা কিন্তু ভিন্ন ছিল। অত্রএব, উষ্ণ বস্তুটি যতটুকু এনট্রপি হারিয়েছে, শীতল বস্তুটি তার চেয়ে বেশি এনট্রপি লাভ করেছে। ফলে সিস্টেমের মোট এনট্রপি, মানে উষ্ণ ও বস্তু শীতল বস্তুর এনট্রপির সমষ্টি বেড়েছে। তার মানে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে আরেকভাবেও বলা যায়। এ ধরনের সিস্টেমের এনট্রপি কখনও হ্রাস পাবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ তাপকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুতে প্রবাহিত হতে হবে।[২]

আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সূত্রটিকে যে-কোনো বদ্ধ সিস্টেমের জন্যে প্রয়োগ করা যায়: এনট্রপি কখনোই কমে না। ধরা যাক সিস্টেমে আছে একটি রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ)। এটি শীতল বস্তু থেকে উত্তপ্ত বস্তুতে তাপ পাঠায়। এনট্রপির মোট পরিমাণ হিসেব করতে হলে ফ্রিজ চালানোর জন্যে ব্যয় হওয়া শক্তির কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ব্যয়ের প্রক্রিয়ার কারণেই কিছু এনট্রপি বেড়ে যাবে। ফলে সবসময় একই ঘটনা ঘটবে। ফ্রিজ ঠাণ্ডা বস্তুকে গরম করে কিছু এনট্রপি কমাবে ঠিকই, কিন্তু ফ্রিজ চালু রাখতে গিয়ে যে পরিমাণ এনট্রপি বাড়বে সেটা এর চেয়ে ঢের বেশি। প্রাকৃতিক সিস্টেমগুলোতেও একই ঘটনা ঘটে। যেমন, বিভিন্ন জীবের দেহে বা স্ফটিক তৈরির প্রক্রিয়া। সিস্টেমেরে এক অংশের এনট্রপি কমে যায়, কিন্তু অপর কোনো অংশে ঠিকই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ এনট্রপি বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে চিন্তা করলে এনট্রপি কখনোই কমে না।

সামগ্রিকভাবে পুরো মহাবিশ্বকে একটি একটি বদ্ধ সিস্টেম ভাবা যায়। এই অর্থে যে, এর 'বাইরে' কিছুই নেই। তাহলে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বাভাস প্রদান করে। সেটি হলো, মহাবিশ্বের মোট এনট্রপি কখনোই কমে না। আসলে এটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলে। আমাদের খুব কাছেই তো এর একটি নমুনা আছে। বলছি সূর্যের কথা। সূর্য অবিরাম মহাশূন্যের শীতল অঞ্চলের দিকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাপ ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্ব জুড়ে। ফিরে আসছে না কখনও। একটি স্পষ্ট অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।

ভাবনার বিষয় হলো, এটা কি সম্ভব যে মাহবিশ্বের এনট্রপি চিরকাল বাড়তেই থাকবে। মনে করুন, এমন একটি পাত্র নেওয়া হলো, যেখান থেকে কোনো তাপ বের হতে পারে না, আবার কোনো তাপ সেখানে প্রবেশও করতে পারে না। ধরুন সেখানে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল বস্তুকে পাশাপাশি রাখা হলো। তাপ শক্তি উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হবে। এনট্রপি বাড়বে। কিন্তু এক পর্যায়ে শীতল বস্তুটি গরম হবে এবং উষ্ণ বস্তুটি ঠাণ্ডা হবে। ফলে দুটোর তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পৌঁছার পর আর কোনো তাপ বিনিময় হবে না। পাত্রের ভেতরের সিস্টেম একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছবে। সর্বোচ্চ এনট্রপির এই সুস্থিত দশাকে তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বলে। সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন থাকলে আর কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বস্তুগুলোকে কোনোভাবে প্রভাবিত করলে ভিন্ন কথা। যেমন ধরুন, পাত্রের বাইরে থেকে আরও তাপ সরবরাহ করা হলো। সেক্ষেত্রে তাপীয় ঘটনা আরও ঘটবে। এবং এনট্রপির সর্বোচ্চ সীমা আরেকটু বাড়বে।

মহাবিশ্বের পরিবর্তন সম্পর্কে তাপগতিবিদ্যার এ সূত্রগুলোর বক্তব্য কী? সূর্য এবং অধিকাংশ নক্ষত্রের কথা যদি বলি, তাপ নির্গমনের প্রক্রিয়া আরও বহু বিলিয়ন বছর ধরে চলতে পারে। কিন্তু এর যে শেষ নেই তা নয়। একটি সাধারণ নক্ষত্রের তাপ উৎপন্ন হয় এর অভ্যন্তরে সংঘটিত নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরে আমরা দেখব, সূর্যের জ্বালানি এক সময় ফুরিয়ে যাবে। এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক সময় এর তাপমাত্রা এর পাশ্ববর্তী মহাশূন্যের তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে।

হেরম্যান ভন হেলমহলজ অবশ্য নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার কথা জানতেন না। (সূর্য এত বিপুল শক্তি কীভাবে উৎপন্ন করে তা তাঁর সময়ে অজানা ছিল) তবে একটি সার্বিক নীতি তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। সেটা হলো, মহাবিশ্বের সকল ভৌত প্রক্রিয়া একটি চূড়ান্ত তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বা সর্বোচ্চ এনট্রপির দিকে এগোচ্ছে। তার পরে আর কোনো দিন বলার মতো কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞরা সাম্যাবস্থার দিকের এই একমুখী গতিকে নাম দেন 'তাপীয় মৃত্যু' (h e a t d e a t h)। তবে সবাই মানতেন যে বাইরে থেকে কাজ করে স্বতন্ত্র সিস্টেমকে আবার সক্রিয় করা যেতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারেই মহাবিশ্বের 'বাইরে' কিছুই নেই। ফলে, সামগ্রিক সেই তাপীয় মৃত্যু ঠেকানোর মতো কিছুই নেই। অনিবার্য এক পরিণতি।

তাপগতিবিদ্যার সূত্রের কারণে মহাবিশ্ব অপ্রতিরোধ্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ আবিষ্কার বহু প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে হতাশ করেছে। যেমন বার্টান্ড রাসেল তাঁর *হোয়াই আই অ্যাম নট অ্যা ক্রিশ্চিয়ান* বইয়ে নিজের বিষণ্ণ মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

> ‘যুগের পর যুগ ধরে করে যাওয়া এত সব পরিশ্রম, এত ঐকান্তিকতা, এত সব উৎসাহ-উদ্দীপনা, মানুষের বুদ্ধিমত্তার এত দারুণ সব নিদর্শন সৌরজগতের মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যাবে, আর মানুষের সকল অর্জন অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়বে – এ কথাগুলোর সাথে সবাই একমত না হলেও এর বিপক্ষ কোনো দর্শন প্রয়োগ করেও এর থেকে বাঁচার আশা করা যেতে পারে না। শুধু এই সত্যের ওপর ভর করেই, এই কঠিন হতাশার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই আত্মাকে নিরাপদ করা যেতে পারে।’

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ও এর মরণোন্মুখ মহাবিশ্ব বিষয়ক ফলাফল সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মহাবিশ্ব আসলে নিরর্থক জিনিস। এবং চূড়ান্তভাবে মানুষের অস্তিত্বও অর্থহীন। এই হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য সম্পর্কে আমি পরের অধ্যায়গুলোতে কথা বলব। এই ধারণা ঠিক কি ভুল সেটাও আলোচনা করব।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত তাপীয় মৃত্যু যে কেবল ভবিষ্যৎ মহাবিশ্বের কথাই বলছে তা কিন্তু নয়। অতীতের ওপরও ভূমিকা আছে এর। এটা পরিষ্কার যে মহাবিশ্ব যদি একটি নির্দিষ্ট হারে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে, তবে এর পক্ষে চিরকাল টিকে থাকা অসম্ভব। কারণটা খুব সোজা। মহাবিশ্বের বয়স যদি অসীম হত, তবে এত দিনে এর মৃত্যুই হয়ে যেত। যে জিনিস নির্দিষ্ট হারে শেষ হয়ে যেথে থাকে সেটার পক্ষে চিরকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় আগে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে।

একটা বড় বিষয় হলো, ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা এই বড় ফলাফলটি ভালোমতো বুঝতে পারেননি। ১৯২০ এর দশকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা গেল, আকস্মিক এক মহাবিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের। তবে দেখা যাচ্ছে, শুধু তাপগতীয় কারণের ওপর ভিত্তি করেই মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরুর বিষয়ে আগে থেকেই দৃঢ় সমর্থন ছিল।

চিত্র ২.২

ওলবার্স প্যারাডক্স

মনে করুন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। নক্ষত্রগুলো নির্দিষ্ট একটি গড় ঘনত্ব নিয়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চিত্রে পৃথিবীর চরাদিকের একটি চিকন গোলকীয় খোলসের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রদের কিছু দেখানো হলো। (খোলসের বাইরের নক্ষত্রগুলোকে চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।) এ খোলসের নক্ষত্রগুলো থেকে আসা আলোই পৃথিবীতে পতিত সমস্ত নাক্ষত্রিক আলোর যোগান দেয়। একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র থেকে আসা আলো এর খোলসের ব্যাসার্ধের বর্গ অনুপাতে কমে যায়[৩]। আবার, খোলসের ব্যাসার্ধ বাড়ার সাথে সাথে নক্ষত্রের সংখ্যাও বেড়ে যায় বর্গ অনুপাতেই। ফলে দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দেয়। তার মানে, খোলসের মোট দীপ্তি[৪] এর ব্যাসার্ধের ওপর নির্ভর করে না। মহাবিশ্ব অসীম হলে এতে এরকম খোলসের সংখ্যাও অসীম হবে। ফলে, পৃথিবীর বুকে এসে পতিত আলোর পরিমাণও অসীম হবার কথা।

কিন্তু বাস্তবে এমনটা দেখা যায়নি বলে ঊনবিংশ শতকের জ্যোতির্বিদদেরকে মহাবিশ্ব বিষয়ক একটি আগ্রহোদ্দীপক প্যারাডক্স হতবুদ্ধিতে ফেলে দেয়। জার্মান জ্যোতির্বিদ ওলবারের নাম অনুসারে একে ওলবার’স প্যারাডক্স বলে ডাকা হয়। তিনিই প্যারাডক্সটির জন্ম দেন। এটি একটি সরল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। রাতের আকাশ কেন কালো?

প্রথম দৃষ্টিতে একে ছোটখাটো সমস্যা মনে হবে। রাতের আকাশ কালো, কারণ নক্ষত্ররা আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে আছে। তাই এরা অনুজ্জ্বল। (দেখুন চিত্র ২.২) কিন্তু ধরুন, মহাশূন্যের কোনো শেষ নেই। সেক্ষেত্রে নক্ষত্রের সংখ্যা অসীম হতে তো কোনো বাধা নেই। অসীম সংখ্যক অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো একত্র করলে তো প্রচুর আলো হয়। মহাশূন্যে প্রায় সুষমভাবে (সমান এলাকায় প্রায় সমান সংখ্যক) বিন্যস্ত অসীম সংখ্যক অপরিবর্তনশীল নক্ষত্রের মোট আলোর পরিমাণ সহজেই হিসেব করে বের করা যায়। বিপরীত বর্গীয় সূত্র অনুসারে দূরত্বের সাথে সাথে উজ্জ্বলতা কমে আসে। এর মানে হলো, দূরত্ব দ্বিগুণ হলে উজ্জ্বলতা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। দূরত্ব তিন গুণ হলে উজ্জ্বলতা হবে নয় ভাগের এক ভাগ। এভাবেই চলতে থাকবে। অন্য দিকে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি দেওয়া হবে, নক্ষত্রের সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে। এবং সাধারণ জ্যামিতির মাধ্যমেই দেখানো যায়, এক শ আলোকবর্ষ দূরে যত নক্ষত্র আছে, দুই শ আলোকবর্ষ দূরে তার চার গুণ নক্ষত্র আছে। আবার, এক শ আলোকবর্ষ দূরে যত নক্ষত্র আছে, তিন শ আলোকবর্ষ দূরে আছে তার নয় গুণ নক্ষত্র। তার মানে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে নক্ষত্রের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে। দুটো প্রভাব একে অপরকে বাতিল করে দিচ্ছে। তার অর্থ হলো, একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত সবগুলো নক্ষত্র থেকে মোট কী পরিমাণ আলো আসবে তা দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। দুই শ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্ররা যতটুকু আলো দেবে, এক শ আলোকবর্ষের দূরের নক্ষত্ররাও সেই একই পরিমাণ আলো দেবে।

সমস্যা হয় যখন আমরা সম্ভাব্য সকল দূরত্বের সকল নক্ষত্রের আলো একত্র করি। মহাবিশ্বের যদি কোনো সীমানা না থাকে, তাহলে তো মনে হয় পৃথিবীতে এসে পড়া আলোর মোট পরিমাণের কোনো সীমা থাকবে না। অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, রাতের আকাশ তীব্র আলোতে

ঝলমল করার কথা।

নক্ষত্রদের সসীম সাইজের কথা মাথায় রাখলে সমস্যাটি আরও বড় হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবী থেকে কোনো নক্ষত্র যত দূরে থাকবে, এর আপাত সাইজও তত কম হবে। পৃথিবী থেকে দেখতে দুটো নক্ষত্র একই রেখা বরাবর হলে কাছের কোনো নক্ষত্রের অপেক্ষাকৃত দূরের নক্ষত্রকে এটি আড়াল করে ফেলবে। মহাবিশ্ব অসীম হলে এটা ঘটবে অসীম সংখ্যক বার। এটাকে হিসাবে ধরলে আগের সিদ্ধান্ত কিন্তু পাল্টে যাবে। পৃথিবীতে এসে পৌঁছা আলো অনেক বেশি হবে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা অসীম হবে না। পৃথিবী সৌরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ লাখ মাইল দূরে থাকলে পৃথিবীর আকাশে যে পরিমাণ আলো আসত এটা প্রায় তার সমান হবে। এ রকম অবস্থান অবশ্যই খুব অস্বস্তিকর হবে। বস্তুত, তীব্র উত্তাপে পৃথিবী নিমেষেই বাষ্পীভূত হয়ে যেত।

অসীম মহাবিশ্ব যে আসলে একটি মহাজাগতিক চুল্লির মতো আচরণ করবে এ ধারণা নতুন কিছু নয়। এটা আর আগে আলোচিত তাপগতীয় সমস্যা আসলে একই কথা। নক্ষত্ররা মহাশূন্যে তাপ ও আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিকিরণ ক্রমশ জমা হচ্ছে মহাশূন্যে। যদি নক্ষত্রগুলো অসীম সময় ধরে জ্বলে, তাহলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বিকিরণের তীব্রতা অসীম হবে। কিন্তু মহাশূন্য দিয়ে সঞ্চালিত হবার সময় কিছু বিকিরণ অন্য নক্ষত্রের ওপর গিয়ে পড়ে পুনঃশোষিত হবে। (আমরা যে দেখি নিকটবর্তী তারকারা দূরের তারকাদের আলো আড়াল করে রাখে, এটা সেই একই কথা।) ফলে বিকিরণের তীব্রতা বেড়ে চলবে। এটা চলবে একটি সাম্যাবস্থা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত। এ অবস্থায় নির্গমন ও শোষণের হার সমান হয়ে যাবে। এই তাপগতীয় সাম্যাবস্থা অর্জিত হবে তখনি, যখন মহাশূন্য বিকিরণের তাপমাত্রা নক্ষত্রের পৃষ্ঠ তাপমাত্রার সমান হয়ে যাবে। এ তাপমাত্রা হলো কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে সমগ্র মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত্। যার তাপমাত্রা হবে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং রাতের আকাশ অন্ধকার হওয়া তো দূরের কথা, তাপমাত্রায় বরং জ্বলজ্বল করার কথা।

নিজের প্যারাডক্সের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা হেনরিখ ওলবার্স নিজেও করেছিলেন। মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ ধুলিকণায় ভর্তি। তিনি বললেন, এ পদার্থগুলো নক্ষত্রের বেশির ভাগ আলো শোষণ করে নেয় বলেই (রাতের) আকাশ কালো হয়। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, তাঁর বুদ্ধিটা যথেষ্ট সৃজনশীল হলেও এর মধ্যে ছিল মৌলিক একটি ত্রুটি। ধুলিকণাগুলো শেষপর্যন্ত উত্তপ্ত হবে এবং জ্বলতে শুরু করবে। যে পরিমাণ বিকিরণ এরা শোষণ করেছিল, ঠিক সে মাত্রার তীব্রতায়ই জ্বলবে এরা।

আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হলো, মহাবিশ্বের আকার অসীম বিবেচনা না করা। মনে করুন নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট। তার মানে, মহাবিশ্বে আছে বিপুল পরিমাণ নক্ষত্র আর অসীম অন্ধকার মহাশূন্য। তাহলে নক্ষত্রের বেশিরভাগ আলোই দূর মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই সরল সমাধানেও ছিল মারাত্মক ভুল। সতের শতকে আইজ্যাক নিউটনও এ সমস্যার কথা জানতেন। সমস্যাটির সাথে মহাকর্ষ সূত্রের সম্পর্ক আছে। প্রতিটি নক্ষত্রই অপর নক্ষত্রগুলোকে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে আকর্ষণ করছে। ফলে সবগুলো নক্ষত্র একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। শেষ পর্যন্ত এসে জড় হবে তাদের মহাকর্ষ কেন্দ্রে। যদি মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও প্রান্ত থাকে, তবে মনে হচ্ছে এটি নিজের ওপরই গুটিয়ে যাবে। একটি অবলম্বনহীন, সসীম ও স্থির মহাবিশ্ব হবে অস্থিতিশীল। মহাকর্ষের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত এটি সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।

মহাকর্ষের সমস্যার কথা পরে আরও বলব। এখানে শুধু বলব নিউটন কী দারুণ উপায়ে এ সমস্যাটি দূর করতে চেয়েছিলেন। নিউটন বললেন, মহাবিশ্বের পক্ষে এর মহাকর্ষ কেন্দ্রের দিকে গুটিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে হলে তো আগে এর মহাকর্ষ কেন্দ্র বলতে কিছু থাকতে হবে। মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও প্রান্ত না থাকতে হলে একই সাথে দুটো শর্ত পূরণ হতে হয়। মহাবিশ্বকে অসীম হতে হবে এবং নক্ষত্ররা (গড়ে) সুষমভাবে বিন্যস্ত হতে হবে। একটি নক্ষত্র এর প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলো দ্বারা সব দিক থেকে আকর্ষণ অনুভব করবে। বিশাল এক দড়ি টানাটানি খেলার মতো, যেখানে দড়ি সবদিকেই টান অনুভব করে। সবদিকের টানগুলো গড়ে একে অপরকে বাতিল করে দেবে। ফলে, নক্ষত্রটির কোনো নড়চড় হবে না।

ফলে, মহাবিশ্বের গুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে নিউটনের সমাধান মেনে নিতে গেলে আবারও অসীম মহাবিশ্বের কথা চলে আসে। ওলবার্সের প্যারাডক্সও হাজির। দেখা যাচ্ছে, আমাদেরকে যে-কোনো একটিকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু একটু পেছনে ফিরে তাকালে আমরা একটি উপায় খুঁজে পাই। এখানে মহাবিশ্বকে অসীম ধরতে হবে না। ভুল অনুমান এটা নয় যে মহাবিশ্ব স্থানের দিক দিয়ে অসীম, বরং ভুল অনুমান হলো মহাবিশ্ব সময়ের দিক দিয়ে অসীম। জ্বলজ্বলে আকাশের প্যারাডক্স তৈরি হয়েছে, কারণ জ্যোতির্বিদরা ধরে নিয়েছিলেন, মহাবিশ্ব অপরিবর্তনশীল। ধরে নিয়েছিলেন, নক্ষত্ররা স্থির এবং এদের বিকিরণের তীব্রতায় কখনও ভাটা পড়ে না। কিন্তু এখন আমরা জানি, এ দুটো অনুমানই ভুল ছিল। প্রথমত, মহাবিশ্ব স্থির নয়, বরং প্রসারিত হচ্ছে। একটু পরই এটা আমি ব্যাখ্যা করব। দ্বিতীয়ত, নক্ষত্ররা চিরকাল আলো দিয়ে যেত পারে না। এক সময় এদের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। এখন নক্ষররা জ্বলছে। তার মানে, অতীতের নির্দিষ্ট একটি সময় আগে তাদের জন্ম হয়েছিল।

মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট হলে ওলবার্সের প্যারাডক্স সমাধান হয়ে যায়। সেটা কেন হয় বুঝতে হলে একটি দূরের নক্ষত্রের কথা ভাবুন। আলো চলে নির্দিষ্ট গতিতে (শূন্য মাধ্যমে সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার)। ফলে, আমরা একটি নক্ষত্র এখন যে অবস্থায় আছে আমরা সেটা দেখছি

না। দেখছি এটি যখন আলো ছেড়েছিল সে সময়কার অবস্থা। যেমন বেটেলজিউস (আর্দ্রা) নক্ষত্রটি আমাদের থেকে ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে আছে। ফলে একে আমরা এখন যেমনটা দেখছি সেটা এর ৬৫০ বছর আগের চেহারা। মনে করুন, মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে দশ বিলিয়ন বছর আগে। এক্ষেত্রে আমরা পৃথিবী থেকে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দূরের কোনো নক্ষত্র দেখব না। স্থানের হিসেবে মহাবিশ্ব অসীম হতেই পারে। কিন্তু এর বয়স যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে আমরা কোনোভাবেই একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে দেখতে পাব না। ফলে, নির্দিষ্ট বয়সের অসীম সংখ্যক নক্ষত্রের মিলিত আলোও নির্দিষ্টই হবে। এবং খুব সম্ভব সেটা হবে অতি নগণ্য।

তাপগতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। মহাশূন্যকে তাপীয় বিকিরণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ে একই তাপমাত্রায় নিয়ে আসার জন্যে নক্ষত্রদের অসীম সময়ের প্রয়োজন। কারণ, মহাবিশ্বে শূন্য স্থানের পরিমাণ তো বিশাল। তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এখনও অতিবাহিত হয়নি।

সবগুলো প্রমাণ বলছে একটি কথাই। মহাবিশ্বের বয়স নির্দিষ্ট। অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে এর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে মহাবিশ্ব খুব সক্রিয় হলেও ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো দিন অনিবার্যভাবে একে বরণ করতে হবে তাপীয় মৃত্যু। সাথে সাথে তৈরি হয় অনেকগুলো প্রশ্ন। কখন ঘটবে শেষ পরিণতি? সেটা কেমন হবে? সেটা কি ধীরে ধীরে হবে, নাকি হঠাৎ করে হবে? এটা ভাবা ঠিক হবে কি না যে তাপীয় মৃত্যু বলতে বিজ্ঞানীর এখন যা বোঝেন, কোনোভাবে সেটা ভুল হয়ে যাবে?

অনুবাদকের নোট:

১। যে প্রক্রিয়া শুধু একদিকেই চলে, পেছন দিকে ফিরে আসে না, সেটাই অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া।
২। এনট্রপি ও সময়ের তীর নিয়ে বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট-১ পড়ুন: *সময় কেন পেছনে চলে না*।
৩। একে বলে বিপরীত বর্গীয় সূত্র। এর মানে হলো একটি মান দ্বিগুণ হলে অপর মান চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। তিন গুণ হলে হবে নয় ভাগের এক ভাগ।
৪। কোনো বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণ শক্তির পরিমাণকে বলে দীপ্তি। আবার একটি বস্তুকে পৃথিবীতে বসে যতটা উজ্জ্বল দেখায় তার নাম আপাত উজ্জ্বলতা। আপাত উজ্জ্বলতা দেখে বস্তুর প্রকৃত দীপ্তি বোঝা যায় না। কারণ বেশি দূরের নক্ষত্র থেকে আসা আলো বিপরীত বর্গীয় সূত্রের কারণে পৃথিবীর কাছে আসতে আসতে ম্লান হয়ে যায়। এ কারণে বাস্তবে বেশি উজ্জ্বল (মানে দীপ্তি বেশি) নক্ষত্রও পৃথিবীর আকাশে কম উজ্জ্বল নক্ষত্রের চেয়ে মৃদু দেখাতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম তিন মিনিট

ইতিহাসবিদদের মতো কসমোলজিস্টরাও জানেন, ভবিষ্যত জানতে হলে তাকাতে হয় অতীতের দিকে। আগের অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, কীভাবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত যে প্রায় দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম। এবং মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়তি কী হবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে এই ঘটনার সাথে সাথে। মহাবিশ্বের শুরু কী করে হয়েছিল এবং প্রাথমিক দশায় এটি কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল সেটা জেনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খুব একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো মহাবিশ্বটা সবসময় ছিল না। গ্রিক দার্শনিকরা চিরন্তন মহাবিশ্বের কথা বললেও পাশ্চাত্যের সবগুলো বড় ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর অতীতের নির্দিষ্ট কোনো সময়েই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন।

মহাবিশ্বের আকস্মিক সূচনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুবই জোরালো। সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলোর আচরণ বিশ্লেষণ করে। ১৯২০ এর দশকে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, দূরবর্তী ছায়াপথগুলো থেকে আসা আলো নিকটবর্তীদের তুলনায় কিছুটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আগে ভেস্টো স্লিফার নামে একজন নেবুলা বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে গিয়েছিলেন। কাজ করতেন অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্ট্যাফ মানমন্দিরে (o b s e r v a t o r y)। আর হাবল ব্যবহার করেছিলেন ১০০ ইঞ্চির মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ। এরপর যত্নের সাথে লাল হয়ে যাওয়ার পরিমাণ পরমাপ করলেন ও

গ্রাফে আঁকলেন। দেখলেন, এখানে একটি নিয়ম কাজ করছে। যে ছায়াপথ আমাদের থেকে যত দূরে আছে, তাকে তত বেশি লাল দেখাচ্ছে।

আলোর রং এর তরঙ্গদৈর্ঘের সাথে সম্পর্কিত। সাদা আলোর বর্ণালিতে নীল রং এর অবস্থান ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্তে আর লাল এর অবস্থান হলো লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘের প্রান্তে। যেহেতু দূরের ছায়াপথগুলোর আলো লাল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তাদের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনোভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। হাবল খুব যত্নের সাথে অনেকগুলো ছায়াপথের বর্ণালির বৈশিষ্ট্যসূচক রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে এ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন, আলোক তরঙ্গ বড় হয়ে যাবার কারণ হলো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বক্তব্যের মাধ্যমেই হাবল আধুনিক কসমোলজির সূচনা করলেন।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা অনেকেই ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, দূরের সব ছায়াপথ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে। প্রসারণের প্রকৃতি পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে (গড়ে) একই রকম। প্রতিটি ছায়াপথ, বা আরো ভালোভাবে বললে প্রতিটি ছায়াপথপুঞ্জ বা স্তবক (cluster of galaxies) একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ চিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্যে ছায়াপথপুঞ্জগুলো মহাশূন্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে – এভাবে চিন্তা না করে মনে করুন, ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থান ফুলে উঠছে বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

স্থান প্রসারিত হচ্ছে- কথাটি বিস্ময়কর শোনাতে পারে। কিন্তু ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষকতা তত্ত্ব প্রকাশের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এ ধারণার সাথে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষ আসলে স্থানের (সঠিক করে বললে স্থানকালের) বক্রতা বা বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে স্থান হলো স্থিতিস্থাপক। এটি এর মাঝে উপস্থিত পদার্থের মহাকর্ষীয় ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বেঁকে যেতে বা প্রসারিত হতে পারে। পর্যবেক্ষণ থেকে এ ধারণার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

চিত্র ৩.১

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের একটি একমাত্রিক নমুনা। বিন্দুগুলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। আর স্থিতিস্থাপক সুতা দিয়ে স্থান বোঝানো হয়েছে। সুতাকে লম্বা করা হলে বিন্দুগুলো দূরে সরে। এর ফলে সুতার ওপর দিয়ে চলমান কোনো তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হবে। হাবলের আবিষ্কৃত লোহিত সরণও[১] এভাবেই কাজ করে।

একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণশীল স্থানের মৌলিক ধারণা বুঝে নেওয়া যায়। মনে করুন, একটি স্থিতিস্থাপক সুতার ওপর অনেকগুলো বিন্দু আছে (দেখুন চিত্র ৩.১)। বিন্দুগলো দ্বারা ছায়াপথপুঞ্জ নির্দেশ করা হচ্ছে। এবার মনে করুন, আপনি সুতাটিকে দুই প্রান্ত থেকে ধরে টান দিয়ে লম্বা করে ফেললেন। প্রতিটি বিন্দু একে অপরটি থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি যে বিন্দুর কথাই চিন্তা করুন না কেন, তার পাশের বিন্দুগুলোকে দূরে সরতে দেখা যাচ্ছে। তার ওপর প্রসারণ সব দিকে একই রকম। কোনো বিশেষ কেন্দ্র বলতে কিছু নেই। অবশ্য আমি এটাকে এখানে যেভাবে এঁকেছি, তাতে একটি বিন্দু কেন্দ্রে আছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এখানে প্রসারণ ঘটছে, তার সাথে এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর কোনো সম্পর্ক নেই। বিন্দুসহ সুতাটি যদি অসীম সাইজের হতো অথবা সুতাটি যদি বৃত্তাকার হতো, তবে এই কেন্দ্রটি আর থাকতো না।

যে-কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার নিকটতম বিন্দুগুলো পরের নিকট বিন্দুগুলো থেকে অর্ধেক গতিতে দূরে সরছে। এবং তারও পরের নিকট বিন্দুগলো থেকে আরও অর্ধেক গতিতে সরছে। এভাবেই চলছে। একটি বিন্দু যত দূরে আছে, সেটি তত দ্রুত সরে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরে সরে যাওয়া মানে সরণের হার দূরত্বের সমানুপাতিক। সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী। ছবিটি দেখে আমরা সম্প্রসারণশীল স্থানে বিন্দুগুলো, মানে ছায়াপথপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে চলাচলরত আলোক তরঙ্গর কথা কল্পনা করতে পারি। স্থানের সাথে সাথে তরঙ্গও প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক লোহিত সরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাবল দেখলেন, লোহিত সরণের পরিমাণ দূরত্বের সমানুপাতিক। ঠিক ছবিতে যেমনটা দেখানো হয়েছে সেভাবে।

মহাবিশ্ব যদি সম্প্রসারণশীল হয়েই থাকে, তাহলে অতীতে নিশ্চয়ই এটি আরও জড়সড় ছিল। হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রসারণের হার পরিমাপ করা যায়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণের মান আরও অনেক উন্নত হয়। হারও বের করা হয় আরও ভালোভাবে। মহাজাগতিক চিত্রটিকে পেছনের দিকে চালিয়ে দিলে আমরা দেখব, কোনো এক দূর অতীতে সবগুলো ছায়াপথ একে অপরের সাথে মিশে ছিল। বর্তমান সময়ের প্রসারণের হার জেনে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই মিশ্রিত অবস্থা ছিল বহু বিলিয়ন বছর আগে। তবে দুটি কারণে সেই সময়টি সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে সঠিক করে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। নানাভাবে ভুল হয়েই যায়। অবশ্য আধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক ছায়াপথ নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এর পরেও প্রসারণের হার এখনও অনিশ্চিত। সেটা কমপক্ষে দুই গুণ পর্যন্ত কম-বেশি হতে পারে। এটা এখনও বিতর্কের বড় একটি বিষয়। [২]

দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সব সময় একই থাকে না। এর জন্যে দায়ী হলো মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষ বল ছায়াপথগুলোর মধ্যে তো কাজ করেই, এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সব ধরনের পদার্থ এবং শক্তির মধ্যেও। মহাকর্ষ গাড়ির ব্রেইকের মতো আচরণ করে। এর কারণে ছায়াপথগুলো বাইরের দিকে ছুটে যেতে বাধা পায়। ফলে, সময়ের সাথে সাথে প্রসারণ হার ধীরে ধীরে কমে আসে। তার মানে, অতীতে নিশ্চয়ই মহাবিশ্ব আরও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। গ্রাফে যদি সময়ের বিপরীতে মহাবিশ্বের একটি আদর্শ এলাকার সাইজ দেখানো হয়, তাহলে ৩.২ নং চিত্রের মতো একটি সাধারণ রেখা পাওয়া যায়। গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে খুব নিবিড় অবস্থা থেকে। তারপর থেকে প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রুত বেগে। এবং সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের আয়তন যত বেড়েছে, পদার্থের ঘনত্বও নিয়মিত ভিত্তিতে ততই কমে গেছে। রেখাটি ধরে পেছন দিকে এগোতে এগোতে সূচনা পর্যন্ত গেলে (চিত্রের ০ অবস্থানে) দেখা যায়, মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে শূন্য সাইজ থেকে। আর সে সময় প্রসারণ হার ছিল অসীম। অন্য কথায়, আমরা আজ যেসব ছায়াপথ দেখছি, এগুলো যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেগুলোর সূচনা হয়েছে তীব্র গতির একটিমাত্র বিন্দু থেকে। তথাকথিত বিগ ব্যাং এর এটি একটি আদর্শায়িত বিবরণ।

চিত্র ৩.২

চিত্রে যেমনটা দেখানো হলো অনেকটা সেভাবেই মহাবিশ্বের প্রসারণ হার সময়ের সাথে সাথে নিয়মিত ভিত্তিতে কমে আসে। সরল এ নমুনায় সময়ের অক্ষের শূন্য বিন্দুতে প্রসারণ হার অসীম। এ বিন্দুটিই বিগ ব্যাংয়ের সময় নির্দেশ করছে।

কিন্তু রেখাটিকে পেছনটা পর্যন্ত টেনে যাওয়ার চিন্তাটা কতটুকু যৌক্তিক? অনেক কসমোলজস্টি মনে করেন, কাজটা ঠিকই আছে। যেহেতু আমরা আশাই করছি যে মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে (আগের অধ্যায়ে আলোচিত কারণগুলোর সাহায্যে) অতএব, নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে সেটা বিগ ব্যাংই হবে বলে। যদি সেটাই হয়, তাহলে রেখার সূচনা বিন্দুটি যেনতেন কোনো বিস্ফোরণ নয়। মনে রাখতে হবে, এখানের গ্রাফটিতে খোদ স্থানেরই প্রসারণ দেখানো হয়েছে। অতএব, শূন্য আয়তনের অর্থ শুধু এটাই নয় যে পদার্থ অসীম ঘনত্বের স্থানে গুটিয়ে আছে। এর আরও অর্থ হলো, স্থান গুটিয়ে আছে শূন্যতার (n o t h i n g) মাঝে। অন্য কথায়, বিগ ব্যাং একই সাথে স্থান এবং পদার্থ ও শক্তির সূচনা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে। এ ধারণা অনুসারে আগে থেকে এমন কোনো শূন্যস্থান ছিল না, যেখানে বিগ ব্যাং ঘটেছিল।

সময় সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। পদার্থের অসীম ঘনত্ব এবং স্থানের অসীম সঙ্কোচন সময়েরও একটি সীমানা বেঁধে দেয়। কারণ, মহাকর্ষ সময় এবং স্থান দুটোকেই লম্বা করে দেয়। এটাও আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি ফলাফল। পরীক্ষামূলকভাবে এর সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিগ ব্যাংয়ের পরিবেশ বলছে, স্থানের বিকৃতি ছিল অসীম। ফলে বিগ ব্যাংয়ের আগের সময় (এবং স্থানের) এর ধারণা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি যে বিগ ব্যাংই হলো সকল ভৌত জিনিস–স্থান, কাল, পদার্থ ও শক্তির–চূড়ান্ত সূচনা। "বিগ ব্যাং এর পূর্বে কী ঘটেছিল?" এমন প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই (যদিও অনেকেই প্রশ্নটি করে থাকেন)। অথবা এমন প্রশ্ন যে কেনই বা বিস্ফোরণটি ঘটেছিল? পূর্ব বলতেই কিছু ছিল না। আর যেখানে সময়েরই অস্তিত্ব নেই সেখানে সাধারণ অর্থে কার্যকারণ বলতেও কিছু থাকে না।

মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বক্তব্যগুলো অদ্ভুত। তবে বিগ ব্যাংয়ের প্রমাণের জন্যে যদি মহাবিশ্বের প্রসারণের ওপরই নির্ভর করা হত, তাহলে সম্ভবত অনেক কসমোলজিস্টই একে মেনে নিতেন না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে তত্ত্বটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও প্রমাণ এল। জানা গেল, পুরো মহাবিশ্ব তাপীয় বিকিরণে পরিপূর্ণ। মহাশূন্য থেকে আসা এ বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের অল্প সময় পরের। আসছে আকাশের সব দিক থেকে একই তীব্রতা নিয়ে। অন্য কিছু দ্বারা এটি বাধাগ্রস্থ হয় না বললেই চলে। ফলে এটি আমাদের সামনে আদিম মহাবিশ্বের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছে। এই তাপীয় বিকিরণের বর্ণালির সাথে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছা একটি চুল্লির উত্তাপের হুবহু মিল রয়েছে। এ ধরনের বিকিরণকে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ[৩]। ফলে আমরা বুঝতে পারছি, প্রাথমিক মহাবিশ্ব এমন একটি সাম্যাবস্থায়ই ছিল। সর্বত্র তাপমাত্রা ছিল একই রকম।

এই পটভূমি তাপীয় বিকিরণ পরিমাপ করে জানা গেল, এর তাপমাত্রা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় তিনি ডিগ্রি বেশি (পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো মাইনাস ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। প্রসারণের সাথে সাথে একটি সরল সূত্র মেনে মহাবিশ্ব ঠাণ্ডা হতে থাকে। ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে। এই শীতলীকরণ প্রভাব আর আলোর লোহিত সরণ একই জিনিস। তাপীয় বিকিরণ আর আলো–দুটোই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা গঠিত। এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে তাপীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বড় হতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে নিম্ন তাপমাত্রার বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (গড়ে) অপেক্ষাকৃত বড় হয়। আবার, উল্টো করে দেখলে আমরা দেখি, অতীতে মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক বেশি উত্তপ্ত ছিল। এই বিকিরণের সূচনা ঘটেছিল বিগ ব্যাংয়ের তিন লক্ষ বছর পরে। যে সময় শীতল হতে হতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই সময়ের আগে মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত আদিম গ্যাস ছিল আয়নিত প্লাজমা[৪] আকারে। এ কারণে সে সময় এ গ্যাসের ভেতর দিয়ে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ সঞ্চালিত হতে পারত না। তাপমাত্রা কমলে প্লাজমা সাধারণ (অ-আয়নিত) হাইড্রোজেন গ্যাসে পরণিত হলো। বিকিরণ এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে। ফলে বিকিরণ এবার মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

পটভূমি বিকিরণ একটু আলাদা। সেটা শুধু এর বর্ণালির কৃষ্ণবস্তুর মতো আচরণের জন্যেই নয়। আকাশের সব দিকে এটি দারুণভাবে একই রকম। মহাশূন্যের আলাদা দিকে এই বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এটা থেকে বোঝা যায়, বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে মহাবিশ্ব যোগ্যভাবে সমধর্মী। কারণ, স্থানের কোনো একটি অঞ্চলে বা নির্দিষ্ট কোনো দিকে যদি পদার্থ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুঞ্জিভূত হতো, তাহলে তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যেত। অন্য দিকে আমরা জানি, মহাবিশ্ব পুরোপুরি সুষম নয়। পদার্থ একীভূত হয়ে ছায়াপথ তৈরি হয়ে আছে। বিভিন্ন ছায়াপথ মিলে আবার তৈরি হয় ক্লাস্টার বা স্তবক। এই ক্লাস্টাররা আবার তৈরি করে সুপারক্লাস্টার। বহু মিলিয়ন আলোকবর্ষের মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি অনেকটা ফেনার মতো। বিপুল পরিমাণ শূন্যতার মাঝে মাঝে ছায়াপথ তন্তুর উপস্থিতি।

চিত্র: ৩.২.১

(ছায়াপথ তন্তুর (Galaxy filament) চেহারা বড় মাপকাঠিতে ৩.২.১ চিত্রের মতো। এটি হলো মহাবিশ্বের জানা কাঠামোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্য হতে পারে ১৬ কোটি থেকে ২৬ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত। -অনুবাদক)

বড় স্কেলে মহাবিশ্বের এই গুচ্ছবদ্ধতা প্রারম্ভিক মসৃণ অবস্থা থেকেই কোনোভাবে জন্ম নিয়েছে। এর পেছেনে অনেকগুলো ভৌত কারণ থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো ধীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে গুচ্ছবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার কিছু প্রমাণ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মধ্যে থাকার কথা। ১৯৯২ সালে কোব (COBE বা Cosmic Background Explorer) নামে নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জানা যায়, বিকিরণ পুরোপুরি মসৃণ নয়। আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে এতে সুস্পষ্ট ছন্দপতন দেখা যাচ্ছে। অথবা দেখা যাচ্ছে তীব্রতার উঠা-নামা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দপতনগুলোই সুপারক্লাস্টারদের গঠন প্রক্রিয়ার নির্বিঘ্ন সূচনা করেছিল। এ বিকিরণ আদিম গুচ্ছবদ্ধতার চিহ্ন আস্থার সাথে ধরে রেখেছে। সেটাও আবার বহু কাল যাবত। এর গ্রাফ বলছে, আজ আমরা যে সৃশৃঙ্খল স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব দেখছি, এটি সব সময় এমন ছিল না। শুরুতে মহাবিশ্ব ছিল প্রায় পুরোপুরি সুষম অবস্থায়। একটি লম্বা বিবর্তনের মাধ্যমে পদার্থ পুঞ্জীভূত হতে হতে পরবর্তীতে ছায়াপথ ও নক্ষত্রের জন্ম হয়।

উত্তপ্ত ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম হওয়ার পক্ষে আরেকটি চূড়ান্ত প্রমাণও আছে। আজকের দিনের তাপীয় বিকিরণের তাপমাত্রা জেনে আমরা সহজেই হিসাব করে ফেলতে পারি যে জন্মের প্রায় এক বছর পর মহাবিশ্বের সবখানে তাপমাত্রা ছিল প্রায় এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে এতে যৌগিক পরমাণুর কেন্দ্রের পক্ষেও টিকে থাকা সম্ভব নয়। সেই সময় বস্তু অবশ্যই এর সবচেয়ে মৌলিক উপাদানে বিভক্ত ছিল। ফলে এ সময় প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মতো মৌলিক[৫] কণিকারা বিচরণ করছিল থরে থরে। কিন্তু তাপমাত্রা একটু কমলে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব হলো। বিশেষ করে প্রোটন ও নিউট্রন মুক্তভাবে জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হবার সুযোগ পেল। শেষ পর্যন্ত এই জোড়াগুলোই যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) গঠন করে। হিসাব করে দেখা গেছে, এই নিউক্লীয় প্রক্রিয়াগুলো চলছিল প্রায় তিন মিনিট ধরে (এর ওপর ভিত্তি করেই স্টিভেন উইনবার্গ বইয়ের নাম দিয়েছিলেন *দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস*)। এটুকুন সময়ের মধ্যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পদার্থ হিলিয়ামে পরিণত হয়। এতে করে উপস্থিত সবগুলো নিউট্রন কণা শেষ হয়ে যায়। ফলে আর কোনো উপায় না দেখে বাকি সব অযুক্ত প্রোটনগুলো হাইড্রোজেন[৬] নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। তার মানে তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বে প্রায় ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়াম থাকা উচিৎ। বর্তমান সময়ের হিসাব-নিকাশের সাথে এই বক্তব্যের খুব ভালো মিল পাওয়া গেছে।

আদিম সেই নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সম্ভবত সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম[৭], হিলিয়াম-৩ এবং লিথিয়ামও তৈরি হয়েছিল। তবে ভারী মৌলগুলো বিগ ব্যাংয়ের সময় তৈরি হয়নি। মহাজাগতিক পদার্থগুলোর মধ্যে এদের পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। এগুলো প্রস্তুত হয়েছিল আরও অনেক পরে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। সেটা কীভাবে হয়েছিল তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখব।

সব মিলিয়ে মহাবিশ্বের প্রসারণ, মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং রাসায়নিক মৌলের আপেক্ষিক্ত প্রাচুর্য- এই বিষয়গুলো বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ। তবে অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও অজানা। যেমন, মহাবিশ্ব ঠিক এই হারেই কেন প্রসারিত হচ্ছে? মানে, বিগ ব্যাং কেন এত বিগ (বড়) ছিল? প্রাথমিক মহাবিশ্ব কেন এতটা সুষম (সব দিকে একই রকম) ছিল? এহাশূন্যের সব দিকে কেনইবা প্রসারণ হার এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল? কোব (COBE) যে একটু ব্যতিক্রম ঘনত্বের অঞ্চল খুঁজে পেয়েছে তারই বা উৎস কী ছিল? ছায়াপথ ও ছায়াপথ গুচ্ছ তৈরিতে কিন্তু এটুকু ব্যতিক্রমের খুব দরকার ছিল।

এই বড় ধাঁধাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ-শক্তির কণাপদার্থবিদ্যার সাথে বিগ ব্যাং তত্ত্বকে একীভূত করা হচ্ছে। একটা বিষয় আগেই বলে রাখি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই 'নতুন কসমোলজি' কিন্তু আগে আলোচিত বিষয়গুলোর চেয়ে একটু কম নির্ভরযোগ্য। বিশেষ করে কণিকার যে পরিমাণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিতে সংঘটিত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব আমরা। আর এই প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়েছিল মহাবিশ্বের জন্মের পরের সেকেন্ডের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে। সেই সময়ের অবস্থা সম্ভবত এতটাই চরম ছিল যে বর্তমানে গাণিতক নমুনা (model) ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই। এই নমুনার ভিত্তি নিছকই তাত্ত্বিক কিছু ধারণা। সময় আকার স্ফীতি

এই নতুন কসমোলজির একটি অনুমান হলো ইনফ্লেশন বা স্ফীতি (i n f l a t i o n) নামের একটি প্রক্রিয়া। এটির মূল বক্তব্য হলো, এক সেকেন্ডের প্রথম ভগ্নাংশের কোনো এক সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বড় হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। বিষয়টি বুঝতে হলে ৩.২ চিত্রটি আবার দেখুন। রেখাটি সব সময় নিচের দিকেই বেঁকে আসে। তার মানে, স্থানের সাইজ বড় হতে থাকলেও তা হয় ক্রমেই আগের চয়ে অল্প হারে। অন্য দিকে, স্ফীতির সময় প্রসারণ ঘটেছিল ক্রমশ আগের চেয়ে দ্রুত বেগে। এ অবস্থাটি দেখানো হয়েছে ৩.৩ নং চিত্রে (সঠিক মাপকাঠিতে নয়)। প্রথমে প্রসারণ থামছিল, কিন্তু স্ফীতি শুরু হতে হতে এটি দ্রুত বেড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্যে রেখাটি উপরের দিকে ছুটতে থাকে। শেষে রেখাটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু এর মধ্যেই স্থানের সাহজ ৩.২ চিত্রের অবস্থানের তুলনায় অনেক অনেক বড় হয়ে যায় (এখানে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি)।

চিত্র ৩.৩

স্ফীতির স্বরূপ। একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হওয়ার পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাবিশ্ব হঠাৎ করে বিশাল বড় হয়ে যায়। উলম্ব অক্ষটিকে খুব বেশি সঙ্কুচিত করে দেখানো হয়েছে। স্ফীতি দশার পরে প্রসারণের হার ক্রমশ কমতে থাকে। ৩.২ চিত্রের মতোই।

কিন্তু মহাবিশ্বের আচরণ কেন এমন হলো? এখানে মাথায় রাখতে হবে যে রেখার নীচের দিকের গতিটা পেছনে দায়ী হলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল। এটি প্রসারণকে থামিয়ে দিতে চায়। ফলে উপরের দিকে গতিকে এক ধরনের অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা বিপরীত মহাকর্ষ তথা বিকর্ষণ বলের প্রভাব ধরে নেওয়া যেতে পারে। যার ফলে মহাবিশ্বের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। বিপরীত মহাকর্ষের ধারণাকে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু অনুমাননির্ভর তত্ত্বের মতে একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের চরম অবস্থায় এমন কিছু ঘটে থাকতেও পারে।

সেটা কীভাবে তা বলার আগে আমি বলতে চাই কীভাবে স্ফীতি তত্ত্ব ওপরে উল্লিখিত কিছু মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান করতে পারে। প্রথমত, ক্রমশ দ্রুত হারের প্রসারণ থেকে বিগ ব্যাং কেন এত বড় ছিল তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অ্যান্টিগ্র্যাভিটি প্রভাবটি বেশ অস্থিতিশীল ও তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া। তার মানে, মহাবিশ্বের সাইজ বড় হয় সূচকীয় হারে (e x p o n e n t i a l l y)। গাণিতিকভাবে বললে এ কথার মানে দাঁড়ায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরমাণ স্থানের আকার দ্বিগুণ হয়। ধরা যাক, এ সময়টির নাম একটি টিক। তাহলে দুটি টিক পরে সাইজ হবে চারগুণ। তিন টিকের পরে আটগুণ। দশ টিকের পরে স্থানটি প্রসারিত হবে ১০ হাজার গুণেরও বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে, স্ফীতি যুগ পরবর্তী প্রসারণ হার বর্তমান সময়ে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত প্রসারণ হারের সাথে মিলে গেছে। (এটা দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছি তা আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তারে বলব)

স্ফীতির কারণে সাইজ বেড়ে যাওয়া থেকে মহাবিশ্বের সুষম হবার পেছনের কারণটাও সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্থানের প্রসারণের কারণে প্রাথমিক যেকোনো বিষমতা উধাও হয়ে যাবে। বেলুনকে ফুলিয়ে বড় করলে যেভাবে এর ভাঁজগুলো উধাও হয়ে যায় সেভাবেই। একইভাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারণের যে ভিন্নতা ছিল তাও স্ফীতির প্রভাবে কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। কারণ, স্ফীতি সব দিকে সমান তেজে কাজ করে। তাহলে কোব যে সামান্য বিষমতা পেল তার ব্যাখ্যা কী? এর কারণ সম্ভবত স্ফীতি একই সময়ে সকল জায়গায় থামেনি (এর কারণও একটু পরে বলছি)। ফলে কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশি ফুলে-ফেঁপে গিয়েছিল। ফলে ঘনত্বেও হয়ে গিয়েছিল কিছু তারতম্য।

এবার কিছু সংখ্যা নিয়ে কথা বলি। স্ফীতি তত্ত্বের সবচেয়ে সরল রূপটিতে স্ফীতির (অ্যান্টিগ্যাভিটি) শক্তি খুব বেশি শক্তিশালী। যা মহাবিশ্বকে এক সেকেন্ডের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ বড় করে ফেলে। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই সময়টিকেই আমি একটু আগে এক টিক বলেছিলাম। মাত্র ১০০ টি টিকের পরেই একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাইজের স্থান ফুলে-ফেঁপে গিয়ে এক লাখ আলোকবর্ষ চওড়া অঞ্চল হয়ে যায়। আগে বলে আসা মহাজাগতিব রহস্যের ব্যাখ্যায় এটা পুরোপুরি যথেষ্ট।

অতিপারমাণবিক কণাপদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে স্ফীতির উদ্রেককারী অনেকগুলো সম্ভাব্য প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সবগুলো প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম নামে একটি ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এটা বুঝতে হলে আগে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে আসতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা ঘটেছিল আলো, তাপ ইত্যাদি তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের ধর্ম সম্পর্কে একটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ স্থানের ভেতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে চললেও এটি আবার এমনভাবেও আচরণ করতে পারে যাতে মনে হয় এটি আসলে কণা দিয়ে গঠিত। আলোর নির্গমন ও শোষণ ঘটে শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেট বা গুচ্ছ (কোয়ান্টা) আকারে। এই গুচ্ছগুলোর নাম ফোটন। তরঙ্গ ও কণাময় আচরণের এই সমাবেশ পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক জগতের সব বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি যে সত্ত্বাগুলোকে সাধরণভাবে কণা মনে কার হয়, তাদের সবাই-ই, এমনকি পুরো পরমাণুও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ হলো ওয়ের্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। এটি অনুসারে কোয়ান্টাম বস্তুদের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের

জন্যে সুসংজ্ঞায়তি মান থাকবে না। যেমন একটি ইলেকট্রনের একই সাথে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও নির্দিষ্ট ভরবেগ থাকতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এর শক্তির মানও নির্দিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে কাজ করে শক্তির মানের অনিশ্চয়তা। আমাদের চিরচেনা বড় জগতে তো শক্তি সব সময় সংরক্ষিত[৮] থাকে (এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই)। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে নীতিটিকে স্থগিত করে রাখা যায়। এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে স্বতস্ফূর্ত ও অননুমেয়ভাবে শক্তির পরিমাণ বদলে যেতে পারে। যত অল্প সময় বিবেচনা করা হবে, এই দৈব কোয়ান্টাম বিষমতাও তত বেশি হবে। সত্যি বলতে, কণাটি শূন্য থেকেই শক্তি ধার করতে পারে, যদি কি না আবার খুব দ্রুতই সেই শক্তি পরিশোধ করে দেওয়া হয়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির সূক্ষ্ম গাণিতিক ভাষ্য মতে বড় আকারে ধার করা শক্তি দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হয়। আর ছোট ঋণের মেয়াদ হয় বেশি।

শক্তির এই অনিশ্চয়তা থেকে কিছু দারুণ ফলাফল বেরিয়ে আসে। এমনও সম্ভাবনা আছে হঠাৎ করে শূন্য থেকে ফোটনের মতো একটি কণা তৈরি হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল খানিক পরেই। এই কণাগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকে ধার করা শক্তির ওপর নির্ভর করে। এবং সেই কারণে এই অস্তিত্ব নির্ভর করে সময়ের ওপরও। আমরা এদেরকে দেখি না কারণ এরা হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমরা যাকে শূন্য স্থান বলে মনে করি সেটা আসলে এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী কণায় পরিপূর্ণ। শুধু ফোটনই নয়, এমন কণার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্য সবাই। আমাদের পরিচিত ও স্থায়ী কণাগুলো থেকে আলাদা করার জন্যে এই ক্ষণস্থায়ী কণাদেরকে বলা হয় ভার্চুয়াল কণা। স্থায়ীদের নাম যেখানে বাস্তব কণা।

অস্থায়িত্বের কথা বাদ দিলে ভার্চুয়াল কণার সাথে বাস্তব কণার কোনো পার্থক্য নেই। এবং বাইরে থেকে শক্তি সরবারহ করে হাইজেনবার্গ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলে ভার্চুয়াল কণাদেরকে বাস্তব কণায়ও রূপান্তরিত করা সম্ভব। এবং সত্যি বলতে, একে তখন একই ধরনের অন্য বাস্তব কণা থেকে আলাদা করে চেনাও সম্ভব নয়। যেমন একটি ভার্চুয়াল ইলেকট্রন সাধারণত মাত্র $১০^{-২১}$ সেকেন্ড সময় স্থায়ী হয়। স্বল্পায়ুর জীবনে এটি কিন্তু স্থির বসে থাকে না। বিনাশ হবার আগে আগে অতিক্রম করে ফেলতে পারে ১০-১১ সেন্টিমিটার পথ (যেখানে একটি পরমাণু $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার চওড়া)। এই সময়ের মধ্যেই যদি ভার্চুয়াল ইলেকট্রনটি কোথাও থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে (যেমন ধরুন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে), তাহলে আর একে বিলুপ্ত হতে হবে না। এটি তখন বিলকুল স্বাভাবিক ইলেকট্রন হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

আমরা এই ভার্চুয়াল কণাদেরকে দেখতে না পেলেও জানি যে শূন্য স্থানে এদের অস্তিত্ব আছে। কারণ এদের শনাক্তযোগ্য লক্ষণ এরা রেখে যায়। যেমন ভার্চুয়াল ফোটনের একটি প্রভাব হলো, এটি পরমাণুর শক্তি স্তরে[৯] শক্তির সামান্য পরিবর্তন তৈরি করে। এছাড়াও ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামকেও সমান পরিমাণ পরিবর্তন ঘটায়। বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে ইতোমধ্যেই এই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেকটি বিষয় এড়িয়ে গেল ভুল হয়ে যাবে। কারণ হলো অতিপারমাণবিক কণিকারা কিন্তু মুক্তভাবে চলাচল করে না। এটা নির্ভর করে অনেকগুলো বলের ওপর। কোন প্রকার বল কাজ করবে সেটা নির্ভর করবে কণার প্রকৃতির ওপর। এ বলের প্রভাবে কিন্তু উপরে দেওয়া কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের সরল চিত্রটি একদম পাল্টে যায়। এই বল কণাদের স্ব স্ব ভার্চুয়াল কণাদের মধ্যেও কাজ করে। অতএব হতে পারে একের বেশি ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম অবস্থার (স্টেট) অস্তিত্ব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একটি পরিচিত দিক। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি স্তর। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন শুধু নির্দিষ্ট শক্তির কিছু সুসংজ্ঞায়িত অবস্থাতেই অস্তিত্ববান থাকতে পারে। সবচেয়ে নীচের স্তরের নাম গ্রাউন্ড স্টেট। এটা স্থিতিশীল অবস্থা। উচ্চতর অবস্থাগুলো উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল। কোনো ইলেকট্রন উচ্চতর অবস্থায় চলে গেলে এটি এক বা একাধিক ধাপে পুনরায় নীচের স্তরে অবস্থিত গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসবে। সুসংজ্ঞায়িত অর্ধায়ু (h a l f l i f e) বিশিষ্ট উত্তেজিত অবস্থা এভাবেই ক্ষয় হতে থাকে।

ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রেও একই নীতি কাজ করে। এতে এক বা একাধিক উত্তেজিত স্টেট থাকতে পারে। এই স্টেটগুলোর শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য তাদেরকে দেখতে একই রকম দেখাবে। আর যাই হোক, সবই তো খালি! সর্বনিম্ন শক্তি স্তর বা গ্রাউন্ড স্টেটকে অনেক সময় বলা হয় প্রকৃত ভ্যাকুয়াম। কারণ, এটাই হলো স্থিতিশীল অবস্থা। এবং এটিই আমাদের বর্তমানের দেখা মহাবিশ্বের শূন্য স্থান হিসেবে কাজ করে। উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামকে বলা হয় নকল ভ্যাকুয়াম।

তবে বলে রাখা ভাল, নকল ভ্যাকুয়াম এখন পর্যন্ত নিছকই তাত্ত্বিক একটি ধারণা। এবং এদের বৈশিষ্ট্যও মূলত নির্ভর করে কোন তত্ত্ব দিয়ে এদেরকে বিচার করা হচ্ছে তার ওপর। তবে সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোতে এদের ধারণা সহজাতভাবেই চলে আসে। এ তত্ত্বগুলোর লক্ষ্য হলো প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকে একীভূত করা। বলগুলো হলো মহাকর্ষ, আমাদের পরিচিত তড়িচ্চুম্বকীয় বল এবং স্বল্প-পাল্লার দুটি নিউক্লীয় বল, যারা দুর্বল ও সবল বল হিসেবে পরিচিতি। এক সময় অবশ্য তালিকাটা আরও লম্বা ছিল। তড়িৎ ও চৌম্বক বলকে এক সময় আলাদা ভাবা হত। একীভূত করার কাজ শুরু হয় ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এ কাজে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এখন জানা হয়ে গেছে যে তড়িচ্চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল একই সুতোয় গাঁথা। একে এক কথায় বলা হচ্ছে তড়িৎদুর্বল বল (e l e c t r o w e a k f o r c e)। বহু পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, সবল বলও তড়িৎদুর্বল বলের সাথে মিলে যাবে। এমন মিল তৈরিতে সক্ষম তত্ত্বগুলোকে বলা হয় গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। এটা হওয়া খুব সম্ভব যে গভীর কোনো পর্যায়ে সবগুলো ফোর্স বা বল

একটিমাত্র সুপার-ফোর্সে এসে মিলিত হবে।

স্ফীতি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে ভালো ব্যখ্যাগুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি থেকেই। এ তত্ত্বগুলোর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটের শক্তি অনেক বেশি। মাত্র এক ঘনমিটার স্থানের শক্তি $১০^{৮৭}$ জুল[১০] এমন অবস্থায় পরমাণুর মতো ছোট্ট আয়তনের জায়গায়ও $১০^{৬২}$ জুল শক্তি থাকবে। যেখানে একটি উত্তেজিত পরমাণুর শক্তি মাত্র $১০^{-১৮}$ জুল। ফলে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামকে উত্তেজিত হতে অনেক অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন। এবং বর্তমান মহাবিশ্বে নকল ভ্যাকুয়ামের দেখা পাওয়ার আশাও নেই। তবে বিগ ব্যাংয়ের মতো চরম অবস্থায় বিষয়গুলো সম্ভব।

নকল ভ্যাকুয়াম স্টেটে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি থাকে তার থাকে তীব্র মহাকর্ষীয় প্রভাবও। কারণ, আইনস্টাইন আমাদের দেখিয়েছেন, শক্তিরও ভর আছে। ফলে সাধারণ বস্তুর মতো এরও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থাকবে। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের তীব্র শক্তি খুব তীব্র আকর্ষণধর্মী। এক ঘনমিটার নকল ভ্যাকুয়ামের শক্তি $১০^{৬৭}$ টন ভরের সমান। পর্যবেক্ষণযোগ্য পুরো মহাবিশ্বের ভরও আরও কম ($১০^{৫০}$)। এই তীব্র মহাকর্ষ স্ফীতির পক্ষে কথা বলে না। স্ফীতির জন্যে দরকার কোনো রকম একটি অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। কিন্তু নকল ভ্যাকুয়ামের বিশাল শক্তির জন্যে দরকার একই রকম বিশাল পরিমাণ নকল ভ্যাকুয়াম চাপ (f a l s e-v a c u u m p r e s s u r e)। এই চাপটাই কিন্তু আসল বিষয়। আমরা সাধারণত চাপকে মহাকর্ষের উৎস মনে করি না। কিন্তু আসলে সেটি উৎস হিসেবে কাজ করে। বাইরের দিকে যান্ত্রিণ বল প্রয়োগ করলেও চাপ আবার ভেতরের দিকেও মহাকর্ষীয় টান তৈরি করে। আমাদের সদা-পরিচিত বস্তুদের ক্ষেত্রে তার ভরের তুলনায় চাপের মহাকর্ষীয় প্রভাব খুব নগণ্য। যেমন, পৃথিবীতে আপনার ওজনের একশ কোটি ভাগের এক ভাগেরও কমের পেছনে দায়ী হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ চাপ। কিন্তু তবুও এটা কিন্তু বাস্তব। এবং কোনো সিস্টেমে চাপ অত্যধিক হলে ভরজনিত মহাকর্ষীয় প্রভাবের চেয়েও এটি বেশি করে অনুভূত হবে।

নকল ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রে শক্তি[১১] যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল তার চাপ। কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাপ এখানে ঋণাত্মক। ফলে নকল ভ্যাকুয়াম ধাক্কা দেয় না, বরং টানে। ঋণাত্মক চাপ তৈরি করে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় টান। মানে অ্যান্টিগ্র্যাভিটি। ফলে নকল ভ্যাকুয়ামের মহাকর্ষ নিয়ে শক্তির আকর্ষণধর্মী ও চাপের বিকর্ষণধর্মী প্রভাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। জিত হয় চাপেরই। এবং বিকর্ষণের নিট প্রভাব এত বেশি যে এটি মুহূর্তের মধ্যে মহাবিশ্বকে উড়িয়ে দিতে পারে। স্ফীতির এমন তীব্র ধাক্কার ফলেই মহাবিশ্ব প্রতি $১০^{-৩৪}$ সেকেন্ডের মতো ক্ষুদ্র সময়ে প্রচণ্ড গতিতে দ্বিগুণ বড় হয়েছিল।

নকল ভ্যাকুয়াম সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। সকল উত্তেজিত কোয়ান্টাম স্টেটের মতো এটিও ক্ষয় হয়ে গ্রাউন্ড স্টেটে, মানে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে আসতে চায়। সম্ভবত কয়েক ডজন 'টিক' পার হলে এটি এটা করতে সক্ষম হয়। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হবার কারণে এর মধ্যে অনিবার্যভাবে কাজ করে অনিশ্চয়তা ও দৈব পরিবর্তন, যেটা একটু আগে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, স্থানের সব দিকে ক্ষয় একই হারে ঘটবে না। বিভিন্ন দিকে তা হবে আলাদাভাবে। কিছু কিছু তাত্ত্বিকের মতে কোব (C O B E) যে ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছে তার কারণ এই ভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে গেলে মহাবিশ্ব তার স্বাভাবিক প্রসারণ শুরু করল। মানে ধীরে ধীরে কমল প্রসারণের হার। নকল ভ্যাকুয়ামে আবদ্ধ শক্তি অবমুক্ত হলো। এটা বের হলো তাপ আকারে। স্ফীতির কারণে যে বিশাল প্রসারণ ঘটল, তাতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি হলো। হঠাৎ স্ফীতি থেমে যাওয়ায় তাপমাত্রা আবার বেড়ে $১০^{২৮}$ ডিগ্রি হয়ে গেল। এই বিপুল তাপ আজও রয়ে গেছে। অবশ্য সেটার তীব্রতা অনেক কমে গেছে। এরই নাম মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণ। ভ্যাকুয়াম এনার্জি অবমুক্ত হবার পাশাপাশি আরেকটি ঘটনাও ঘটল। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের অনেকগুলো কণা এ থেকে কিছু শক্তি গ্রহণ করে বাস্তব কণায় উন্নীত হলো। আরও কিছু প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন শেষে এই আদিম কণাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে $১০^{৫০}$ টন পদার্থ তৈরি হলো। এই পদার্থ থেকেই আপনি, আমি, ছায়াপথ ও মহাবিশ্বের বাকিটার সৃষ্টি।

বড় বড় অনেক কসমোলজিস্টই মনে করেন স্ফীতির ধারণাই মহাবিশ্বের ইতিহাসের সত্যিকার চিত্র প্রদান করে। যদি এটি আসলেই সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো এবং ভৌত উপাদানসমূহ কেমন হবে তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল জন্মের মাত্র $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড পরেই। স্ফীতির পরে মহাবিশ্বের অতিপারমাণবিক স্তরে ঘটেছিল আরও নানান পরিবর্তন। প্রাথমিক পদার্থ থেকে তৈরি হলো কণা ও পরমাণু। আমাদের সময়ের মহাজাগতিক বস্তুগুলো এদের দিয়েই গড়া। তবে পদার্থের অধিকাংশ বাড়তি প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছিল মাত্র প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে।

প্রথম তিন মিনিটের সাথে শেষ তিন মিনিটের সম্পর্ক কী? একটি বুলেটের ভাগ্য যেমন এর লক্ষ্যমাত্রার ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, তেমনি মহাবিশ্বের পরিণতিও এর প্রাথমিক অবস্থার ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। আমরা সামনে দেখব, প্রাথমিক সূচনা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও বিগ ব্যাং থেকে উদ্ভূত পদার্থের প্রকৃতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করে। মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ একই সুতোয় গেঁথে আছে

শক্তভাবে।

অনুবাদকের নোট:

2. কোনো বস্তু দূরে সরে গেলে সেটি থেকে আসা আলোর রং লাল হয়ে যাওয়াকেই লোহিত সরণ বলে। প্রত্যেক রংয়ের আলোর নির্দিষ্ট পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে। বস্তু দূরে সরে গেলে আগত আলোর কম্পাঙ্ক কমে যায় ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। আর দৃশ্যমান আলোগুলোর মধ্যে লালের তরঙ্গদৈর্ঘ্যই সবচেয়ে বড়। তাই দূরে যাওয়া বস্তুকে লাল দেখায়। এরই নাম লোহিত সরণ।
3. সর্বশেষ হিসাব মতে মহাবিশ্বের প্রসারণ হার প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেকে ৭৪ কিলোমিটার। এক পারসেক হলো ৩.৩ আলোকবর্ষের সমান। আর মেগাপারসেক পারসেকের ১০ লক্ষ গুণ। অতএব প্রসারণের হারটির অর্থ হলো আমাদের থেকে প্রতি ৩.৩ মেগাপারসেক বা ৩৩ লক্ষ আলকবর্ষ দূরের একটি ছায়াপথকে আমরা প্রতি সেকেন্ডে ৭৪ কিলোমিটার বেশি জোরে সরতে দেখব।
4. যে বস্তু তার ওপর আগত সকল বিকিরণ শোষণ করে নেয় তাকে কৃষ্ণবস্তু বলে। অন্যান্য বস্তুর সাথে তুলনা করার জন্যে নিছক একটি তাত্ত্বিক নমুনা এটি। প্রকৃতিতে নিখুঁত কৃষ্ণবস্তুর অস্তিত্ব নেই।
5. পদার্থবিজ্ঞানে প্লাজমাকে বলা হয় পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এ অবস্থায় গ্যাস থাকে আয়নিত অবস্থায়। মানে পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে না। এই অবস্থায় পদার্থ খুব তড়িৎ সুপরিবাহী হয়। এবং সে কারণে তড়িৎ ও চুম্বকীয় আচরণের প্রাধান্য থাকে।
6. প্রোটন ও নিউট্রন অবশ্য ঠিক মৌলিক কণিকা নয়, গঠিত কোয়ার্ক দিয়ে।
7. হাইড্রোজেনের সবচেয়ে সরল রূপটিতে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। কোনো নিউট্রন থাকে না।
8. ২ টি প্রোটন সম্বলিত হাইড্রোজনের আরেকটি রূপ।
9. শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। একে কেবল এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।
10. মানে পরমাণুর কক্ষপথে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে পরমাণুর কেন্দ্রীয় অবস্থানের নিউক্লিয়াসের চারদিকের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো বন্টিত থাকে।
11. একটি আপেলকে এক মিটার উচ্চতায় তুললে মোটামুটি এক জুল পরিমাণ শক্তি খরচ হয়। অন্যভাবে বললে, ১০০ জুল শক্তি দিয়ে ২০ ওয়াটের একটি বাতি ৫ সেকেন্ড চালানো যায়। এবার চিন্তা করুন তাহলে $১০^{৮৭}$ জুল কত বিশাল।
12. এনে রাখতে হবে, শক্তি কিন্তু ভরেরই আরেক রূপ। তাই শক্তিরও মহাকর্ষীয় টান থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নক্ষত্রের মৃত্যু

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩ কি ২৪ তারিখ রাতের কথা। কানাডিয়ান জ্যোতির্বিদ ইয়ান শেলটন কাজ করছিলেন লাস ক্যাম্পানাস পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে। জায়গাটা চিলীয় আন্দিজের চূড়ায়। একজন নৈশ সহকারী কিছু সময়ের জন্যে বাইরে এলেন। অলস চোখে তাকালেন আকাশেল দিকে। রাতের আকাশ তার নখদর্পণে। ফলে অস্বাভাবিক দৃশ্যটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড গ্যালাক্সির নীহারিকার দাগের প্রান্তে একটি নতুন নক্ষত্র। উজ্জ্বলতা অত বেশি নয়। কালপুরুষের কোমরবন্ধের (Or i on bel t) তারকাগুলোর কাছাকাছি উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আগের দিন নক্ষত্রটা ওখানটায় ছিল না।

সহকারী সাহেব ব্যাপারটা শেলটনকে বললেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শেলটন আর তার চিলীয় সহকারি একটি সুপারনোভা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ১৬০৪ সালে জোহানেস কেপলারও খালি চোখে একটি সুপারনোভা দেখেছিলেন। তারপরে খালি চোখে এই প্রথম আবার কোনো সুপারনোভা ধরা পড়ল। এর পরপরই বেশ কয়েকটি দেশের জ্যোতির্বিদরা লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের পেছনে যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে শুরু করলেন। পরের মাসগুলোতে ১৯৮৭এ নামের সুপারনোভাটির খুঁটিনাটি খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

শেলটনের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টা আগে ভিন্ন একটি জায়গায় আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। এ জায়গাটা জাপানে।

ভূমির অনেকটা গভীরে কামিওকা দস্তা খনি। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে কিছু পদার্থবিদ এখানে এক দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল বস্তুর অন্যতম মৌলিক উপাদান প্রোটন কণিকার চূড়ান্ত স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা। ১৯৭০ এর দশকে রচিত গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি অনুসারে প্রোটন খুব অস্থিতিশীল হতে পারে, যা এক ধরনের তেজস্ক্রিয়তার ফলে সময় সময় ক্ষয় হয়ে থাকতে পারে। এটা সত্যি হলে মহাবিশ্বের ভবিষ্যত নির্ধারণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এটা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব।

প্রোটনের ক্ষয় পরীক্ষার জন্যে জাপানের পরীক্ষকরা একটি ট্যাংককে ২০০০ টন অতিবিশুদ্ধ পানি দিয়ে পূর্ণ করলেন। এর চারপাশে রাখলেন উচ্চ-সংবেদনশীল ফোটন ডিটেকটর। ডিটেকটরের কাজ ছিল আলোর ঝলক খুঁজে বের করা। এখানে এমন আলো শুধু উচ্চ গতির প্রোটন ক্ষয়ের মাধ্যমেই আসতে পারে। পরীক্ষার জন্যে ভূমির গভীরের স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব কমানোর জন্যে। অন্যথায় অপ্রত্যাশিত সঙ্কেত পেতে পেতে অকার্যকর হয়ে ওঠত ডিটেক্টর।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ। হঠাৎ করে কামিওকা ডিটেক্টরগুলো এগারো সেকেন্ডের ব্যবধানে অন্তত সমান সংখ্যক সঙ্কেত দিল। এদিকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ওহাইয়োর সল্ট মাইনে একই রকম একটি ডিটেক্টরে ধরা পড়ল আটটি সঙ্কেত। এক সাথে এতগুলো ক্ষয় হয়ে যাবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। অবশ্যই অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকবে এর। পদার্থবিদরা শীঘ্রই সে ব্যাখ্যাটা পেয়েও গেলেন। তাঁদের ডিটেক্টরে ধরা পড়া প্রোটন ক্ষয়ের কারণ অন্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেটা হলো নিউট্রিনোর আঘাত।

নিউট্রিনোরা এক ধরনের অতিপারমাণবিক কণা। সামনেও এদের কথা আরও আসবে। তাই এখনই খানিকটা বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার। ১৯৩১ সালে উলফগ্যাং পাউলি প্রথম এদের অস্তিত্বের ধারণা দেন। এ তাত্ত্বিক পদার্থবিদের জন্ম অস্ট্রিয়ায়। তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার বেটা ক্ষয় নামক অস্পষ্ট দিকটি ব্যাখ্যার জন্যে এ ধারণা দেন তিনি। একটি সাধারণ বেটা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় একটি নিউট্রন ভেঙে গিয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত হালকা কণা হলেও উল্লেখখযোগ্য পরিমাণ শক্তি সাথে নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো প্রতিটি ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তি নিয়ে বের হয়। নিউট্রনের ক্ষয় থেকেও প্রাপ্ত মোট শক্তি থেকেও কিছুটা কম। যেহেতু সব ক্ষেত্রেই মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুব, মনে হচ্ছে চূড়ান্ত শক্তি প্রাথমিক শক্তি থেকে আলাদা। এটা হবার কথা নয়। কারণ, শক্তি সংরক্ষিত থাকবে- এটা পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক নীতি। তাই পাউলি প্রস্তাব করলেন, ঐ হারানো শক্তিটুকু অন্য কোনো অদৃশ্য কণা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কণাটিকে শনাক্তের প্রাথমিক চেষ্টা সফল হয়নি। এটা জানা হয়ে গেলে যে এই কণাদের অস্তিত্ব থাকলেও ভেদনক্ষমতা হবে অত্যধিক। আমরা জানি, বৈদ্যুতিকভাবে চার্জযুক্ত যেকোনো কণা বস্তু দ্বারা আবদ্ধ হবে। ফলে পাউলির প্রস্তাবিত কণাটিকে তড়িৎ প্রশম হতে হবে। কোনো চার্জ থাকবে না) এজন্যেই এর নাম দেওয়া হলো নিউট্রিনো। (নিউট্রাল (n e u t r a l) অর্থই প্রশম)

সে সময় কেউ নিউট্রিনোর দেখা না পেলেও তাত্ত্বিকরা এর আরও অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য জেনে গেলন। একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিউট্রিনোর ভর নিয়ে।

দ্রুতগামী কণিকাদের ক্ষেত্রে ভর নিয়ে একটু সাবধানে কথা বলতে হয়। কারণ, বস্তুর ভর নির্দিষ্ট নয়। নির্ভর করে বেগের ওপর। যেমন এক কেজি ওজনের একটি সিসার বলের কথা ভাবা যাক। এটি সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কি.মি. বেগে চললে এর ভর হয়ে যাবে ২ কেজি। এখানে নাটের গুরু আসলে আলোর বেগ। কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের যত কাছে যাবে, তার ভর তত বেশি হবে। ভরের এই বৃদ্ধির শেষ নেই কোনো। ভর এভাবে বদলে যাচ্ছে বলে বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে অতিপারমাণবিক কণাদের ভর বলার সময় পদার্থবিদরা নিশ্চল ভরের কথা বলেন। কণাটি আলোর কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করলে এর প্রকৃত ভর নিশ্চল ভরের বহুগুণ হয়ে যেতে পারে। কণা ত্বরকযন্ত্রের ভেতর প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন ও প্রোটনদের ভর তাদের নিজ নিজ নিশ্চল ভরের বহুগুণও হতে পারে।

নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর জানার উপায় একটি আছে অবশ্য। অনেক ক্ষেত্রে বেটা ক্ষয় প্রক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন নির্গত হতেই পুরো শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। নিউট্রিনোর জন্যে কিছুই বাকি থাকে না। তার মানে অনিবার্যভাবেই নিউট্রিনোকে টিকে থাকতে হয় কোনো শক্তি ছাড়াই। এখন, আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্র অনুসারে ভর এবং শক্তি সমতুল্য। তার মানে, শক্তি নেই মানে ভরও নেই। তার অর্থ দাঁড়ায়, সম্ভবত নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর খুব অল্প। শূন্যও হতে পারে। নিশ্চল ভর সত্যিই শূন্য হলে নিউট্রিনো চলবে আলোর গতিতে। আর তা না হলেও এর বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছিই হবে।

অতিপারমাণবিক কণিকাদের ঘূর্ণনের সাথে আরেকটি বিষয়ও জড়িত আছে। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন সবাইকে সব সময় ঘুরতে দেখা

যায়। ঘূর্ণনের মাত্রা নির্দিষ্ট। এবং তিনটির ক্ষেত্রেই মাত্রাটা সমপরিমাণ। ঘূর্ণন হলো এক ধরনের কৌণিক ভরবেগ। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নামে একটি সূত্র আছে। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির মতোই এটিও একটি মৌলিক সূত্র। একটি নিউট্রন ক্ষয় হলে ক্ষয় হওয়া অংশেও এর ঘূর্ণন অবিকৃত থাকবে। ইলেকট্রন আর প্রোটন যদি একই দিকে ঘোরে, তবে তাদের ঘূর্ণনের যোগফল হবে নিউট্রনের ঘূর্ণনের দ্বিগুণ। তবে তারা যদি ভিন্ন দিকে ঘোরে, সেক্ষেত্রে যোগফল হবে শূন্য। ঘটনা যাই হোক, একটি প্রোটন বা একটি ইলেকট্রন একা নিউট্রনের সমান হতে পারে না। কিন্তু নিউট্রিনোর কথা হিসাবে ধরলে ভারসাম্য হয়। শুধু ধরে নিতে হবে নিউট্রিনোর ঘূর্ণনের মাত্রাও অন্যদের মতো। সেক্ষেত্রে ক্ষয়কৃত তিনটি অংশের দুটো ঘুরবে একই দিকে, আর তৃতীয়টি উল্টোদিকে।

ফলে নিউট্রিনো শনাক্ত হবার আগেই পদার্থবিদরা বুঝে ফেললেন, এই কণার বৈদ্যুতিক চার্জ থাকবে না। ঘুরবে ইলেকট্রনের মতো একই দিকে। ভর থাকবে না বা থাকলেও সেটা হবে স্বল্প পরিমাণ। সাধারণ বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে এতই দুর্বলভাবে যে তার কোনো লক্ষণই চোখে পড়বে না। এক কথায়, এটি এক ধরনের ঘুরন্ত ভূত। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে পাউলির অনুমানের পরে পরীক্ষাগারে এর অস্তিত্ব নিশ্চিত করে প্রমাণ করতে প্রায় বিশ বছর লেগে গেছে। বর্তমানে নিউক্লীয় চুল্লিতে এরা সংখ্যায় সংখ্যায় তৈরি হয়। ফলে লুকানো স্বভাবের হলেও মাঝেমাঝেই এদেরকে শনাক্ত করে ফেলা যায়।

একই সাথে কামিওকা খনিতে নিউট্রিনোর হানা এবং ১৯৮৭এ সুপারনোভার আবির্ভাব কোনোমতেই কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। বিজ্ঞানীদের মতে দুটো ঘটনা একই সাথে ঘটার মধ্যে সুপারনোভা তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত দিন ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো সুপারনোভা থেকেই এক ঝাঁক নিউট্রিনো আসার প্রত্যাশা করছিলেন।

লাতিন ভাষায় নোভা মানে নতুন। তবে ১৯৮৭এ নামের সুপারনোভাটি নতুন কোনো নক্ষত্রের জন্ম ছিল না। এটি আসলে ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে পুরাতন এক নক্ষত্রের মৃত্যু। সুপারণোভাটির উৎস লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড একটি ক্ষুদ্র ছায়াপথ। দূরত্ব ১ লক্ষ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। এটি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের এতটাই কাছে যে এটি অনেকটা মিল্কিওয়ের উপছায়াপথ (s a t e l l i t e g a l l a x y)। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে একে খালি চোখেও দেখা যায়। ছোপ ছোপ আলোর একটি দাগ। নক্ষত্রগুলোকে আলাদা করে দেখতে হলে চাই বড় টেলিস্কোপ। শেল্টনের আবিষ্কারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিদরা জেনে ফেললেন, লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের কয়েক শ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কোনটি এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা করার জন্যে তাঁরা আকাশের ঐ অংশের আগের কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করেন। নক্ষত্রটি ছিল বি৩ সুপারজায়ান্ট শ্রেণির[১] এটি সূর্যের তুলনায় চওড়া ছিল ৪০ গুণ। নামও আছে একটি। স্যান্ডুলিক-৬৯ ২০২ (S a n d u l e a k -6 9 2 0 2)।

নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এই বিষয় নিয়ে প্রথম গবেষণা চালান জ্যোর্তিপদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল, উইলিয়াম ফুলার এবং জেফ্রি ও মারগারেট বারবিজ। এটা ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝির কথা। এমন উত্তাল দশায় নক্ষত্ররা কী করে পৌঁছায় তা জানতে হলে বুঝতে হবে এদের ভেতরে চলা প্রক্রিয়াগুলো। আমাদের সবচেয়ে চেনাজানা নক্ষত্র হলো সূর্য। অন্য নক্ষত্রের মতোই দেখে মনে হচ্ছে সূর্যে কোনো পরিবর্তন নেই। আসলে কিন্তু সূর্য প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সব নক্ষত্রই গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস জড়সড় থাকে মহাকর্ষের কারণে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মহাকর্ষ একা থাকলে নক্ষত্রটি নিজের তীব্র আকর্ষণে নিমেষের মধ্যে গুটিয়ে যেত। উধাও হয়ে যেত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু সেটা হয় না। কারণ ভেতরের দিকের এই বলের বিপরীতে বাইরের দিকে কাজ করে আরেকটি বল। নক্ষত্রের অভ্যন্তরের সঙ্কুচিত গ্যাসের বহির্মুখী চাপ। দুটোতে তৈরি হয় ভারসাম্য।

গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি সরল সম্পর্ক আছে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে তাপমাত্রার অনুপাতে এর চাপ বাড়ে। আবার তাপমাত্রা কমলে কমে যায় চাপও। নক্ষত্রের ভেতরে তীব্র চাপের কারণ এর তীব্র তাপমাত্রা। বহু মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপের উৎস হলো নিউক্লীয় বিক্রিয়া। নক্ষত্রের জীবনের বেশিরভাগ সময় জুড়ে একটি বিক্রিয়াই চলে। সেটা হলো ফিউশন (সংযোজন) বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তর। পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রনরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এই বিকর্ষণকে পরাভূত করতে বিক্রিয়ার তাপমাত্রা হতে হয় প্রচণ্ড। ফিউশনের শক্তি একটি নক্ষত্রকে কয়েক শ কোটি বছর টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এক দিন না এক দিন জ্বালানি ঠিকই ফুরিয়ে আসে। দুর্বল হয়ে পড়ে বিক্রিয়ার গতি। এবার বহির্মুখী চাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। জিতে যায় মহাকর্ষ। নক্ষত্রটি তার অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে মহাকর্ষজনিত অন্ত:স্ফোটন (ভেতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া) প্রতিহত করে আরেকটু সময় বেঁচে থাকে। কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে প্রতিবার মহাশূন্যে শক্তি নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথে অন্তিম সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসতে থাকে।

হিসাব করে দেখা গেছে, যে পরিমাণ হাইড্রোজেন নিয়ে সূর্যের পথ চলা শুরু হয়েছে তাতে তার প্রায় এক হাজার কোটি বছর জ্বলার কথা। এখন বয়স পাঁচ শ কোটি বছর। মানে প্রায় অর্ধেক জ্বালানি শেষ। (এখনও ভয়ের কিছু নেই) একটি নক্ষত্র কী হারে নিউক্লীয় জ্বালানি খরচ করবে তা নির্ভর করে এর ভরের ওপর। ভারী নক্ষত্ররা জ্বালানি খরচ করে অনেক দ্রুত। তা না করে যে উপায় নেই। এরা বড় এবং উজ্জ্বল। ফলে বিকিরণ করে বেশি পরিমাণ শক্তি। বাড়তি ওজনের কারণে গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা যায় বেড়ে। ফলে বেড়ে যায় ফিউশনের হার। যেমন ১০ সৌর ভরের একটি নক্ষত্র এর বেশিরভাগ হাইড্রোজেন মাত্র এক কোটি বছরেই শেষ করে ফেলতে পারে।

এমন ভারী একটি নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে দেখা যাক। বেশিরভাগ নক্ষত্রের জীবন শুরু হয় মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মানে কেবল একটি প্রোটন। হাইড্রোজেনের 'দহন'[২] প্রক্রিয়ায় দুটো হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম মৌলের নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। এর প্রতিটিতে থাকে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটু জটিল আর সেটা আমাদের আপাতত দরকারও নেই) নিউক্লীয় শক্তির সবেচেয় কার্যকরী উৎস হলো হাইড্রোজেন 'দহন'। তবে এটাই একমাত্র উৎস নয়। অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি হলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে কার্বন গঠন করতে পারে। তারও পরে ফিউশনের মাধ্যমে অক্সিজেন, নিয়ন ও অন্যান্য মৌল তৈরি হয়। একের পর এক নিউক্লীয় বিক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা উৎপন্ন করার কাজ ভারী নক্ষত্ররা করতে পারে। মাঝে মাঝে সে তাপমাত্রা এক শ কোটির ওপরেও হয়।

কিন্তু শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রতিটি নতুন মৌল তৈরির সাথে সাথে নির্গত শক্তির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। জ্বালানি দ্রুত থেকে দ্রততর খরচ হতে থাকে। নক্ষত্রের উপাদান বদলে যেতে থাকে। শুরুতে প্রতি মাসে, পরে প্রতি দিন এবং শেষমেষ প্রতি ঘণ্টায়। অভ্যন্তরভাগ দাঁড়ায় পেঁয়াজের মতো। এখানে স্তরগুলো হলে উত্তাল প্রক্রিযায় ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা রাসায়নিক মৌলগুলো। বাইরের দিকে আবার নক্ষত্রটি ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে যায়। হয়ে যায় আমাদের পুরো সৌরজগতের চেয়েও বড়। একেই জ্যোতির্বিদরা বলেন লোহিত অতিদানব (r e d s u p e r g i a n t)।

নিউক্লীয় দহন প্রক্রিয়ার ইতি ঘটে লোহা তৈরির মাধ্যমে। এর নিউক্লীয় গঠনটা বেশ স্থিতিশীল। নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে লোহার চেয়ে ভারী মৌল গঠিত হতে নক্ষত্রের নিজেরই শক্তি ধার করতে হয়। নির্গত করা তো পরের কথা। ফলে লোহা তৈরি হয়ে গেছে মানে একটি নক্ষত্রের এখানেই সমাপ্তি। কেন্দ্রীয় অঞ্চল যখন আর তাপ উৎপন্ন করতে না পারবে, দাবার গুটি চলে যাবে মহাকর্ষের হাতে। নক্ষত্রটি হয়ে পড়ে চরমভাবে ভারসাম্যহীন। পতিত হয় নিজস্ব মহাকর্ষীয় গর্তে।

পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে। নক্ষত্রের লোহায় গড়া কেন্দ্র নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে আর কোনো তাপ উৎপাদন করতে পারে না। ফলে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় নিজের ওজন। এত দ্রুত গুটিয়ে যায় যে পরমাণুগুলো পর্যন্ত দুমড়ে-মুচড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে একটি আঙ্গুলের মাথায় যে পরিমাণ পদার্থ আঁটবে সেটাই প্রায় এক লক্ষ কোটি টন। এ দশায় নক্ষত্রটির কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস হয় মাত্র দুই শ কিলোমিটার। নিউক্লীয় পদার্থের কাঠিন্যের ফলে এটি লাফালাফি করবে। মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে এই বিশাল ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে কয়েক মিলিসেকেন্ড। কেন্দ্রে যেন নাটকের কোনো শেষ নেই। আকস্মিকভাবে তীব্র আলোড়নের মাধ্যমে নাক্ষত্রিক পদার্থের আশপাশের স্তরগুলো এসে পতিত হয় কেন্দ্রমণ্ডলে। সেকেন্ডে অযুত অযুত বেগে চলে ভেতরের দিকের এই গতি। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন[৩] পদার্থ এসে আঘাত হানে তীব্র ঘন কেন্দ্রমণ্ডলে। কেন্দ্রমণ্ডল হয় হীরার দেয়ালের চেয়েও দৃঢ়। এরপর হয় তীব্র সংঘর্ষ। যার ফলে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি শক্তিশালী শক ওয়েভ।

শক ওয়েভের সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ নিউট্রিনোও নির্গত হয়। নক্ষত্রের সর্বশেষ নিউক্লীয় রূপান্তরের সময় ভেতরের এলাকা থেকে আকস্মিকভাবে বের হয় কণাগুলো। এই রূপান্তরের প্রাক্কালেই নক্ষত্রের পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলিত হয়ে গঠন করে নিউট্রন। ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রমণ্ডল নিউট্রনের এক বিশাল গোলকে পরিণত হয়। শক ওয়েভ ও নিউট্রিনোরা যৌথভাবে নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলোর দিকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পরিবহন করে। এই শক্তি শোষণ করে নক্ষত্রের বাইরের স্তর বিস্ফোরিত হয়। এক ভয়াবহ নিউক্লীয় বিস্ফোরণ। কয়েক দিন যাবত নক্ষত্রটি হাজার কোটি সূর্যের আলো বিকিরণ করে। কয়েক সপ্তাহ পর আবার ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে।

মিল্কিওয়ের মতো আদর্শ গ্যালাক্সিগুলোতে প্রতি শতাব্দীতে দুই কি তিনটি সুপারনোভা দেখা যায়। জ্যোতির্বিদরা বিস্ময়ভরা চোখে সেগুলো নথিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত একটি দেখা গিয়েছিল ১০৫৪ সালে। চীনা ও আরব জ্যোতির্বিদরা এটি পর্যবেক্ষণ করেন। অবস্থান ছিল আকাশের কর্কট মণ্ডলীতে। বিদীর্ণ সেই তারকাটিকে আজ প্রসারণশীল গ্যাসের ছেঁড়া মেঘের মতো লাগে। নাম ক্র্যাব নেবুলা বা কাঁকড়া

নীহারিকা।

১৯৮৭এ সুপারনোভার বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে বহু অদৃশ্য নিউট্রিনো ছড়িয়ে পড়ে। এই নিঃসরণের তীব্রতা ছিল মারাত্মক। পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় এক অযুত কোটি নিউট্রিনো আঘাত হানে। যদিও বিস্ফোরণস্থল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ লক্ষ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। অন্য একটি ছায়াপথ থেকে আসা বহু ট্রিলিয়ন কণা যে পৃথিবীর মানুষের শরীর ভেদ করে চলে গেছে তা তারা জানতেও পারেনি কিন্তু কামিওকা ও ওহাইয়ো প্রোটন-ক্ষয় ডিটেক্টরগুলো ১৯টি নিউট্রিনোকে ধরে ফেলে। এই ব্যবস্থা না থাকলে নিউট্রিনোগুলো সবার অজান্তে চলে যেত। যেমনটি গিয়েছিল ১০৫৪ সালে।

সুপারনোভা মানেই একটি নক্ষত্রের মৃত্যু। তবে বিস্ফোরণের একটি ভালো দিকও আছে। বিপুল পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হবার ফলে নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তাপ এত বেশি হয় যে কিছু সময়ের জন্যে আবারও নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া হতে পারে। এ বিক্রিয়া শক্তি নির্গত করার বদলে শোষণ করে। সবচেয়ে উত্তাল এই নাক্ষত্রিক চুল্লিতেই লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো প্রস্তুত হয়। এই যেমন, সোনা, সিসা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। কার্বন, অক্সিজেনের মতো নিউক্লীয় সংশ্লেষের প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হালকা মৌলগুলোর সাথে সাথে এই ভারী মৌলগুলোও মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। মিশে যায় অন্য সুপারনোভাদের নিক্ষিপ্ত এমন অসংখ্য পদার্থের সাথে। পরবর্তী সময়ে এই ভারী পদার্থগুলো নতুন প্রজন্মের নক্ষত্র ও গ্রহে পরিণত হয়। এই মৌলগুলো প্রস্তুত বা নিক্ষিপ্ত না হলে পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ তৈরি হত না। প্রাণ তৈরির কাঁচামাল কার্বন ও অক্সিজেন, ব্যাংকে রক্ষিত সোনা, ছাদের সিসার আস্তর, নিউক্লীয় চুল্লিতে ইউরেনিয়ামের রড–পৃথিবীর এই সব কিছু হয়েছে নক্ষত্রদের জীবনের বিনিময়ে। আমাদের সূর্যের জন্মের আগেই যাদের জীবনের ইতি ঘটেছিল। ভাবতেই কেমন লাগে, আমাদের শরীর যে উপাদান দিয়ে তৈরি তা বহু কাল ধরে মৃত নক্ষত্রের নিউক্লীয় ছাই দিয়ে গড়া।

সুপারনোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্র সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না। তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ পদার্থ বেরিয়ে গেলেও সঙ্কুচিত যে কোর বা কেন্দ্রমণ্ডল ঐ ঘটনার সূত্রপাত করেছিল, সেটি থেকে যায় নিজের অবস্থানেই। তবে এর নিয়তিও যে কী হবে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কোরের ভর যদি খুব কম হয়, এই ধরুন এক সৌর ভর, তাহলে এটি ছোট শহরের সাইজের একটি নিউট্রনের গোলকে পরিণত হবে। খুব সম্ভব এই নিউট্রন নক্ষত্রটি উন্মত্তভাবে ঘুরতে থাকবে। সম্ভবত প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ বার। মানে এর পৃষ্ঠে ঘুর্ণন বেগ হবে আলোর বেগের ১০ শতাংশ। এর কারণ হলো সঙ্কোচন। যার ফলে অল্প ঘূর্ণন নিয়ে শুরু হওয়া নক্ষত্রটিও জোরে ঘুরতে থাকে। বরফের ওপর স্কেটিং করা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিলেও ঠিক একই কারণে অপেক্ষাকৃত জোরে ঘুরা যায়। এভাবে জোরে আবর্তনশীল বহু নিউট্রন নক্ষত্র জ্যোতির্বিদরা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আবর্তন ধীরে ধীরে কমে আসে। কারণ, বস্তুটি শক্তি হারাতে থাকে। যেমন কাঁকড়া নীহারিকার মধ্যখানে অবস্থিত নিউট্রন নক্ষত্রটি এখন সেকেন্ডে মাত্র ৩৩ বার ঘুরে।

তবে কোরের ভর যদি আরেকটু বেশি হয়, এই ধরুন কয়েক সৌর ভর, তাহলে এটি নিউট্রন হয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। মহাকর্ষ এক্ষেত্রে অনেক শক্তিশালী। নিউট্রন দিয়ে গড়া বস্তু বর্তমানে জানা সবচেয়ে দৃঢ় বস্তু। কিন্তু এই নিউট্রনও বাড়তি সঙ্কোচন ঠেকাতে পারে না। ঘটনা গড়াতে থাকে আরও দারুণ পরিণতির দিকে। সুপারনোভার চেয়েও উত্তাল। নক্ষত্রের কোর গুটিয়ে যেতেই থাকে। এক মিলিসেকেন্ডেরও কম সময়ে এটি একটি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর বানিয়ে ফেলে। হারিয়ে যায় দৃশ্যমান জগৎ থেকে।

তার মানে, ভারী নক্ষত্রদের নিয়তি হলো ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায় একটি নিউট্রন নক্ষত্র বা একটি ব্ল্যাক হোল। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নিক্ষিপ্ত গ্যাসের দল। কে জানে কত কত নক্ষত্র এখন পর্যন্তএই পরিণতি বরণ করেছে। কিন্তু শুধু মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই এমন বিলিয়ন বিলিয়ন নাক্ষত্রিক ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে পারে।

ছোট বেলায় আমি খুব ভয় পেতাম যে সূর্য হয়ত বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। আসলে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। এটি কখনও সুপারনোভা হবে না। এর ভর অত বেশি নয়। ভারী নক্ষত্রের তুলনায় হালকাগুলোর নিয়তি এত উত্তাল নয়। প্রথম কথা হলো, এক্ষেত্রে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ায় জ্বালানি ব্যয় হয় অনেক কম গতিতে। ন্যূনতম নাক্ষত্রিক ভরের একটি বামন নক্ষত্র এক ট্রিলিয়ন বছর যাবত একই হারে আলো দিয়ে যেতে থাকতে পারে। তার ওপর একটি হালকা নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এত বেশি হওয়া সম্ভব নয় যে এটি লোহাও সংশ্লেষ করবে। ফলে এতে উত্তাল অন্তঃস্ফোটন ঘটতে পারে না।

সূর্য স্বল্প ভরের নক্ষত্রের একটি আদর্শ উদাহরণ। হাইড্রোজেন জ্বালানি খরচ ও হিলিয়ামে রূপান্তর হচ্ছে খুব ধীরেসুস্থে। হিলিয়াম মূলত থাকে

কেন্দ্রীয় কোরের দিকে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা বললে কোরকে নিষ্ক্রিয়ই বলতে হবে। ফিউশন সংঘটিত হয় কোরের পৃষ্ঠে। ফলে মহাকর্ষীয় বলের সঙ্কোচন রোধ করার জন্যে সূর্যের যে পরমাণ তাপ প্রয়োজন কোর তা তৈরিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। সঙ্কোচন ঠেকাতে নতুন হাইড্রোজেনের সন্ধানে সূর্যকে এর নিউক্লীয় কর্মকাণ্ড বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। এদিকে হিলিয়াম কোর ক্রমেই ছোট হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ এসব পরিবর্তনের ফলে সময়ের সাথে সাথে সূর্যের চেহারা ক্রমশ বদলে যাবে। এটি ফুলে-ফেঁপে উঠবে। কিন্তু পৃষ্ঠ কিঞ্চিত ঠাণ্ডা হবে। দেখা যাবে হালকা লাল আভা। এ অবস্থা চলতে থাকবে যত দিন না সূর্য লোহিত দানবে (r e d gi ant) পরিণত হয়। এ সময় সম্ভবত এটি বর্তমান সময়ের পাঁচ শ গুণ বড় হবে। জ্যোতির্বিদদের কাছে লোহিত দানব একটি পরিচিত নাম। আকাশের বেশ কটি পরিচিত উজ্জ্বল নক্ষত্রই এই শ্রেণির নক্ষত্র। যেমন, আলদাবেরান (Al debar an), আদ্রা (Bet el geuse) ও স্বাতী (Ar c t ur us)। স্বল্প ভরের নক্ষত্রদের সমাপ্তির শুরু হয় লোহিত দানব দশার মাধ্যমে।

লোহিত দানবরা অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। তবে সাইজ বড় হবার কারণে এদের বিকিরণ পৃষ্ঠ হয় বিশাল। তার মানে সার্বিক দীপ্তি বা (l umi nosi t y) ঔজ্জ্বল্যও বেশি। এ সময় কপাল পুড়বে সূর্যের গ্রহগুলোর। আরও প্রায় চার শ কোটি বছর পর বর্ধিত তাপ প্রবাহ আঘাত হানবে এদের ওপর। তার অনেক আগেই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। সাগর শুকিয়ে যাবে আর উড়ে যাবে বায়ুমণ্ডল। এরপর সূর্য আরও বিস্তৃত হবে। গ্রাস করবে বুধ গ্রহকে। তারপর শুক্র। পরিশেষে পৃথিবীকেও নিয়ে নিবে আগ্রাসী পেটের ভেতর। আমাদের গ্রহখানি পরিণত হবে অঙ্গারে। এত দহন সহ্য করেও কিন্তু যাবে না কক্ষপথ ছেড়ে। সূর্যের লাল-উষ্ণ গ্যাসের ঘনত্ব এত কমে যাবে যে সেটা শূন্য স্থানের কাছাকাছি হবে। ফলে পৃথিবীর গতি হবে প্রায় মসৃণ।

মহাবিশ্বে আমাদের অস্তিত্বের কারণ সূর্যের মতো এমন অসাধারণ স্থিতিশীল নক্ষত্র। যেটি কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে অবিরত জ্বলতে পারে। যে সময়টা জীবনের স্পন্দন তৈরি ও বিকাশের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু লোহিত দানব দশায় এই স্থিতিশীলতার ইতি ঘটবে। সূর্যের মতো নক্ষত্রের জীবনের পরের ধাপগুলো জটিল, অনির্দিষ্ট ও উত্তাল। হঠাৎ করে বদলে যায় আচরণ ও চেহারা। বয়স্ক নক্ষত্ররা স্পন্দিত হতে হতে বা গ্যাসের খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে নিযুত নিযুত বছর পার করে দিতে পারে। নক্ষত্রের কোরের হিলিয়াম দহন সংঘটিত করে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। ফলে নক্ষত্রটি আরও কিছু দিন বেঁচে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যায়। বাইরের স্তরটিকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করার পরে নক্ষত্রটির কাছে কার্বন-অক্সিজেনে গড়া কোর ছাড়া আর কিছু থাকে না।

জটিল কার্যক্রমের এই যুগ শেষ হলে স্বল্প ও মাঝারি ভরের নক্ষত্ররা শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হয় সঙ্কুচিত। এই সঙ্কোচন অপ্রতিরোধ্য। শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের সাইজ গ্রহের সমান করে তবে ছাড়ে। এ অবস্থায় বস্তুটিকে জ্যোতির্বিদরা বলেন শ্বেত বামন (whi t e dwar f)। সাইজ ছোট হবার কারণে শ্বেত বামনরা খুব অনুজ্জ্বলও। যদিও তাদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা হতে পারে সূর্যের চেয়েও বেশি। কোনোটিকেই টেলিস্কোপ ছাড়া পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

দূর ভবিষ্যতে শ্বেত বামনে পরিণত হওয়াটাই লেখা আছে আমাদের ভাগ্যে। এ অবস্থায় পৌঁছার পর বহু বিলিয়ন বছর ধরে উত্তপ্ত থাকবে সূর্য। এর বিশাল অবয়ব এত শক্ত হবে যে এটি এর অভ্যন্তরীণ তাপ খুব দক্ষতার সাথে আটকে রাখবে। আমাদের জানা সেরা তাপ রোধকের চেয়েও ভালোভাবে। কিন্তু ভেতরের নিউক্লীয় চুল্লিতে যেহেতু চিরদিনের জন্যে লালবাতি জ্বলে গেছে, তাই ভেতরে আর কোনো বাড়তি জ্বালানি অবশিষ্ট নেই। ফলে তারকাটি থেকে ধীরে ধীরে শীতল মহাশূন্যের গভীরের দিকে যে তাপীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে সেটা পূরণ করা সম্ভব নয়। খুব ধীরে বামন ধ্বংসাবশেষটি শীতল ও অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। যদিও এক সময় তা ছিল আমাদের তেজস্বী সূর্য। আর একটি পরিবর্তন বাকি। এবার এটি ক্রমশ একটি কঠিন স্ফটিকে (c r y st al) পরিণত হবে। দৃঢ়তা হবে অসামান্য। শেষে এটি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিরবে মিশে যাবে মহাশূন্যের অন্ধকারে।

অনুবাদকের নোট:

13. তাপমাত্রার ভিত্তিতে নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগে O, B, A, F, G, K ও M বর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়। এ ক্রমানুসারে O শ্রেণির নক্ষত্র সবচেয়ে উষ্ণ। আর M শ্রেণির নক্ষত্র সবচেয়ে কম উষ্ণ।
14. সাধারণ অর্থে দহন বলতে বোঝায় কোনো মৌলের সাতে অক্সিজেনে বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়ে যাওয়া। তবে সেটা হলো এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এখানে কথা হচ্ছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন কোনো মৌল উৎপন্ন হতে পারে না। কিন্তু নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় হয় এ কাজটিই।

15. এক ট্রিলিয়ন সমান এক লক্ষ কোটি, মানে ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্ধকার অমানিশা

অযুত নক্ষত্রের আলো নিয়ে জ্বলে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky Way galaxy)। প্রতিটি নক্ষত্রের গলায় ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা। আজ আমরা যাদেরকে দেখছি, এক হাজার কোটি বছরের মধ্যে তাদের বেশিরভাগই দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে। মারা যাবে জ্বালানির অভাবে। কারণ তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র।

আকাশগঙ্গায় তবু নক্ষত্রের আলো থাকবে। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে আবার তাদের জায়গায় নতুন নক্ষত্রেরও জন্ম হয়। ছায়াপথের সর্পিল বাহুতে থাকা গ্যাসীয় মেঘ সঙ্কুচিত হয়, মহাকর্ষের প্রভাবে গুটিয়ে আসে ও আলাদা আলাদা এক গুচ্ছ নক্ষত্রের জন্ম দেয়। আমাদের সূর্যও এমন একটি বাহুতেই অবস্থিত। কালপুরুষ তারামণ্ডলের দিকে এক নজর তাকালেও এমন একটি নাক্ষত্রিক কারখানা খুঁজে পাওয়া যায়। কালপুরুষের তলোয়ারের কেন্দ্রের ঘোলাটে আলোখানা কোনো তারকা নয়। এটি একটি নেবুলা বা নীহারিকা। বিশাল এক গ্যাসীয় মেঘ। সাথে আছে উজ্জ্বল নতুন নতুন নক্ষত্র। দৃশ্যমান আলোর বদলে অবলোহিত বিকিরণ দিয়ে জ্যোতির্বিদরা এই নীহারিকায় কিছু নক্ষত্রকে তাদের জন্মের একেবারে শুরুর দশাগুলোতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরা এখনও গ্যাস ও ধুলোয় ঢেকে আছে।

যত দিন যথেষ্ট গ্যাস আছে, আমাদের ছায়াপথের সর্পিল বাহুগুলোতে নক্ষত্রের জন্ম হতেই থাকবে। ছায়াপথের গ্যাসগুলোর কিছু অংশ প্রারম্ভিক দশায় আছে। এখনও যেগুলো নক্ষত্রে পরিণত হতে পারেনি। কিছু অংশ আবার সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে এসেছে। অথবা এসেছে নাক্ষত্রিক বায়ু, ছোট ছোট ঝড় ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে পারে। পুরাতন নক্ষত্ররা মারা গিয়ে ও সঙ্কুচিত হয়ে শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র ব্ল্যাক হোল হয়ে গেলে আর আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে নতুন পদার্থ সরবরাহ করতে পারবে না। ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক গ্যাসগুলো সব নক্ষত্র হতে থাকবে। এক সময় তাও শেষ হয়ে যাবে। শেষের দিকের এই নক্ষত্রগুলোও জীবনের পাঠ চুকিয়ে মারা গেলে ছায়াপথ খুব অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। তবে কাজটা হুট করে হয়ে যাবে না। ছোট ও নতুন নক্ষত্ররা তাদের নিউক্লীয় দহন সম্পূর্ণ করে গুটিয়ে শ্বেত বামন হতে বহু বিলিয়ন বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রক্রিয়া ধীর হলেও বিভীষিকাময় অনন্ত রাত একদিন নেমে আসবেই।

চির প্রসারণশীল মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাকি সব ছায়াপথের কপালেও ঐ একই জিনিস লেখা আছে। নিউক্লীয় শক্তির কল্যাণে বর্তমান মহাবিশ্ব জ্বলজ্বল করে আলো দিচ্ছে। কিন্তু এক দিন আলোর এই মূল্যবান উৎস ফুরিয়ে যাবে। আলোর যুগ চিরদিনের জন্যে বিদায় হবে।

তবে মহাজাগতিক আলো ফুরিয়ে গেলেই মহাবিশ্ব মারা যাবে না। কারণ শক্তির উৎস আছে আরেকটি, যা নিউক্লীয় বিক্রিয়ার চেয়েও শক্তিশালী। পারমাণবিক স্তরে চিন্তা করলে প্রকৃতির দুর্বলতম বল মহাকর্ষ। কিন্তু মহাজাগতিক মাপকাঠিতে এই বলটিই আবার রাজা। এর প্রভাব হতে পারে খুব মৃদু। কিন্তু সেটা নাছোড়বান্দার মতো কাজ করে যেতে থাকে। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর যাবত নক্ষত্ররা নিউক্লীয় দহনের মাধ্যমে নিজেদের ওজনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু মহাকর্ষ এত দিন শুধু ওঁতপেতে ছিল।

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের দুটি প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল সবল নিউক্লীয় বলের এক শ কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ ($১০^{-৩৭}$)। কিন্তু মহাকর্ষ বলটি ক্রমবর্ধমান। প্রতিটি বাড়তি প্রোটন বাড়তি ওজনের যোগান দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষ বল আগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। প্রবল শক্তির পেছনে এই তীব্র বলই মূল ভূমিকা রাখে।

মহাকর্ষের ক্ষমতা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রদর্শন করে ব্ল্যাক হোল। এখানে জয় হয়েছে ব্ল্যাক হোলের। সঙ্কোচনের ফলে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে গেছে শূন্য। সময়ের অসীম বিকৃতির আকারে আশেপাশের স্থানকালে সে ঘটনার একটি ছাপ পড়েছে। ব্ল্যাক হোল নিয়ে একটি দারুণ মানস পরীক্ষা (thought experiment) আছে। মনে করুন, অনেক দূর থেকে একটি ছোট, যেমন ১০০ গ্রাম ভরের বস্তুকে ব্ল্যাক হোলে ফেলে দেওয়া হলো। বস্তুটি দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে এবং চিরতরে নাগালের বাইরে চলে যাবে। তবে ব্ল্যাক হোলের কাঠামো এই ঘটনার একটি সাক্ষ্য বহন করবে। বস্তুটিকে খেয়ে ব্ল্যাক হোলের সাইজ খুব সামান্য পরিমাণ বড় হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, বস্তুটিকে অনেক দূর থেকে ফেলা হলে ব্ল্যাক হোলের ভর যতটুকু বাড়বে তা বস্তুটির মূল ভরের সমপরিমাণ। তার মানে, ভর বা শক্তির

এতটুকুও অন্য কোনো দিকে যাবে না।

এবার অন্য একটি পরীক্ষা। ভরটিকে এবার ধীরে ধীরে ব্ল্যাক হোলের দিকে নামানো হচ্ছে। এটা করার জন্য বস্তুটির সাথে একটি রশি লাগাতে হবে। এরপর সেটাকে পুলির ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ড্রামের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ড্রামের মাধ্যমে আস্তে আস্তে রশির প্যাঁচ খোলা হবে। (চিত্র ৫.১ দেখুন: আমরা ধরে নিচ্ছি রশিটি প্রসারিত হবে না। কোনো ওজনও থাকবে না। বাস্তবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়, কিন্তু জটিলতা এড়ানোর জন্যে ধরে নিতে হচ্ছে।) ভরটিকে নীচে নামানো হলে এটি শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। যেমন ড্রামের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালু করে এটা করা যেতে পারে। বস্তুটি ব্ল্যাক হোলের পৃষ্ঠের যত বেশি নিকটবর্তী হবে, তার ওপর হোলের মহাকর্ষীয় টান তত শক্তিশালী হবে। নিচের দিকে টান যত বাড়বে, বস্তুটি জেনারেটর দিয়ে ততই বেশি কাজ করাতে পারবে। বস্তুটি ব্ল্যাক হোলের পৃষ্ঠে পৌঁছতে পৌঁছতে জেনারেটরকে কী পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করবে তা সহজেই হিসাব করে বের করা যায়। আদর্শ ক্ষেত্রে এর উত্তর হবে, বস্তুটির সমগ্র নিশ্চল ভর-শক্তি। (নিশ্চল ভর সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট দেখুন।)

আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্রটি মনে আছে নিশ্চয়ই। m ভরের একটি বস্ত থেকে mc^2 পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। তত্ত্ব বলছে, ব্ল্যাক হোল ব্যবহার করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। ১০০ গ্রাম ভরের বস্তু থেকেই পাওয়া যাবে তিন শ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (মানে তিন শ কোটি ইউনিট বিদ্যুত-অনুবাদক) বিদ্যুৎ। তুলনার জন্যে বলে রাখি, সূর্য যখন ১০০ গ্রাম জ্বালানি ফিউশনের মাধ্যমে পুড়িয়ে এর এক ভাগেরও কম শক্তি সরবরাহ করে। মানে তত্ত্ব অনুসারে, মহাকর্ষীয় উপায়ে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা নক্ষত্রের শক্তি জোগানো তাপ-নিউক্লীয় ফিউশনের এক শ গুণ।

চিত্র ৫.১

আদর্শ এই মানস পরীক্ষায় একটি রশির সাহায্যে একটি বস্তুকে ধীরে ধীরে ব্ল্যাক হোলের পৃষ্ঠের দিকে নামানো হয়। ব্যবহার করা হয় একটি পুলি ব্যবস্থা (ছবিতে দেখানো হয়নি)। ফলে, নিচের নামা বস্তুটি কাজ করতে থাকে আর বক্সে শক্তি পাঠাতে থাকে। বস্তুটি ব্ল্যাক হোলে পৃষ্ঠের যতই কাছাকাছি হতে থাকে, পাঠানো মোট শক্তির পরিমাণ ততই বস্তুটির সমগ্র ভর-শক্তির পরিমাণের সমান হতে থাকে।

এখানে যে দুটো কৌশলের কথা বলা হলো তার দুটোই একেবারে অবাস্তব। নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক হোলে বস্তুরা পড়ে বিরতিহীনভাবে। শক্তি উদ্ধার করার মতো করে সুন্দর উপায়ে পুলি থেকে ঝুলে থাকে না। বাস্তবে নিশ্চল ভরের শূন্য ও এক শ ভাগের মাঝামাঝি মানের কোনো একটি শক্তি পাওয়া যাবে। প্রকৃত মানটা নির্ভর করবে ভৌত পরিস্থিতির ওপর। গত কয়েক দশকে জ্যোতির্পদার্থবিদেরা বিভিন্ন রকম কম্পিউটার সিমুলেশন[১] ও গাণিতিক মডেল বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। উদ্দেশ্য হলো পেঁচিয়ে ব্ল্যাক হোলের ভেতরে চলে যাওয়ার সময় গ্যাসের অবস্থা কেমন হয় এবং কী পরমাণু ও কীভাবে শক্তি বিমুক্ত হয় তা জানা। এখানে যে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বেশ জটিল। তবুও এটা বোঝা যাচ্ছে যে এসব জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ মহাকর্ষীয় শক্তি বেরিয়ে আসতে পারে।

একটি পর্যবেক্ষণ থেকে করা সম্ভব হাজার হাজার হিসাব-নিকাশ। এভাবে বস্তু গিলে খাবার সময় সম্ভাব্য ব্ল্যাক হোল খুঁজে পাওয়ার জন্যে জ্যোতির্বিদরা বড় আকারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এখন পর্যন্ত অকাট্যভাবে কোনো ব্ল্যাক হোল পাওয়া যায়নি। তবে সিগনাস বা বকমণ্ডলীতে অবস্থিত একটি সিস্টেমকে বেশ সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। নাম সিগনাস এক্স-১। অপটিকেল টেলিস্কোপের মাধ্যমে একটি বৃহৎ ও উত্তপ্ত নীল দানব (blue giant) শ্রেণির তারকা দেখা গেছে। রং নীল বলেই নাম নীল দানব হয়েছে। বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে তারকাটি একা নয়। নিয়ম মেনে মোচড় খাচ্ছে এটি। তার মানে, আশেপাশের কোনো বস্তুর মহাকর্ষ একে সময় সময় আকর্ষণ করছে। এর অর্থ, নিশ্চিত করেই বলা চলে, এই নক্ষত্রটি এবং অপর বস্তুটি একে অপরকে খুব কাছ থেকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু অপটিকেল টেলিস্কোপে অপর নক্ষত্রটিকে দেখা যাচ্ছে না। হয় এটি কোনো ব্ল্যাক হোল, নয়ত খুব অনুজ্জ্বল কোনো ক্ষুদ্র তারা। ফলে মনে যাচ্ছে এটি ব্ল্যাক হোল হতে পারে। তবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।[২]

অদৃশ্য বস্তুটির ভর থেকে পাওয়া যায় আরেকটি ইঙ্গিত। এটা নিউটনের সূত্র থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব। এর জন্যে দরকার শুধু নীল দানব তারাটির ভর জানা। নক্ষত্রের ভর ও রংয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে সেটাও সহজেই বের করে ফেলা যায়। নীল তারাদের উত্তাপ খুব বেশি। ফলে তাদের ভরও বেশি। হিসাব থেকে ধারণা করা যায় অদৃশ্য সঙ্গী তারকাটির ভর কয়েক সৌর ভরের সমতুল্য। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটি সাধারণ ছোট ও অনুজ্জ্বল কোনো তারা নয়। তার মানে এটি কোনো সঙ্কুচিত ভারী নক্ষত্রই হবে। শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাক হোল। কিন্তু কিছু মৌলিক ভৌত কারণে এত ভারী ক্ষুদ্র কোনো বস্তু শ্বেত বামন বা নিউট্রন নক্ষত্র হতে পারে না। এক্ষেত্রে থাকার কথা

তীব্র মহাকষীয় ক্ষেত্র, যা বস্তুটিকে গুটিয়ে ফেলতে চাইবে। সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে ব্ল্যাক হোল হয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে যদি কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ চাপ কাজ করে। যেটা মহাকর্ষের সঙ্কোচনের বিপরীত দিকে কাজ করবে। কিন্তু সঙ্কুচিত বস্তুটির ভর যদি হয় কয়েক সৌর ভরের সমান, তবে কোনো বলের পক্ষেই এর দুমড়ে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব নয়। এবং নক্ষত্রটির অভ্যন্তরভাগ যদি দুমড়ানো ঠেকানোর মতো দৃঢ় হতো, তাহলে বস্তুটিতে শব্দের বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যেত। কিন্তু এটা বিশেষ আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ পদার্থ ও জ্যোতির্বিদের মতে এসব পরিস্থিতিতে ব্ল্যাক হোলের জন্ম অনিবার্য।

সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে ব্ল্যাক হোল থাকার সপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ এসেছে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে। এর নাম এক্স-১ দেওয়ার কারণ সিস্টেম এক্স-রে (রঞ্জন রশ্মি) এর একটি শক্তিশালী উৎস। কৃত্রিম উপগ্রহে থাকা সেন্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় সেই রশ্মি। সিগনাস এক্স-১ এর অদৃশ্য বস্তুটিকে ব্ল্যাক হোল ধরে নিলে তাত্ত্বিক নমুনা এই এক্স-রেকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। ব্ল্যাক হোলের পরিমাপকৃত মহাকর্ষ ক্ষেত্র এতই শক্তিশালী যে এটি নীল দানব তারাটি থেকে পদার্থ খুবলে নিতে পারে। ছিনতাই করা গ্যাস চলে যায় ব্ল্যাক হোলের দিকে। চিরকালের জন্যে বিস্মৃতির অতলে। সিস্টেমের ঘূর্ণনের কারণে পতনশীল পদার্থগুলো ব্ল্যাক হোলের চারপাশে পাক খাবে। তৈরি হবে চাকতির মতো একটি আকৃতি। এমন একটি চাকতির পক্ষে পুরোপুরি স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেন্দ্রের দিকে থাকা পদার্থ প্রান্তের দিকে অবস্থিত পদার্থের তুলনায় অনেক দ্রুত প্রদক্ষিণ করবে। সান্দ্র বল[৩] এই বিষম ঘূর্ণনকে মসৃণ করার চেষ্টা করবে। ফলে গ্যাসের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এত বেশি যে সেটা সাধারণ আলোর বদলে এক্স-রে নির্গত করবে। এতে করে গ্যাসের যে কক্ষীয় শক্তি ব্যয় হবে তার ফলে তা ধীরে ধীরে সর্পিল পথে ব্ল্যাক হোলের দিকে প্রবেশ করবে।

ফলে সিগনাস এক্স-১ সিস্টেমে ব্ল্যাক হোল থাকার প্রমাণ বেশ কিছু যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কাজে লাগছে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব দুটোই। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা বর্তমান সময়ে এমনই হয়। একটিমাত্র প্রমাণ জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে না। সিগনাস এক্স-১ ও একই রকম আরও অনেকগুলো সিস্টেম নিয়ে যাচাই-বাছাই করে মনে হচ্ছে ব্ল্যাক হোল আছে। নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতির ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল।

আরও বড় ব্ল্যাক হোলরা এর চেয়েও দারুণ কর্মকাণ্ড করতে পারে। বর্তমানে বেশির ছায়াপথের কেন্দ্রেই সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাক হোল থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। এর প্রমাণ হলো, এসব ছায়াপথের কেন্দ্রমণ্ডলের তারাগুলোর দ্রুত চলাচল। দেখে মনে হচ্ছে তারাগুলো একটি তীব্র আকর্ষণধর্মী ও খুব ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে চলে যাচ্ছে। হিসাব-নিকাশ থেকে এ রকম সম্ভাব্য বস্তুদের ভর এক কোটি থেকে এক শ কোটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ফলে আশেপাশের যেকোনো বিচ্ছিন্ন বস্তুকে গোগ্রাসে গিলবে এরা। সম্ভবত নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধুলো–কেউই এ দানবদের থাবা থেকে বাঁচতে পারে না। এই পতন প্রক্রিয়ার উন্মাদনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো ছায়াপথের কাঠামোই বদলে দেয়। সক্রিয় ছায়াপথ কেন্দ্রের (a c t i v e gal a c t i c nucl ei) বহু রূপভেদের সাথে পরিচয় আছে জ্যোতির্বিদদের। কোনো কোনো ছায়াপথের চেহারা দেখে তো মনে হয় মাত্র বিস্ফোরণ ঘটল। কিছু কিছু আবার বেতার তরঙ্গ, এক্স-রে বা শক্তির অন্য রূপের শক্তিশালী উৎস। তবে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা হলো, কিছু কিছু গ্যালাক্সি আবার গ্যাসের তীব্র জেট বা ফোয়ারা নিক্ষেপ করে। এবং এই ফোয়ারার দৈর্ঘ্য হাজার হাজার এমনকি মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল জুড়েও বিস্তৃত থাকে। এদের কোনো কোনোটির শক্তির উদগীরণ খুবই বিস্ময়কর। যেমন বহু দূরের কোনো কোনো কোয়াসার মাত্র এক আলোকবর্ষ চওড়া এলাকা থেকে হাজার হাজার গ্যালাক্সির সমান শক্তি উদগীরণ করতে পারে। ফলে দূর থেকে দেখে এদেরকে নক্ষত্রের মতো লাগে। কোয়াসার নামটাই কোয়াসি-স্টেলার কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মানে নক্ষত্রের মতো বস্তু।

বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, তীব্রভাবে আলোড়িত এসব বস্তুর কেন্দ্রে পরিচালকের আসনে বসে আছে আবর্তনশীল বড় বড় ব্ল্যাক হোল। যারা তাদের আশপাশ থেকে পদার্থ ছিনতাই করে চলেছে। ব্ল্যাক হোলের কাছে আসা যেকোনো তারা হয় ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষের প্রভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অথবা অন্য তারার সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তছনছ হয়ে যাবে। ছিন্নভিন্ন পদার্থগুলো সম্ভবত উত্তপ্ত গ্যাসের একটি চাকতি গঠন করবে, যা ব্ল্যাক হোলকে কেন্দ্র করে ঘুরবে ও ক্রমশ ভেতরের দিকে প্রবেশ করবে। যেমনটা হয়েছে সিগনাস এক্স-১ এর ক্ষেত্রে। তবে এখানে চাকতির সাইজটা হবে আরও অনেক বেশি বড়। ১৯৯৪ সালের মে মাসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এম৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে খুব দ্রুত ঘূর্ণনশীল গ্যাসের একটি চাকতি দেখতে পেয়েছে। পর্যবেক্ষণের শক্ত ইঙ্গিত হলো, ওখানে আছে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল।

সম্ভবত ব্ল্যাক হোলে পতনশীল গ্যাসের চাকতি থেকে নির্গত বিপুল পরিমাণ শক্তি হোলের ঘূর্ণন অক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে প্রায়ই দুই বিপরীত দিকে দুটি ভিন্ন জেট তৈরি হতে দেখা যায়। এই শক্তি নির্গমন ও জেট তৈরির প্রক্রিয়া সম্ভবত খুব জটিল। এতে তড়িচ্চুম্বকত্ব, সান্দ্র ও মহাকর্ষসহ অন্যান্য বল কাজ করে। এই বিষয়টিতে ব্যাপক তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষণগত গবেষণার অবকাশ আছে।

মিল্কিওয়ের কী অবস্থা তাহলে? আমাদের ছায়াপথটিও কি একইভাবে আলোড়িত হতে পারে? মিল্কিওয়ের কেন্দ্র প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে। অবস্থান আকাশের ধনুমণ্ডলীতে (S a g i t t a r i u s)। এর ভেতরের এলাকাসমূহ বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধুলো দ্বারা ঢেকে আছে। তাই জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়েছেন এক্স-রে, গামা রশ্মি ও অবলোহিত আলোর যন্ত্র। এভাবে একটি নিবিড় ঘন ও তেজস্বী

বস্তু খুঁজে পাওযা গেল। নাম স্যাজাইটেরিয়াস এ স্টার। ব্যাস কয়েক শ কোটি কিলোমটিরারের বেশি নয় (মহাজাগতিক মাপকাঠিতে ছোটই খুব)। তবুও এটিই ছায়াপথের সবচেয়ে শক্তিশালী বেতার উৎস। একই জায়গায় আবার আছে একটি শক্তিশালী অবলোহিত উৎসও। পাশেই আছে একটি ভিন্নধর্মী এক্সরে বস্তু। পরিস্থিতি খুব জটিল হলেও মনে হচ্ছে এখানে অন্তত একটি ভারী ব্ল্যাক হোল আছে। যেটি পর্যবেক্ষণে পাওয়া কিছু ঘটনার পেছনে দায়ী।

তবে ব্ল্যাক হোলটির ভর সম্ভবত বড় জোর এক কোটি সৌর ভরের সমান। তার মানে, সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলদের মধ্যে অবস্থান একেবারে নীচের দিকে। কিছু কিছু গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তীব্র শক্তি ও পদার্থ নির্গমনের এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে হতে পারে সেখানকার ব্ল্যাক হোল এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতের কোনো এক সময় যদি এটি আরও বেশি পরিমাণ গ্যাসের সরবরাহ পায়, তাহলে হয়ত জ্বলে উঠবে। অন্যদের মতো এতটা আলোড়ন হয়ত এটি নাও তুলতে পারে। সর্পিল বাহুতে থাকা গ্রহ ও নক্ষত্রের ওপর এই প্রজ্বলনের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা স্পষ্ট নয়।

আশেপাশের অঞ্চলের পদার্থ ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্ল্যাক হোল গিলে নেওয়া খাবারের নিশ্চল ভরের শক্তি নির্গত করতে থাকবে। সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি বেশি পদার্থ পেটে যাবে ব্ল্যাক হোলের। ফলে ব্ল্যাক হোল ক্রমশ বড় হবে। খিদেও বাড়বে সাথে সাথে। এমনকি বহু দূরের কক্ষপথের নক্ষত্ররাও শেষ পর্যন্ত এর শিকারে পরিণত হবে। এর কারণ মহাকর্ষীয় বিকিরণ। এই প্রতিক্রিয়া খুব দুর্বল হলেও মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি এর ওপরই নির্ভর করে।

১৯১৫ সালে সার্বিক আপেক্ষিকতা দাঁড় করানোর ঠিক পরপরই আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের একটি উল্লেখখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তত্ত্বের ক্ষেত্র সমীকরণগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন, তরঙ্গের মতো এক ধরনের মহাকর্ষীয় আলোড়নের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। শূন্যস্থানে যেটি আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাকর্ষীয় বিকিরণ মনে করিয়ে দেয় আলো ও বেতার তরঙ্গের মতো তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের কথা। তবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বহন করলেও তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সাথে এর পার্থক্য আছে। মহাকর্ষীয় বিকিরণ পদার্থকে আলোড়িত করে তুলনামূলক কম তীব্রতায়। যেখানে তারের জালের মতো নাজুক বস্তুও বেতার তরঙ্গকে শোষণ করে নিতে পারে, সেখানে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এত দুর্বল প্রতিক্রিয়া করে যে পৃথিবী ভেদ করেও চলে যেতে পারে। এবং বলতে গেলে একটুও তীব্রতা না কমিয়েই। আপনি যদি কোনো মহাকর্ষীয় লেজার বানান, তাহলে এক কিলোওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীর সমান কর্মদক্ষতায় এক কেটলি পানি গরম করতে হলে এক লক্ষ কোটি কিলোওয়াট শক্তির রশ্মি লাগবে। প্রকৃতির জানা বলগুলোর মধ্যে মহাকর্ষীয় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল বলেই এখানেও ঘটছে তার প্রতিফলন। যেমন, একটি পরমাণুর বৈদ্যুতিক শক্তি ও মহাকর্ষীয় শক্তির অনুপাত প্রায় $১০^{৪০}$। আমরা যে মহাকর্ষ অনুভব করছি তার একমাত্র কারণ হলো বলটির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। ফলে গ্রহদের মতো বস্তুর ক্ষেত্রে এর ভূমিকাই প্রকট হয়ে ওঠে।

মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া যে শুধু অতিমাত্রায় দুর্বল এমন নয়, এর উৎপত্তিও ঘটে নীরবে নীরবে। তত্ত্ব বলছে, এ বিকিরণ উৎপন্ন হয় ভর আলোড়িত হলে। যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি অবিরত সারি সারি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করছে। কিন্তু মোট উৎপন্ন ক্ষমতা মাত্র এক মিলিওয়াট। এই শক্তি হ্রাসের ফলে পৃথিবীর কক্ষপথ একটু একটু করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা হচ্ছে ধীরে। প্রতি দশ বছরে এক সেন্টিমিটারের এক কোটি কোটি ভাগ হারে।

তবে যেসব ভারী বস্তু আলোর খুব কাছাকাছি বেগে চলাচল করে তাদের কথা আলাদা। মহাকর্ষীয় বিকিরণের প্রতিক্রিয়ার পেছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। একটি হলো আকস্মিক ও উত্তাল ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ। যার মাধ্যমে একটি নক্ষত্র গুটিয়ে ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। এমন ঘটনার ফলে অল্প সময়ের জন্যে মহাকর্ষীয় বিকিরণের সঙ্কেত তৈরি হতে পারে। স্থায়িত্ব হতে পারে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড। এবং সাধারণত $১০^{৪৪}$ জুল শক্তি নির্গত হতে পারে। (এর সাথে সূর্যের তাপ উৎপাদনের তুলনা করে দেখতে পারেন। সেটা হলো সেকেন্ডে ৩X $১০^{২৬}$ জুল।

আরেকটি ঘটনা হলো উচ্চ গতির ভারী বস্তুদের একে অপরের চারপাশে প্রদক্ষিণ। যেমন, কাছাকাছি অবস্থানের থাকা দুটি নক্ষত্রের বাইনারি সিস্টেম থেকে অনবরত বিপুল মাত্রায় মহাকর্ষ বিকিরণ নির্গত হবে। এ প্রক্রিয়া ভালো কাজ করবে যদি দুটি প্রদক্ষিণরত নক্ষত্ররা সঙ্কুচিত বস্তু হয়। এই যেমন নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাক হোল। ঈগলমণ্ডলীর (Aquila) দুটি নিউট্রন নক্ষত্র মাত্র কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী যে আট ঘণ্টার মধ্যেই একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন হয়। ফলে নক্ষত্রগুলো মোটামুটি আলোর কাছাকাছি বেগ নিয়েই চলছে। এই দ্রুত গতির কারণে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গমনের হারও বেশি। ফলে প্রতি বছর তাদের কক্ষপথ উল্লেখখযোগ্য হারে (প্রায় ৭৫ মাইক্রোসেকেন্ড) ছোট হচ্ছে। এই হার ক্রমশই বাড়তে থাকবে। এখন থেকে ৩০ কোটি বছর পর তারা একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

জ্যোতির্বিদদের হিসাব মতে, প্রতি ছায়াপথে প্রায় প্রতি এক লক্ষ বছরে একটি বাইনারি জগৎ এভাবে মিশে যায়। এরা এতটা নিবিড় ও এদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতটা শক্তিশালী যে এরা শেষ মুহূর্তে মিশে যাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে একে অপরকে হাজার হাজার বার ঘুরে

আসবে। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমনও হুট করে বেড়ে যাবে। আইনস্টাইনের সূত্র বলছে, এই শেষ অবস্থায় মহাকর্ষীয় শক্তির উৎপাদন হবে অনেক বেশি। কক্ষপথ খুব দ্রুত ছোট হয়ে যাবে। পারস্পরিক মহাকর্ষীয় টানের ফলে নক্ষত্রের চেহারা একদম বদলে যাবে। ফলে একে অপরকে স্পর্শ করার সময় তাদেরকে ঘূর্ণায়মান অতিকায় চুরুটের মতো দেখাবে। দুটোর একীভবন হবে এক উত্তাল ঘটনা। দুটো নক্ষত্র জোড়া লেগে একটি জটিল ও উন্মত্ত ভরে পরিণত হবে। এ থেকেও নির্গত হবে কাড়ি কাড়ি মহকর্ষ তরঙ্গ। শেষ পর্যন্ত এটি প্রায় গোলকের রূপ ধারণ করবে। একটি বড় ঘণ্টার মতো করে নির্দিষ্ট নকশার কম্পন নিয়ে বাজবে ও আন্দোলিত হবে। এই স্পন্দন থেকেও কিছু মহাকর্ষ বিকিরণ বের হবে। ফলে বস্তুটি আরও কিছু শক্তি হারাবে। আস্তে আস্তে এটি শান্ত হয়ে আসবে। আর শেষে নীরব হয়ে যাবে।

শক্তি ক্ষয়ের হার তুলনামূলক ধীর হলেও মহাবিশ্বের কাঠামোর ওপর মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের বড় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কাজ করে। ফলে বিজ্ঞানীদের জন্যে বড় একটি কাজ হলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকর্ষীয় বিকিরণের ধারণাগুলোর সত্যতা যাচাই করা। ঈগলমণ্ডলীর বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্র ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে, কক্ষপথ ছোট হচ্ছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেনেই। ফলে মহাকর্ষীয় বিকিরণ নির্গমনের সপক্ষে এটি একটি সরাসরি প্রমাণ। তবে আরও নিশ্চিত হতে হলে পৃথিবীর কোনো পরীক্ষাগারে একে শনাক্ত করতে পারতে হবে। মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরার জন্যে বহু গবেষনা দল যন্ত্র বানিয়েছেন। তবে আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্রই এ তরঙ্গ ধরার মতো সংবেদনশীল হতে পারেনি। মহাকর্ষীয় বিকিরণের নিশ্চিত প্রমাণ পেতে হলে আমাদেরকে সম্ভবত নতুন প্রজন্মের ডিটেক্টরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে[৪]।

দুটো নিউট্রন নক্ষত্রের মিলনে একটি বড় নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাক হোল তৈরি হতে পারে। একটি নিউট্রন নক্ষত্র ও একটি ব্ল্যাক হোল বা দুটি ব্ল্যাক হোল মিলে অবশ্যই একটি ব্ল্যাক হোল তৈরি করবে। বাইনারি নিউট্রন নক্ষত্রদের মতোই এক্ষেত্রেও কিছু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তি ক্ষয় হবে। সাথে থাকবে বাজনা ও কম্পন। মহাকর্ষ তরঙ্গের ক্ষমতা কমার সাথে সাথে এ প্রক্রিয়াও ধীর হয়ে আসবে।

ব্ল্যাক হোলের মিলন থেকে যে মহাকর্ষীয় শক্তি সংগ্রহ করা যাবে তার তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ আকর্ষণীয়। ১৯৭০ এর দশকে এই তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন রজার পেনরোজ, স্টিফেন হকিং, ব্র্যান্ডন কার্টার, রেমো রাফিনি, ল্যারি স্মার প্রমুখ। যদি ব্ল্যাক হোল দুটি অঘূর্ণনশীল ও একই ভরের হয়, তাহলে মোট ভর-শক্তির প্রায় ২৯ শতাংশ সংগ্রহ করা যাবে। আধুনিক প্রযুক্তি বা অন্য কোনো কৌশল কাজে লাগাতে পারলে হয়ত ঐ শক্তিটুকু শুধু মহাকর্ষীয় বিকিরণ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে প্রাকৃতিকভাবে ব্ল্যাক হোলের মিলন ঘটে গেলে বেশিরভাগ শক্তিই কিন্তু এই প্রায় অদৃশ্য রূপ ধরেই আসবে। ব্ল্যাক হোলরা যদি পদার্থবিদ্যার আইনে অনুমোদিত সর্বোচ্চ হারে (প্রায় আলোর বেগে) একে অপরের উল্টো দিকে ঘুরে মিলিত হয়, তাহলে ৫০ ভাগ ভর-শক্তি নির্গত হবে।

অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে এত বেশি পরমাণুটাও সর্বোচ্চ সীমা নয়। ব্ল্যাক হোলের আবার বৈদ্যুতিক চার্জও থাকতে পারে। একটি চার্জিত ব্ল্যাক হোলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। দুটি ক্ষেত্রই শক্তি ধারণ করতে পারে। ধনাত্মক চার্জধারী একটি ব্ল্যাক হোল ঋণাত্মক চার্জধারী অপর একটি ব্ল্যাক হোলের সাথে মিলিত হলে কিছু শক্তি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তড়িচ্চুম্বকীয় এবং মহাকর্ষীয় দুই রকম শক্তিই বেরিয়ে আসে।

এই নির্গমনের একটি সীমা আছে। কারণ একটি নির্দিষ্ট ভরের একটি ব্ল্যাক হোল কেবল একটি সর্বোচ্চ সীমার বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করতে পারে। একটি অঘূর্ণনশীল ব্ল্যাক হোলের জন্যে সেই সীমা নির্ধারিত হয় এভাবে: দুটো অবিকল একই রকম ব্ল্যাক হোলের কথা ভাবুন। এদের চার্জ একই। কৃষ্ণগহ্বরদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফলে এদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করবে। অন্য দিকে, তড়িৎ বলের কারণে কাজ করবে বিকর্ষণ (সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করে)। চার্জ ও ভরের অনুপাত একটি সঙ্কট মানে পৌঁছলে এই দুই বিপরীতধর্মী বল একে অপরের সমান হয়ে যায়। ফলে কৃষ্ণগহ্বরদের মধ্যে কোনো নেট বল থাকবে না। একটি কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ কী পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ থাকতে পারবে তা এই শর্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। হয়ত ভাবছেন, কৃষ্ণগহ্বরের চার্জ এর চেয়ে বেশি করার চেষ্টা করলে কী ঘটবে? এটা করার একটি উপায় হলো কৃষ্ণগহ্বরে আরও বেশি চার্জ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ বাড়বে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ ঠেকাতে যে কাজ সম্পন্ন হবে তাতে কিছু শক্তি ব্যয় হবে। এই শক্তিটুকুও কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করবে। যেহেতু শক্তিও ভরের আরেক রূপ ($E=mc^2$ সূত্রটি মনে আছে নিশ্চয়ই), ফলে কৃষ্ণহ্বর ভারী ও বড় হয়ে যাবে। সহজেই হিসাব করে দেখানো যায়, এই প্রক্রিয়ায় ভর চার্জের চেয়ে বেশি বাড়ে। ফলে চার্জ ও ভরের অনুপাত আসলে কমে যায়। আর এই সীমা অতিক্রম করার প্রচেষ্টাও হয় ব্যর্থ।

একটি চার্জিত কৃষ্ণগহ্বরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এর মোট ভরের কিছু অংশের যোগান দেয়। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চার্জ ধারণকারী কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে আসে অর্ধেক ভর। যদি দুটি আবর্তনহীন কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে বিপরীত চিহ্নের সর্বোচ্চ চার্জ থাকে, তাহলে তারা একে অপরকে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা আকর্ষণ করবে, আবার বৈদ্যুতিক বল দ্বারাও আকর্ষণ করবে। তারা মিলিত হয়ে গেলে বেদ্যুতিক চার্জ প্রশমিত হয়ে যাবে। বৈদ্যুতিক চার্জ বেরও করে নেওয়া যাবে। তাত্ত্বিকভাবে এটা ঐ সিস্টেমের মোট ভরের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

শক্তি সংগ্রহের পরম সর্বোচ্চ সীমা অর্জন করা সম্ভব হবে যদি দুটি ব্ল্যাক হোলই আবর্তন করতে থাকে আর যদি তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ হয় বিপরীতধর্মী। তাহলে মোট ভর-শক্তির দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নির্গত হবে। এটা ঠিক যে এই মানগুলোর গুরুত্ব আছে শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

থেকেই। কারণ বাস্তব একটি ব্ল্যাক হোলের অনেক বেশি বৈদ্যুতিক চার্জ থাকার সম্ভাবনা খুব কম। তাছাড়া দুটি ব্ল্যাক হোল যে আদর্শ উপায়েই মিলিত হবে সে সম্ভাবনাও কম। যদি না কোনো উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী জাতি সেটা ঘটাতে সক্ষম হয়। তবে দুটি ব্ল্যাক হোল যদি খুব বেশি আদর্শ উপায়ে মিলিত নাও হয় তবুও সম্ভবত প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি নির্গত হবে। দুটি বস্তুর মিলিত ভর-শক্তির উল্লেখখযোগ্য একটি অংশ শক্তিই এভাবে নির্গত হবে। এটাকে বহু বছর ধরে চলতে থাকা নক্ষত্রের নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে নক্ষত্র মাত্র এক শতাংশ শক্তি নির্গত করে।

এই মহাকর্ষীয় ঘটনা একটি দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিউশন বিক্রিয়ার জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই যে একটি নক্ষত্র একেবারে মারা যায় তা কিন্তু নয়। একটি সঙ্কুচিত অঙ্গারে পরিণত হবার পর একটি উজ্জ্বল গ্যাসীয় গোলক আকারে নক্ষত্রটি ফিউশন বিক্রিয়ার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি নির্গত করার ক্ষমতা রাখে। এ বিষয়টি ভালো করে বোঝা গেছে প্রায় বিশ বছর আগে। এ ধারণা কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদ ও *ব্ল্যাক হোল* শব্দের জনক জন হুইলার একটি সভ্যতার কথা কল্পনা করেছেন, যারা তাদের উত্তরোত্তর শক্তির চাহিদার কথা বিবেচনা করে নিজেদের নক্ষত্রের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে একটি ঘূর্ণনশীল ব্ল্যাক হোলের পাশে বাড়ি বানিয়েছে। প্রতিদিন তারা তাদের বর্জ্যগুলো ট্রাকে ভর্তি করে খুব হিসেব করে বানানো পথে ব্ল্যাক হোলের দিকে পাঠিয়ে দেয়। ব্ল্যাক হোলের কাছে এসে ট্রাকের পদার্থগুলো ঢেলে দেওয়া হয়। এভাবে চিরকালের জন্যে বর্জ্যগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

পতনশীল বস্তুগুলো ব্ল্যাক হোলের দিকে এগিয়ে যাবার সময় হোলের উল্টো দিকে আবর্তন করে। ফলে ব্ল্যাক হোলের ঘূর্ণন কিঞ্চিত বাধাগ্রস্থ হয়। আর তার ফলে ব্ল্যাক হোলের এই ঘূর্ণনশক্তিটুকু বেরিয়ে আসে। ফলে উন্নত সভ্যতার মানুষেরা তাদের শিল্প-কারখানায় সেই শক্তি ব্যবহার করতে পারে।[৫] ফলে এই পদ্ধতির দুটো লাভ। সবগুলো বর্জ্য চিরতরে বিদায় হলো। কিন্তু বিদায় হবার সময় দিয়ে গেল মূল্যবান অনেকখানি শক্তি। এভাবে ঐ সভ্যতার মানুষেরা প্রয়োজনের আলোকে একটি মৃত নক্ষত্র থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। যতটা শক্তি নক্ষত্রটি তার পুরো আলোকোজ্জ্বাল[৬] জীবনেও নির্গত করেনি।

এটা ঠিক যে ব্ল্যাক হোল থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বিষয়টাকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি মনে হচ্ছে। তবে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর পরিমাণ পদার্থের অনিবার্য ঠিকানা কিন্তু ব্ল্যাক হোল। সেটা হতে পারে দুইভাবে। হয় পদার্থগুলো এমন এক নক্ষত্রের উপাদান যেটি সঙ্কুচিত হয়ে ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে যাচ্ছে। অথবা পদার্থগুলো কোনোভাবে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে চলে যাবে। ব্ল্যাক হোল নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোনো কিছু ব্ল্যাক হোলে চলে গেলে তার কী ঘটে? অল্প কথায় উত্তর হলো, আমরা জানি না। বলা চলে, ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে আমাদের জানার একমাত্র উপায় তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও গাণিতিক মডেলিং। একটু আগে যেটা বললাম এটাও।

ব্ল্যাক হোলের সংজ্ঞা অনুসারেই কিন্তু আমরা বাইরে থেকে এর ভেতরের কিছু দেখতে পাই না। অতএব, আমাদের ব্ল্যাক হোল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকলেও (যেটা আসলে আমাদের নেই) এর ভেতরটায় কী চলছে সেটা আমরা কখনও জানব না। তবে এক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আমাদেরকে আশার আলো দেখায়। ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের কথাও জানিয়েছিল এই তত্ত্বটিই। কোনো নভোচারী ব্ল্যাক হোলের ভেতরে চলে কী ঘটবে তত্ত্বটির মাধ্যমে আমরা সেটা অনুমান করতে পারি। এখন আমরা এই তাত্ত্বিক ফলাফলগুলোর সারমর্মই দেখব।

ব্ল্যাক হোলের পৃষ্ঠ আসলে নিছকই একটি গাণিতিক কাঠামো। সত্যিকার কোনো পৃষ্ঠের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধুই ফাঁকা স্থান। পতনশীল নভোচারী ভেতরে প্রবেশের সময় বিশেষ কিছুই দেখবেন না। তারপরেও পৃষ্টের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ও কিছুটা চমকপ্রদ ভৌত (physical) তাৎপর্য আছে। হোলের ভেতরে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে আলোও সেখানে আটকে আছে। বের হতে ইচ্ছুক আলোর ফোটন কণা পিছিয়ে যেতে বা ধ্য হয়। তার মানে, ব্ল্যাক হোল থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। আর এ কারণেই বাইরে থেকে ব্ল্যাক হোলকে দেখা যায় না। আর কোনো বস্তু বা তথ্য আলোর চেয়ে জোরে ছুটতে পারে না বলে একবার এর সীমানায় প্রবেশ করে ফেললে কোনো কিছুই আর সেখান থেকে বের হতে পারে না। যে সমস্ত ঘটনা ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে ঘটবে, তা চিরকালই বাইরের দর্শকের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যাবে। এ কারণে ব্ল্যাক হোলের পৃষ্ঠকে[৭] বলা হয় ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। কারণ এই দিগন্ত ব্ল্যাক হোলের ভেতরে ও বাইরে ঘটা ঘটনাকে আলাদা করে দেয়। দিগন্তের ভেতরের ঘটনা আমরা দেখি না। দেখি বাইরের ঘটনা। তবে দৃষ্টির আড়াল হবার বিষয়টি কিন্তু একমুখী। ব্ল্যাক হোলের ভেতরের নভোচারীকে আমরা না দেখলেও নভোচারী কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের মহাবিশ্ব দেখতে পাবেন।

নভোচারী যতই ভেতরে যাবেন, মহাকর্ষের থাবা ততই বাড়বে। এর একটি প্রভাব হলো শারীরিক বিকৃতি। নভোচারীর পা প্রথমে ব্ল্যাক হোলে প্রবেশ করলে মাথার চেয়ে পা এর কেন্দ্র বেশি কাছে থাকবে। ফলে মহাকর্ষের শক্তি পায়ে বেশি অনুভূত হবে। ফলে, পায়ে নীচের দিকে তীব্র টান অনুভূত হবে। এ কারণে নভোচারীর শরীর দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে যাবে। একই সাথে এবং একই দিকে কিন্তু নভোচারীর ঘাড়েও টান পড়বে। ফলে ভদ্রলোক চিকনও হয়ে যাবেন। এই যে লম্বা ও চিকন হয়ে যাবার প্রক্রিয়া, একে অনেক সময় বলা হয় স্ফ্যাঘেটিফিকেশন বা সেমাই প্রভাব (spaghettification)।

তত্ত্ব বলছে, ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রে মহাকর্ষ হয়ে যায় সীমাহীন। আর মহাকর্ষের বহিঃপ্রকাশ তো ঘটে স্থান-কালের বক্রতার মাধ্যমে। ফলে মহাকর্ষ শক্তিশালী হবার সাথে সাথে স্থান-কালের বক্রতাও হয়ে যায় সীমাহীন। গণিতের ভাষায় এ অবস্থার নাম স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটি। এটা হলো স্থান-কালের এমন একটি সীমানা বা প্রান্ত যাতে স্থান-কালের সাধারণ ধারণার কোনো স্থান নেই। বহু পদার্থবিদের বিশ্বাস, ব্ল্যাক হোলের ভেতরের সিঙ্গুলারিটি সত্যিকার অর্থেই স্থান-কালের কবর রচনা করে। কোনো বস্তু এখানে পৌঁছে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। আসলেই যদি সেটা হয়, তাহলে নভোচারীর শরীর চলে যাবে সিঙ্গুলারিটিতে। তীব্র সেমাই প্রভাবের এই কাজটিতে সময় লাগবে মাত্র এক ন্যানোসেকেন্ড[৮]।

চিত্র ৫.২

বক্রতার একেবারে কেন্দ্রে আছে ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্ল্যাক হোল স্থান-কালকে যেভাবে বাঁকিয়ে দেয়, তার ফলে বাইরে থেকে ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে নয়।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথে থাকা সম্ভাব্য ব্ল্যাক হোলের ভর এক কোটি সৌরভরের সমান। এমন ভরের ও অঘূর্ণনশীল কোনো ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্ত থেকে সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে পটল তুলতে সময় লাগবে প্রায় তিন মিনিট। এই শেষ তিনি মিনিট (লাস্ট থ্রি মিনিটস) মোটেও আরামদায়ক হবে না। বাস্তবে আসলে সিঙ্গুলারিটিতে যাবার বহু আগেই সেমাই প্রভাবের কারণে বেচারা মারা পড়বেন। এই শেষ সময়ে নভোচারী মহাশয় কোনোভাবেই প্রাণঘাতী সিঙ্গুলারিটিকে চোখে দেখতে পারবে না। কারণ এই বিন্দুটি থেকে কোনো আলো আসতে পারে না। ব্ল্যাক হোলটির ভর যদি মাত্র এক সৌরভরের সমান হয়, তাহলে এর ব্যাসার্ধ হবে প্রায় তিন কিলোমিটার। এক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্ত থেকে সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড[৯]।

পতনশীল নভোচারীর প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে ধ্বংস হতে সময় লাগে খুব কম সময়। তবে ব্ল্যাক হোলের সময়ের বিকৃতিটা এমনভাবে ঘটে যে দূর থেকে দেখলে নভোচারীর শেষের দিকের ভ্রমণকে খুব ধীরে চলছে বলে মনে হবে। নভোচারী ঘটনা দিগন্তের যত কাছে যাবেন, দূরের দর্শকের কাছে নভোচারীর আশেপাশের ঘটনাগুলো তত বেশি ধীরে চলছে বলে মনে হতে থাকবে। এবং আসলে মনে হবে নভোচারীর ঘটনা দিগন্তে পৌঁছতে অসীম পরিমাণ সময় লাগছে। ফলে বাইরের দুনিয়ায় যেটাকে অসীম সময় মনে হচ্ছে, নভোচারী সেটার শিকার হচ্ছেন মুহূর্তের মধ্যেই। এই দিক থেকে ভাবলে ব্ল্যাক হোল আসলে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তের একটি দরজা। একটি মহাজাগতিক অন্ধগলি। বের হবার এমন এক পথ যে পথ নিয়ে যাবে না কোনো ঠিকানায়। ব্ল্যাক হোল স্থানের খুব ছোট্ট একটি অঞ্চল। সময়ের যেখানে ইতি ঘটে। যারা মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, একটি ব্ল্যাক হোলে ঝাঁপ দিয়ে সেটা তারা নিজেরাই জেনে নিতে পারবেন।

এটা ঠিক যে মহাকর্ষই প্রকৃতির সবচেয়ে দুর্বল বল। কিন্তু এর তীক্ষ্ণভেদী ও সম্মিলিত ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। বিচ্ছিন্ন মহাজাগতিক বস্তু কিংবা সমগ্র মহাবিশ্ব দুটোর জন্যেই এই কথা প্রযোজ্য। যে তীব্র মহাকর্ষীয় আকর্ষণ একটি নক্ষত্রে গুটিয়ে ফেলে, সেই একই মহাকর্ষ কাজ করে সার্বিকভাবে মহাবিশ্বের আরও বড় মাপকাঠিতেও। এই আকর্ষণের ফল খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্যে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণের ওপর। সেটা জানতে হলে আমাদেরকে মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ করতে হবে।

অনুবাদকের নোট:

8. বাস্তবে করা অসম্ভব বা কঠিন এমন ক্ষেত্রে বিশেষত কম্পিউটারে সাহায্যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নাম সিমুলেশন। যেমন, কম্পিউটার প্রোগ্রামে ব্ল্যাক হোলের নমুনা বানানো। কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্যে অনেক সময় কম্পিউটার সিমুলেশন করে ডেটা তৈরি করা হয়। গণিত ও পরিসংখ্যানের এর ব্যবহার খুব বেশি। তবে কম্পিউটার ছাড়াও সিমুলেশন হয়। যেমন ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের অনুশীলন করানোর জন্যে কাঠের নকল ঘোড়ার প্রচলন ছিল। আজকাল বাসায় দৌড়ানোর জন্যে ট্রেডমিল খুব জনপ্রিয়। নকল দৌড়ের এ পদ্ধতিও কিন্তু এক ধরনের সিমুলেশন।
9. বর্তমানে সিগনাস এক্স-১ এর ব্ল্যাক হোল হবার ব্যাপারে ব্যাপক স্বীকৃতি রয়েছে।
10. প্রবাহীর (তরল বা গ্যাস) বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত বল।
11. ২০১৫ সালে মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রথম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে এ বিষয়ে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কিপ থর্নসহ তিনজন বিজ্ঞানী।
12. এটার সাথে মিল আছে বাস্তবে প্রয়োগ করা একটি কৌশলের। নাম গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট। পৃথিবী থেকে দূর মহাকাশে যান প্রেরণের সময় একে এক বা একাধিক গ্রহের কক্ষপথের খুব কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগে থেকে থাকা নিজস্ব বেগের কারণে গ্রহটির মহাকর্ষ মহাকাশযানকে পুরোপুরি আটকে ফেলতে পারে না। মহাকাশযান পরে আবার সংশিস্নষ্ট বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাথে নিয়ে আসে বস্তুটির মহাকর্ষীয় শক্তির একটা অংশ। এভাবে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয় যান। তবে

সংশিস্নষ্ট গ্রহের শক্তি ক্ষয় হয় খুব নগণ্য পরিমাণ।

13. অর্থাৎ, নক্ষত্রটি যখন ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো দিত।

14. মনে রাখতে হবে, এই পৃষ্ঠ কিন্তু নিছক গাণিতিক একটা সীমা। বাস্তব কোনো পৃষ্ঠ নয়।

15. এক ন্যানোসেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ।

16. এক মাইক্রোসেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিশ্বের ওজন পরিমাপ (Weighing The Universe)

প্রায়ই বলা হয়, ওপরে যে যায়, তাকে নীচে নামতেই হবে। আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারা কোনো বস্তু মহাকর্ষের টানে আটকা পড়ে। বাধ্য হয় নীচে নেমে আসতে। কিন্তু সব সময় তা হয় না। যথেষ্ট জোরে চললে বস্তুটির পক্ষে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়া সম্ভব। ফিরে আসতে হবে না আর কখনও। যেসব রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠানো হয় সেগুলো এই বেগ (মুক্তি বেগ) অর্জন করে।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগের মান সেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। এই বেগ কনকর্ড বিমানের বিশ গুণেরও বেশি। এই সঙ্কট মান পৃথিবীর ভর (এতে যতটুকু পদার্থ আছে) ও ব্যাসার্ধ দুটোর ওপরই নির্ভর করছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তু যত ছোট হবে, এর পৃষ্ঠে মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হবে। সৌরজগৎ থেকে বের হতে পারার অর্থ হলো সূর্যের মহাকর্ষকে জয় করা। এক্ষেত্রে মুক্তি বেগের মান সেকেন্ডে ৬১৮ কিলোমিটার। আমাদের মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ থেকে বের হতেও সেকেন্ডে কয়েকশ কিলোমিটার বেগ লাগবে। অন্য দিকে, একটি নিউট্রন নক্ষত্রের মতো ঘন বস্তু থেকে বের হয়ে যেতে সেকেন্ডে কয়েক অযুত কিলোমিটার বেগ প্রয়োজন। আর ব্ল্যাক হোল থেকে বের হতে তো লাগবে আলোর চেয়ে (সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার) বেশি বেগ।

আর মহাবিশ্ব থেকে বের হতে চাইলে? ২য় অধ্যায়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বের কোনো প্রান্ত আছে বলে মনে হয় না। ফলে, বের হবার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই প্রান্ত আছে এবং আরও ধরা যাক, এই প্রান্ত হলো আমাদের দৃষ্টিসীমার শেষ বিন্দুতে (প্রায় দেড় হাজার আলোকবর্ষ দূরে), তাহলে মুক্তি বেগ হবে প্রায় আলোর বেগে সমান। এই ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখে মনে হচ্ছে, সবেচেয়ে দূরের ছায়াপথরা আমাদের থেকে প্রায় আলোর বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। দেখে তো মনে হয়, ছায়াপথরা এত দূরে সরছে যে তারা হয়ত মহাবিশ্ব থেকে বেরই হয়ে যাবে। সেটা না হলেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন হবেই। ফিরে আসবে না কখনও।

দেখা যাচ্ছে, প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আসলে অনেকটাই পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মতোই আচরণ করছে। যদিও মহাবিশ্বের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রান্ত নেই। প্রসারণের গতি খুব বেশি হলে সরতে থাকা ছায়াপথগুলো মহাবিশ্বের সব পদার্থের সম্মিলিত মহাকর্ষীয় বন্ধন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর এতে করে প্রসারণ চলবে চিরকাল। অন্য দিকে, প্রসারণ ধীর হলে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাব। মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। ছায়াপথরা তখন আবার 'নীচের দিকে' নামতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়। পতন হবে মহাবিশ্বের।

এর মধ্যে কোনটি ঘটবে? দুটি সংখ্যার তুলনার মধ্যে এর উত্তরটি নির্ভর করছে। একটি হলো প্রসারণের গতি। আরেকটি হলো মহাবিশ্বের মোট মহাকর্ষীয় টান, যাকে আসলে মহাবিশ্বের ওজন বলা চলে। মহাকর্ষীয় টান যত বেশি হবে, সে টানকে অগ্রাহ্য করতে হলে মহাবিশ্বকে তত বেশি দ্রুত প্রসারিত হতে হবে। জ্যোতির্বিদরা লোহিত সরণ প্রভাব[১] পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি প্রসারণ হার বের করতে পারেন। কিন্তু মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী ঘটবে সে প্রশ্নের সমাধান হয়নি। দ্বিতীয় রাশিটি, মানে মহাবিশ্বের ওজন নিয়ে সমস্যাটা এখনও রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের ওজন কীভাবে জানা সম্ভব? কাজটাকে সথেষ্ট কঠিন মনে হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা সরাসরি জানার

কোনো উপায় নেই। কিন্তু মহাকর্ষ তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা এর ওজন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। ওজনের একটি নিম্নসীমা সহজেই পাওয়া যায়। গ্রহদের ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় টান পরিমাপ করে সূর্যের ওজন (ভর) জানা যায়। আমরা জানি, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় একশ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) নক্ষত্র আছে। এদের গড় ভর আমাদের সূর্যের ভরের সমান। ফলে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ন্যূনতম ভরের একটি প্রাথমিক হিসাব পাই। এবার আমাদেরকে দেখতে হবে মহাবিশ্বে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে এদেরকে এক এক করে গোণা যাবে না। তবে অনুমাননির্ভর বেশ ভালো একটি হিসাব হলো দশ বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়ায় $১০^{২১}$ সৌর ভর। অন্য কথায় $১০^{৪৮}$ টন। এই গ্যালাক্সিগুলোর সমাবেশের ব্যাসার্ধ পনের বিলিয়ন আলকবর্ষ ধরে নিলে মহাবিশ্বের মুক্তিবেগের ন্যূনতম একটি মান পাওয়া যাবে। এই মানটি দাঁড়ায় আলোর বেগের এক শতাংশ। আমরা যদি ধরে নেই যে মহাবিশ্বের ভর শুধু নক্ষত্রের ভর হিসাব করেই পাওয়া যাবে, তাহলে মহাবিশ্ব নিজের মহাকর্ষীয় টানকে অগ্রাহ্য করে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে।[২]

অনেক বিজ্ঞানীরই বিশ্বাস, মহাবিশ্বের ভাগ্যে ঠিক এটাই ঘটবে। তবে কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ ও কসমোলজিস্ট বলছেন ভরের সমষ্টি হয়ত সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি। আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাচ্ছি বাস্তবে বস্তু আছে তার চেয়ে বেশি। মহাবিশ্বের সব বস্তু তো আর উজ্জ্বল নয়। নক্ষত্র, গ্রহ[৩] ও ব্ল্যাক হোলদের মতো অনুজ্জ্বল বস্তুরা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধুলি ও গ্যাস। যাদের বেশিরভাগই সহজে চোখে পড়ে না। আরও কথা আছে। গ্যালাক্সির মাঝখানের স্থানও কিন্তু একেবারেই ফাঁকা নয়। পদার্থ আছে এখানটায়ও। খুব সম্ভব এখানে আছে বিপুল পরিমাণ হালকা গ্যাস।

তবে আরেকটি চমকপ্রদ সম্ভাবনাও কয়েক বছর ধরে জ্যোতির্বিদদের নজর কেড়ে রেখেছে। যে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা, সেই বিস্ফোরণটিই আমাদের দেখা সব বস্তুর উৎস। কিন্তু আমরা দেখি না এমন কিছু বস্তুরও উৎস সেই একই বিস্ফোরণ। মহাবিশ্ব যদি অতিপারমাণবিক কণার এক উত্তপ্ত আধার হিসেবেই শুরু হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বস্তুর উপাদান আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া অন্যসব কণাও বিপুল পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকবে। কণাপদার্থবিদরা সম্প্রতি পরীক্ষাগারে এই কণাগুলো শনাক্ত করেছেন। এই কণাগুলো খুবই অস্থিতিশীল। ফলে এরা খুব দ্রুতই ক্ষয় হয়ে যাবার কথা। তবে এদের কিছু কিছু হয়ত আজও অবশিষ্ট আছে। মহাবিশ্বের সূচনার ধ্বংসাবশেষ হিসেবে।

এই ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে নিউট্রিনো সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সেই ভূতুড়ে কণাগুলো, যাদেরকে সুপারনোভায় খুব সক্রিয় দেখা যায় (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়)। আমরা যতটুকু জানি, তাতে নিউট্রিনোরা ক্ষয় হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না। (আসলে নিউট্রিনো আছে তিন রকমের। এক ধরনে নিউট্রিনো অন্য নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই দিকটা আপাতত আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিচ্ছি) ফলে বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া মহাজাগতিক নিউট্রিনো দিয়ে মহাবিশ্ব ভরপুর থাকার কথা। আদিম মহাবিশ্বে সব ধরনের অতিপারমাণবিক কণা সমানভাবে তৈরি হয়েছিল ধরে নিলে হিসেব করে জানা সম্ভব কতগুলো মহাজাগতিক নিউট্রিনো থাকা উচিৎ। হিসেব করে দেখা গেল, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউট্রিনোর পরিমাণ হওয়া উচিৎ ১০ লক্ষ। অন্য কথায়, সাধারণ বস্তুর প্রতিটি কণার বিপরীতে নিউট্রিনোর সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় একশ কোটি।

দারুণ এই ফলাফলটি আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে আপনার দেহের মধ্যে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো উপস্থিত আছে। যার প্রায় সবই বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। অস্তিত্বের একদম শুরু থেকে এরা এখনও মোটামুটি একই অবস্থায় আছে। নিউট্রিনোরা আলোর সমান বা কাছাকাছি গতিতে চলে। এ কারণে এরা মুহূর্তের মধ্যে আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে যায়। প্রতি সেকেন্ডে একশ বিলিয়ন নিউট্রিনো এই কাজ করে। এই অবিরাম চলাচল আমরা খেয়াল করি না, কারণ নিউট্রিনোরা সাধারণ বস্তুর সাথে খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে এদের কোনো একটি কণা আপনার দেহের মধ্যে আটকে যাবে সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শূন্যস্থানে এত নিউট্রিনোর উপস্থিতি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে বড় প্রভাব রাখতে পারে।

নিউট্রিনোরা খুব দুর্বলভাবে ক্রিয়া করলেও অন্য সব কণার সাথে তাদের মহাকর্ষীয় বল কিন্তু কাজ করে। তারা হয়ত আশেপাশের অন্য কণাকে খুব বেশি ঠেলা-ধাক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাদের পরোক্ষ মহাকর্ষীয় প্রতিক্রিয়া মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের ভূমিকা কতটুকু সেটা জানতে হলে জানতে হবে তাদের ভর।

মহাকর্ষ নিয়ে হিসাব করতে গেলে দরকার হয় প্রকৃত ভর, নিশ্চল ভর নয়। নিউট্রিনোদের নিশ্চল ভর যদি কমও হয়, আলোর কাছাকাছি বেগে চলার কারণে এদের ভর কিন্তু উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠবে। আবার এদের ভর শূন্যও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এরা চলবে আলোর বেগে। তাহলে তাদের শক্তির সাথে তুলনা করে প্রকৃত ভর জানা যাবে। আর মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পাওয়া নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এই শক্তির হিসাব পাওয়া যাবে বিগ ব্যাং থেকে পাওয়া শক্তির অনুমিত পরিমাণ থেকে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে শক্তি একটু দুর্বল হচ্ছে। এ কারণে মূল শক্তির পরিমাণকে সংশোধন করে নিতে হবে। তবে এই সংশোধন করে নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে, শূন্য নিশ্চল ভরের নিউট্রিনোরা মহাবিশ্বের মোট ওজনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

অন্য দিকে, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য কি না এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আবার সব ধরনের নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর সমান কি না সেটাও জানা নেই আমাদের। নিউট্রিনো সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যা জানি তাতে এদের সসীম একটি নিশ্চল ভর থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে আসল কোনটি সঠিক। চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা বলেছি, নিউট্রিনোর ভর থাকলেও সেটা অবশ্যই খুব সামান্য হবে। ভর হবে পরিচিত অন্য যে কোনো কণার চেয়ে কম। কিন্তু মহাবিশ্বে নিউট্রিনোর সংখ্যা অনেক বেশি হবার কারণে খুব সামান্য নিশ্চল ভরও মহাবিশ্বের মোট ওজনে বড় ভূমিকা রাখবে। বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য মেনে চলে। ইলেকট্রনের (পরিচিত কণিকাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা) ভরের ১০ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ পরিমাণ ভরও বড় প্রভাব রাখতে সক্ষম।[৪] সেক্ষেত্রে নিউট্রিনোদের ভর নক্ষত্রের ভরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এত ছোট নিশ্চল ভর শনাক্ত করা খুব কঠিন কাজ। এ বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলগুলোও ছিল বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী। তবে একটি বিষয় খুব কৌতূহলের জন্ম দেয়। *'১৯৮৭এ'* সুপারনোভা থেকে পাওয়া গেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। আগেই বলেছি, নিউট্রিনোর নিশ্চল ভর শূন্য হলে তারা অবশ্যই সবাই আলোর সমান গতিতে চলাচল করবে। সবার গতিই কিন্তু সমান হবে এক্ষেত্রে। কিন্তু এদের যদি অল্প হলেও কিছু নিশ্চল ভর থাকে, তাহলে ভর নানান রকম হতে পারে। সুপারনোভা থেকে বের হওয়া নিউট্রিনোরা হবে খুব তেজস্বী। তাই এদের নিশ্চল ভর কিছুটা থাকলেও এরা চলবে আলোর খুব কাছাকাছি গতিতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর আগে এরা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলাচল করার কারণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় খানিকটা কম-বেশি লাগতে পারে। '১৯৮৭এ' সুপারনোভা থেকে আসা নিউট্রিনোদের পৌঁছানোর সময়ের তারতম্য বিশ্লেষণ করে বলা যাবে নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ নিশ্চল ভর কত হতে পারে। এবং এভাবে এটা পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের ভরের ৩০ হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ।

তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বিষয়টায় জটিলতা আরও আছে। কারণ নিউট্রিনোর প্রকারভেদ আছে একের বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চল ভর বের করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী পাউলির প্রস্তাবিত নিউট্রিনো নিয়ে হিসাব করা হয়। কিন্তু পরের দ্বিতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনো পাওয়া গেছে। তৃতীয় আরেক ধরনের নিউট্রিনোর কথা বিগ ব্যাংয়ের সময়ের। এই তিন রকমের নিউট্রিনোই ব্যাপক আকারে তৈরি হয়ে থাকবে। এর মধ্যে বাকি দুই ধরনের নিউট্রিনোর ভরের সীমা কত হবে তা সরাসরি বলা খুব কঠিন। পরীক্ষামূলকভাবে মানের সীমার পাল্লা অনেক বড়। তবে তাত্ত্বিকরা বলছেন, মহাবিশ্বের ভরে নিউট্রিনোর ভর সম্ভবত বড় কোনো ভূমিকা রাখছে না। নিউট্রিনোর ভর বের করার নতুন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আলোকে এই ধারণা বদলেও যেতে পারে।

আবার মহাবিশ্বের ওজন মাপতে গেলে আরও মাথায় রাখতে হবে যে নিউট্রিনো ছাড়াও সম্ভাব্য অন্য আরও মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষও থাকতে পারে। বিগ ব্যাংয়ের সময় অন্যান্য স্থিতিশীল ও দুর্বলভাবে ক্রিয়া করা কণাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে সেগুলোর ভর আরও বেশি। (তবে ভর আবার বেশি হলে অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের কণার তুলনায় এরা

কম তৈরি হবে। কারণ বেশি ভরের কণা তৈরিতে বেশি ভর লাগে) এদেরকে সাধারণভাবে বলা হয় উইম্প (WIMP)। কথাটার পূর্ণরূপ হলো দুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (Weakly Interacting Massive Particles)। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত উইম্প কণার সংখ্যা অনেক। এদের গালভরা নামও আছে। এই যেমন গ্র্যাভিটন, হিগসিনো, ফোটিনো। এরা আসলেই আছে কি না তা কেউ জানে না। তবে আসলেই থাকলে মহাবিশ্বের ওজন মাপতে এদের ভূমিকা মাথায় রাখতেই হবে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, উইম্প কণাদের অস্তিত্ব আছে কি না তা সরাসরিই পরীক্ষা করে ফেলা যায়। সাধারণ পদার্থের সাথে এদের মিথস্ক্রিয়ার ধরন থেকে এটা অনুমান করা যাবে। এই মিথস্কিয়া খুব দুর্বল তা সত্য। তবে বিপুল পরিমাণ উইম্প কণার ভর উল্লেখযোগ্যই হবে। চলন্ত উইম্প কণা শনাক্ত করতে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লবণের খনি ও স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর একটি বাঁধের কাছে এলাকাকে পরীক্ষার স্থান হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। মহাবিশ্বে এদের উপস্থিতি অনেক বেশি ধরে নিলে সবসময় এরা বিপুল সংখ্যায় আমাদের শরীর (এবং পৃথিবী) ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মূলনীতি খুব দারুণ। উইম্প কণা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে ধাক্কা খেলে যে শব্দ হবে, শনাক্ত করা হবে সেই শব্দ।

এর জন্য যন্ত্র বানানো হবে জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের একটি স্ফটিক দিয়ে। যা একটি শীতলীকরণ ব্যবস্থা দিয়ে আবৃত থাকবে। উইম্প কণা স্ফটিকের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে এর ভরবেগের কারণে নিউক্লিয়াস পেছন দিকে ধাক্কা অনুভব করবে। এ ধাক্কার ফলে স্ফটিক ল্যাটিসে ছোট্ট একটি শব্দ তরঙ্গ বা কম্পন তৈরি হবে। তরঙ্গ প্রসারিত হতে থাকলে এর তীব্রতা একটি কমে আসবে। পরিণত হবে তাপশক্তিতে। ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা শব্দ তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন তাপের সূক্ষ্ম সঙ্কেত শনাক্ত করার জন্যে এ পরীক্ষার নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ফটিকের তাপমাত্রা কমিয়ে প্রায় পরম শূন্য পর্যন্ত আনা হয় বলে যে-কোনো তাপ শক্তির আবির্ভাবকেই ডিটেক্টর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করে ফেলবে।

তাত্ত্বিকরা ধারণা করছেন, কিছুটা অল্প গতিতে ছোটা ফোটার আকৃতির উইম্পদের ঝাঁকের মধ্যে ডুবে আছে ছায়াপথগুলো। এই উইম্পদের ভর হয়ত একটি থেকে এক হাজার প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। আর গড় ভর সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার। আমাদের সৌরজগৎ আমাদের ছায়াপথকে ঘিরে পাক খাওয়ার সময় এই অদৃশ্য জায়গা অতিক্রম করে। আর পৃথিবীর প্রতি কেজি পদার্থ প্রতি দিন এক হাজারটি পর্যন্ত উইম্প কণা বিক্ষেপ করতে পারে। এই হারে বিক্ষিপ্ত হলে উইম্প কণাকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়।

একদিকে উইম্প কণার খোঁজ চলছে। অন্য দিকে জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের ভর জানার চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে দেখা (বা শোনা না গেলেও) এর মহাকর্ষীয় টান কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। নেপচুন গ্রহের আবিষ্কারের কথাই ধরুন না। জ্যোতির্বিদরা খেয়াল করলেন, অচেনা একটি বস্তুর মহাকর্ষীয় টানে ইউরেনাসের কক্ষপথে নড়চড় ঘটছে। লুব্ধক বি একটি অনুজ্জ্বল শ্বেত বামন নক্ষত্র। উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে কেন্দ্র করে ঘোরে সেটি। এই বি লুব্ধককেও কিন্তু এভাবেই পাওয়া গেছে। তার মানে, বস্তুর পর্যবেক্ষণযোগ্য গতি খেয়াল করে জ্যোতির্বিদরা অদেখা বস্তুরও চিত্র আঁকতে পারেন। (আমি আগেই বেলছি, কীভাবে এই পদ্ধতিতে সিগ্নাস-১ বস্তুটিকে ব্ল্যাক হোল হিসেবে অনুমান করা হয়েছিল।)

আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্ররা কীভাবে চলছে সে বিষয়ে গত এক বা দুই দশকে খুব নিবিড়ভাবে গবেষণা হয়েছে। সাধারণত নক্ষত্ররা মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে বিশ কোটি বছরের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। ছায়াপথের আকৃতি কিছুটা চাকতির মতো। কেন্দ্রের দিকে নক্ষত্রের ঘনত্বটা একটু বেশি। ফলে সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহের সম্পর্কের মতো প্রায় একই রকম একটি ব্যাপার আছে এখানে। তবে সৌরজগতে বুধ ও শুক্রের মতো পৃথিবী থেকেও ভেতরের দিকের গ্রহগুলো ইউরেনাস বা নেপচুনের মতো বাইরের দিকের গ্রহদের চেয়ে জোরে চলে। এর কারণ হলো ভেতরের দিকের গ্রহগুলো সূর্যের মহাকর্ষীয় টান বেশি অনুভব করে। আমরা হয়ত আশা করব, ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমনই হবে। চাকতির বাইরের দিকের নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রের দিকের নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক ধীরে ঘোরা উচিত।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ বলছে ভিন্ন কথা। পুরো চাকতি জুড়েই নক্ষত্রদের বেগ প্রায় সমান। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে, ছায়াপথের ভর হয়ত কেন্দ্রে পুঞ্জিভূত নয়। বরং পুরো ছায়াপথজুড়ে সমভাবে বিস্তৃত। ছায়াপথের চেহারা দেখে মনে হয়, ভর কেন্দ্রেই পুঞ্জিভূত। তবে আলোকজ্জ্বল অংশ হয়ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখাচ্ছে না। এটা স্পষ্ট যে প্রচুর পরিমাণ অন্ধকার বা অদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এর বড় একটি অংশের অবস্থান চাকতির বাইরের দিকে। আর এটাই সেদিকের নক্ষত্রের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার চাকতির উজ্জ্বল তলের বাইরে খালি চোখে অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটারও থাকতে পারে প্রচুর। এটা হলে আকাশগঙ্গা ঢাকা থাকে বিশাল ভারী এক অদৃশ্য বলয় দিয়ে। এই বলয় আন্তঃছায়াপথীয় স্থানের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য ছায়াপথেও একই রকম বিন্যাস চোখে পড়ে। হিসেব বলছে, (সূর্যের তুলনায়) উজ্জ্বলতা দেখে যতটা মনে হয় ছায়াপথের দৃশ্যমান অংশ গড়ে তার দশ গুণের বেশি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। সবচেয়ে বাইরের দিকে অঞ্চলে আবার এই বিস্তৃতি পাঁচ হাজার গুণ পর্যন্তও হতে পারে।

ছায়াপথগুচ্ছের মধ্যে ছায়াপথের চলাচলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পরিষ্কার কথা: কোনো ছায়াপথ যথেষ্ট বেগে চললে সেটি ছায়াপথ গুচ্ছের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। গুচ্ছের সব ছায়াপথ এই বেগে ঘুরলে গুচ্ছ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসবে। কোমামণ্ডলে আছে কয়েকশ ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ছায়াপথ পুঞ্জ। এটি নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা হয়েছে। এই গুচ্ছে ছায়াপথদের গড় গতিবেগ এতটা বেশি যে এদের পক্ষে এক অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার কথা নয়। এটা একমাত্র সম্ভব যদি ছায়াপথে উজ্জ্বল বস্তুদের ভরের চেয়ে অন্তত কয়েকশ গুণ ভর বেশি উপস্থিত থাকে। কোমা গুচ্ছকে অতিক্রম করতে একটি সাধারণ ছায়াপথের মাত্র প্রায় একশ কোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে এত দিনে গুচ্ছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। সেটা কিন্তু ঘটেনি। উপরন্তু, গুচ্ছে কাঠামো দেখে খুব ভালোভাবে মনে হচ্ছে, এটি মহাকর্ষের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। কোনো এক ধরনের ডার্ক ম্যাটার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত আছে হয়ত। যা ছায়াপথের গতিকে প্রভাবিত করছে।

মহাবিশ্বের অতি-বড়-মাপকাঠির গঠন থেকে অদেখা বস্তু সম্পর্কে আরও একটি ধারণা পাওয়া যায়। অতি-বড়-মাপকাঠি বলতে আমরা বুঝি ছায়াপথের ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ও সুপারক্লাস্টারদের গুচ্ছবদ্ধ হবার প্রক্রিয়া। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, ছায়াপথদের বিস্তৃতি অনেকটা ফেনার মতো। ছড়িয়ে পড়া আঁশের মতো। কিংবা বিশাল শূন্যতাকে ঘিরে থাকা চাদরের মতো। বিগ ব্যাংয়ের এর পরে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে এমন গুচ্ছবদ্ধ ও ফেনিল কাঠামো গড়ে ওঠার কথা নয়। তবে এটা হতে পারে যদি কোনো অনুজ্জ্বল বস্তু বাড়তি মহাকর্ষ সরবরাহ করে। কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে এখন পর্যন্ত সরল কোনো ডার্ক ম্যাটারের ধারণা ব্যবহার করে এ রকম ফেনিল কোনো কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। হতে পারে আরও কোনো জটিল উপাদান রয়েছে মহাবিশ্বে।

ডার্ক ম্যাটারের রহস্য বুঝতে বিজ্ঞানীরা এখন ব্যতিক্রমী কিছু কণার খোঁজ করছেন। তবে ডার্ক ম্যাটার পরিচিতি বস্তুর আকারেও থাকতে পারে। সেটা হতে পারে গ্রহের আকারের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। এমন অন্ধকার বস্তু হয়তো আমাদের অজান্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের চারাপাশের মহকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি জ্যোতির্বিদরা দৃশ্যমান বস্তুদের সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ অন্ধকার বস্তুদেরকে খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় বের করেছেন। এ কৌশলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার একটি ফলাফল ব্যবহার করা হয়। নাম মহাকর্ষীয় বক্রতা (Gr a v i t a t i o n a l l e n s i n g)।

আমরা জানি, মহাকর্ষ আলোকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, দূরের নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় কিছুটা বেঁকে যাবে। এর ফলে আকাশে নক্ষত্রটির আপাত অবস্থান একটু পাল্টে যাবে। আশেপাশে সূর্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির প্রভাব লক্ষ করে এই পূর্বাভাস যাচাই করে দেখা যায়। কাজটি প্রথম করেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে। দারুণভাবে তিনি আনিনস্টাইনের বক্তব্যটি প্রমাণ করেন।

লেন্সও আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে এরা আলোকে কেন্দ্রীভূত করে বিম্ব (ছবি) তৈরি করতে পারে। একটি ভারী বস্তু যথেষ্ট প্রতিসম হলে লেন্সের মতোই আচরণ করবে। কেন্দ্রীভূত করবে দূরের উৎস থেকে আসা আলোকে। এমন একটি ঘটনা ৬.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে। উৎস S থেকে আলো একটি গোলকীয় বস্তুর কাছে এসে পড়লে বস্তুর মহাকর্ষ

এর পাশের আলোকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে। ফলে আলোকরশ্মিগুলো দূরের আরেকটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। বেশিরভগা বস্তুর ক্ষেত্রেই লেন্সিং বা বক্রতার প্রভাব খুব সামান্য। তবে বিশাল দূরত্বের ক্ষেত্রে আলোর চলার পথের সামান্যটুকু বক্রতাও উল্লেখযোগ্য ফোকাস তৈরি করবে। বস্তুটা যদি পৃথিবী ও দূরবর্তী উৎসের মাঝখানে থাকে, তাহলে উৎসের খুব উজ্জ্বল একটি ছবি দেখা যাবে। আবার কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দৃষ্টিরেখা জায়গামতো পড়লে আলোর উজ্জ্বল বৃত্তও দেখা যেতে পারে। একে বলা হয় আইনস্টাইন বলয় (Ei nst ei n r i ng)। আরও জটিল বস্তুর ক্ষেত্রে লেন্সিংয়ের ফলে একটির বদলে অনেকগুলো ছবি তৈরি হবে। মহাজাগাতিক মাপকাঠিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় বক্রতার অনেকগুলো উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবী ও দূরবর্তী কোয়াসারের প্রায় নিখুঁত অবস্থানে কোয়াসারের অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃত্তচাপ। কিছুক্ষেত্রে আবার কোয়াসারের পুরো বৃত্তও দেখা যায়।

চিত্র ৬.১

মহাকর্ষীয় লেন্স।

দূরবর্তী উৎস S থেকে আসা আলো ভারী বস্তুর প্রভাবে বেঁকে যায়। অনুকূল ক্ষেত্রে এটি আলোকে কেন্দ্রীভূত করে। ফোকাস বিন্দুতে থাকা পর্যবেক্ষক বস্তুর চারপাশে আলোর একটি বলয় দেখতে পাবেন।

অদৃশ্য গ্রহ ও অনুজ্জ্বল বামন নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে জ্যোতির্বিদরা এমন বক্রতার সন্ধান করেন। বস্তুটা পৃথিবী ও দূরের কোনো নক্ষত্রের মাঝে থাকলে বক্রতা সেই খবর বলে দেবে। দৃষ্টিরেখা থেকে অদেখা বস্তুটির নড়াচড়ার কারণে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় দৃশ্যমান উঠা-নামা চোখে পড়বে। বস্তুটা নিজে অদৃশ্য হলেও লেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রভাব বোঝা যাবে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু বিজ্ঞানী আকাশগঙ্গা ছায়াপথের হ্যালোতে (h a l o) অদৃশ্য বস্তুর খোঁজ করছেন। অবশ্য দূরবর্তী নক্ষত্রের সাথে অবস্থান একই রেখায় না হবার সম্ভাবনা খুব কম হলেও অদৃশ্য বস্তুর সংখ্যা বেশি হলে মহাকর্ষীয় বক্রতা দেখা যাবেই। ১৯৯৩ সালের কথা। অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল নিউ সাউথ ওয়ালসের মাউন্ট স্ট্রোমলো পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড ছায়াপথের নক্ষত্রদের দেখছিলেন। মহাকর্ষীয় বক্রতার প্রথম সত্যিকার নিদর্শন তাঁরাই খুঁজে পান। এটা ছিল আমাদের ছায়াপথের হ্যালোতে থাকা একটি বামন নক্ষত্রের লেন্সিং।

ব্ল্যাক হোলরাও মহাকর্ষীয় লেন্স হিসেবে কাজ করে। ছায়াপথের বাইরের বেতার উৎস ব্যবহার করে এমন ব্ল্যাক হোলকে ব্যাপকভাবে খোঁজা হয়েছে। (আলোক তরঙ্গের মতো একইভাবে বেতার তরঙ্গও বেঁকে যায়।) অবশ্য সম্ভাব্য বস্তু পাওয়া গেছে খুব কমই। এটা থেকে মনে হচ্ছে, নাক্ষত্রিক বা অতি-ভারী ব্ল্যাক হোলরা হয়ত ডার্ক ম্যাটারের জন্য খুব বেশি দায়ী নয়।

তবে সব লেন্সিংয়ের জরিপে সব ব্ল্যাক হোল কিন্তু দেখাও যাবে না। আবার এটাও সম্ভব যে বিগ ব্যাং পরবর্তী চরম অবস্থায় আণুবীক্ষণিক (mi c r o s c o p i c) ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়ে থাকবে। এদের আকার হবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়ে ছোট। এক্ষেত্রে এদের ভর হবে একটি সাধারণ গ্রহাণুর ভরের সমান। এভাবেও প্রচুর পরিমাণ ভর অদৃশ্য থাকতে পারে। এই ভর ছড়িয়েও থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। শুনতে অবাক লাগলেও এই অদ্ভুত বস্তুগুলোর ভরেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা বের করা সম্ভব। কৌশলটার নাম হলো হকিং প্রভাব (Ha wk i ng e f f e c t)। ৭ম অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত জানব। সংক্ষেপে বলা যায়, আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয়ে এক ঝাঁক বৈদ্যুতিক চার্জগ্রস্থ কণা তৈরি করতে পারে। এই বিস্ফোরণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে। এটা নির্ভর করে ব্ল্যাক হোলের সাইজের ওপর। ছোট ব্ল্যাক হোলরা বিস্ফোরিত হয় দ্রুত। একটি গ্রহাণুর সমান ভরের ব্ল্যাক হোল বিস্ফোরিত হয় এক হাজার কোটি বছর পার হলে। তার মানে বর্তমান সময়ের কাছাকাছি সময়। এই বিস্ফোরণের একটি প্রভাব হবে হঠাৎ

করে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি। বেতার জ্যোতির্বিদরা বিষয়টি যাচাইও করে দেখেছেন। তবে এমন সম্ভাব্য কোনো সঙ্কেত পাওয়া যায়নি। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ৩০ বছরে প্রতি ঘন আলোকবর্ষ জায়গায় এমন বিস্ফোরণ একটির বেশি ঘটা সম্ভব নয়[৫]। এর অর্থ হলো, মহাবিশ্বের মোট ভরের খুব সামান্য একটি অংশই আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলগুলো থেকে পাওয়া যাবে।

আরেকটি কথা হলো, মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণ নিয়েও একেক জ্যোতির্বিদের একেক মত। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঠেকাতে যতটুকু ঘনত্ব প্রয়োজন ঠিক তার চেয়ে কম ন্যূনতম ভরকে বলা হয় সঙ্কট ঘনত্ব (c r i t i c a l d e n s i t y)। হিসেব করে এর ভর পাওয়া গেছে দৃশ্যমান ভরের প্রায় একশ গুণ। টেনেটুনে হলেও এ পরিমাণ ভরের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আশা করতে হবে, ডার্ক ম্যাটারের অনুসন্ধান থেকে শীঘ্রই সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক বা নেতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আর যাই হোক, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আমরা বলতে পারি না মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে কি না। যদি একসময় এটি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে, সেটা কখন? এটা বলতে হলে জানতে হবে মহাবিশ্বের ভর সঙ্কট ভরের চেয়ে কতটা বেশি। যদি এটা শতকরা এক ভাগ বেশি হয়, তাহলে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (বা এক লক্ষ কোটি) বছর পরে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। আবার যদি সেটা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হয়, তাহলে সঙ্কোচন শুরু হয়ে যাবে এখন থেকে ১০ হাজার কোটি বছর পরেই[৬]।

তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক আবার মনে করেন, শুধু হিসেব-নিকেশ করেই মহাবিশ্বের ভর বের করে ফেলা সম্ভব। তাদের মতে, কষ্ট করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। নিছক যুক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করেই যে মানুষ মহাজাগতিক জ্ঞানও আহরণ করে ফেলতে পারে এমন বিশ্বাস গ্রিক দার্শনিকদেরও ছিল। আধুনিক যুগেও কিছু কসমোলজিস্ট মহাবিশ্বের ভরকে গণিতের ছকে চেয়েছেন বেঁধে ফেলতে চেয়েছেন। তাদের মতে, গভীর কোনো নীতিমালা মহাবিশ্বের ভরের একটি নির্দিষ্ট মান সরবরাহ করবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে তাক লেগে যায় সেই সিস্টেমগুলো দেখে, যেগুলো দিয়ে মহাবিশ্বের কণার সংখ্যার সঠিক পরিমাণ সাংখ্যিক সূত্র দিয়ে বের করা যায়।

বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন এমন চিন্তাগুলো দেখতে-শুনতে দারুণ হলেও বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই এগুলো পছন্দ করেন না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি জোরালো তত্ত্ব একটু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি মহাবিশ্বের ভর সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দিতে পারছে। তত্ত্বটি হলো তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্ব।

স্ফীতি তত্ত্বের একটি পূর্বাভাস হলো মহাবিশ্বে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। ধরা যাক, মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে সঙ্কট ভর ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম মান নিয়ে। স্ফীতি যুগ শুরু হলে ঘনত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তত্ত্বের ভাষ্য মতে, ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের মানের খুব কাছে চলে আসে। মহাবিশ্ব যত বেশি সময় ধরে স্ফীত হতে থাকে, ঘনত্ব ততই সঙ্কট মানের কাছাকাছি হতে থাকে। তত্ত্বটির আদর্শ নমুনা অনুসারে, স্ফীতি যুগের মেয়াদ ছিল খুব সামান্য। তাই, অলৌকিক কিছু না ঘটে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্বের ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের ঠিক সমান হওয়ার কথা নয়। সামান্য কম-বেশি হবেই।

তবে স্ফীতির সময়ে ঘনত্বের মান সঙ্কট মানের দিকে যেতে থাকে সূচকীয় হারে[৭]। ফলে ঘনত্বের চূড়ান্ত মান সঙ্কট মানের চেয়ে একটু বেশি হতে পারে। স্ফীতি যুগ যদি সেকেন্ডের খুব সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় পরিমাণও টিকে থাকে তবুও এটাই হওয়ার কথা। এখানে সূচকীয় বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্ফীতির প্রায় প্রতি একক বাড়তি সময়ের জন্যে বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের সঙ্কোচন পর্যায়ের মধ্যে সময় দ্বিগুণ হবে। ফলে এক শ একক স্ফীতি সঙ্কোচনে ১০ হাজার কোটি বছর দেরি হবে। আবার এক শ একটি একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে ২০ হাজার কোটি বছর পরে। এবং এক শ দশ একক স্ফীতির জন্যে সঙ্কোচন শুরু হবে এক লক্ষ কোটি বছর পরে।

স্ফীতি যুগ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল? কেউ সেটা জানে না। তবে যেসব মহাজাগতিক ধাঁধার কথা আমি বলেছি, সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে স্ফীতির সময় ন্যূনতম কয়েক একক (প্রায় এক শ, যদিও মানটি এদিক-সেদিক হতে পারে) হতেই হয়। তবে কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই। ধরুন, কাকতালীয়ভাবে এমন ঘটেছে যে আমাদের বর্তমান পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্যে স্ফীতির যে ন্যূনতম একক দরকার ঠিক ততটাই হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও স্ফীতির পরেও ঘনত্ব সঙ্কট ভরের চেয়ে অনেক বেশি (বা কম) হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ থেকে সঙ্কোচন যুগ বের করতে পারার কথা। অথবা সঙ্কোচন না হয়ে থাকার কথা থাকলে সেটাও বোঝা যাবে। তবে স্ফীতি ন্যূনতম সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি সময় ধরে চলার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। এর ফলে ঘনত্বের মান হবে সঙ্কট মানের খুব কাছাকাছি। তার মানে, মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে থাকলেও সেটা আরও বহু কাল পরের কথা। মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি সময় লাগবে তাতে। সেটাই হয়ে থাকলে মানুষ কখনোই নিজের মহাবিশ্বের ভবিষ্যতটাই জানবে না।

অনুবাদকের নোটঃ

১। ক্রমশ দূরে সরতে থাকা বস্তুর একটি ফলাফল হলো লোহিত সরণ প্রভাব (r e d s h i f t)। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে প্রায় সব গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণে এদের থেকে আসা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যায়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়। আর সবচেয়ে কম নীল আলোর। গ্যালাক্সিরা দূরে সরতে সরতে এদের থেকে আসা আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে লাল দিকে চলে আসে। এটারই নাম লোহিত সরণ। আবার উল্টো দিকে কোনো গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো বস্তু কাছে আসলে তার আলো চলে যায় নীল দিকে। স্বাভাবিকভাবেই একে বলা হয় নীল সরণ (b l u e s h i f t)।

২। কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে বহু গ্যালাক্সি এখনই আলোর কাছাকাছি, এমনকি বেশি বেগেও, ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। মুক্তিবেগ আলোর মাত্র এক শতাংশ হলে সে প্রসারণ থামার কোনো কারণ নেই। মহাকর্ষের টানকে অগ্রাহ্য করে পিছিয়ে না এসে দূরে চলে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় বেগকেই কিন্তু মুক্তিবেগ বলা হয়।

৩। রাতের আকাশে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখলেও খালি চোখে কিন্তু আমরা মাত্র ৫টি গ্রহ দেখতে পাই। মানে, সৌরজগতের সবগুলো গ্রহই কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না। মনে হতে পারে, টেলিস্কোপ দিয়েও অনেক গ্রহ দেখতে পাই। আসলে টেলিস্কোপ দিয়েও নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহ ঢের কম দেখা যায়। আকারে ছোট হওয়ার কারণে ও নিজস্ব আলো না থাকায় দূরের গ্রহদেরকে টেলিস্কোপে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। ২০২০ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ৪,৩৫৪ টি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে নক্ষত্রের অবস্থান উল্লেখ করা বিভিন্ন তালিকাতেই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের নাম আছে।

৪। ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর ৯.১০৯ × ১০^ (-৩১) কেজি। মানে দশমিকের পর ৩০টি শূন্য দিয়ে ৯১০৯ লিখলে যে সংখ্যাটি হবে।

৫। ঘন মিটার যেমন বস্তু বা স্থানের আয়তন পরিমাপে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি ঘন আলোকবর্ষ একক দিয়েও স্থানের আয়তন পরিমাপ করা যায়। আলো এক বছরে যতটুকু যায় সেটা হলো এক আলোকবর্ষ। তার মানে আলোকবর্ষ সময়ের একক নয়, বরং দূরত্বের একক। এবার ঘনকের মতো একটি কক্ষের কথা চিন্তা করুন। এবার এই কক্ষের দৈর্ঘ্যকে এক আলোকবর্ষ ভাবুন। তাহলে এই কক্ষটির আয়তনই হবে এক ঘন আলোকবর্ষ।

৬। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্ব আবার গুটিয়ে যাবে সে সম্ভাবনা খুব কম। তবে গুটিয়ে যাবেই না সেটা বলা যাচ্ছে না।

৭। আমরা গাণিতিক ও জ্যামিতিক হারের সাথে পরিচিতি। সূচকীয় হার জ্যামিতিক হারেরই একটি রূপ। গাণিতিক হার

বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। জ্যামিতিক হার মানে প্রতি বার বাড়ার পর যে মান দাঁড়াবে তার ভিত্তিতে বাড়া। আর সূচকীয় হারও জ্যামিতিক হার। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পরপরের বদলে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি ঘটে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি। আরও জানতে দেখুন- s t a t m a n i a .i n f o ।

সপ্তম অধ্যায়

চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়

অসীম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি শুধুই একটি বড় সংখ্যা নয়। বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রকাণ্ডরকম ও অকল্পনীয়ভাবে বড় কিছুর চেয়ে অসীম একেবারেই আলাদা। ধরুন, মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে প্রসারিত হচ্ছে, যার নেই কোনো শেষ। চিরকাল টিকে থাকার অর্থ হবে এর আয়ু হবে অসীম। এমন ক্ষেত্রে যে-কোনো ভৌত প্রক্রিয়া (p h y s i c a l p r o c e s s) কোনো না কোনো সময় ঘটবেই। চাই তা যতই ধীরগতির কিংবা অসম্ভাব্য হোক না কেন। যেমনিভাবে একটি বানর অনন্তকাল ধরে এলোপাথাড়ি কিবোর্ড চাপতে থাকলে একসময় না একসময় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বইগুলো লেখা হয়ে যাবেই।

মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গমনের ঘটনা থেকে ভাল একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। এটা নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে কথা বলেছি। শুধু প্রকাণ্ড বড় কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় থেকে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে তরঙ্গ নির্গত হয় প্রায় এক মিলিওয়াট। পৃথিবীর গতির ওপর এর প্রভাব ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র (i n f i n i t e s i m a l)। কিন্তু এতটুকু শক্তির ক্ষয়ও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন[১] বছর ধরে চলতে থাকলে একসময় পৃথিবী সর্পিল পথ বেয়ে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা খাবে। হ্যাঁ, তার আগেই সূর্য পৃথিবীকে গিলে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু কথা হলো, যে সময়কালটা মানুষের সময়ের হিসেবে খুব নগণ্য কিন্তু অল্প অল্প করে হলেও অবিরত থাকে, সেটাই একসময় প্রকট হয়ে উঠে ভৌত ব্যবস্থার (p h y s i c a l s y s t e m) ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিতে পারে।

এখন থেকে অনেক অনেক সময় পরের মহাবিশ্বের অবস্থার কথা একটু চিন্তা করি। আজ থেকে এক হাজার কোটি-কোটি-কোটি (মানে ১ পর ২৪টি শূন্য) বছর পরের কথাই ধরুন না। সব নক্ষত্র জ্বালানি ফুরিয়ে আলোহীন হয়ে গেছে। মহাবিশ্বটা এখন অন্ধকার। কিন্তু ফাঁকা নয়। বিশাল শূন্যতার এখানে-সেখানে রয়েছে ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বররা। রয়েছে দলছুট নিউট্রন নক্ষত্র। আর রয়েছে কালো বামন (b l a c k d w a r f)। ও! আছে কিছু গ্রহের অবশেষও। এই সময় এই বস্তুগুলো একে ওপর থেকে থাকবে অনেক অনেক দূরে। মহাবিশ্ব ততদিনে প্রসারিত হয়ে এর বর্তমান আকারের ১০ হাজার ট্রিলিয়ন গুণ হয়েছে।

মহাকর্ষ বল খেলবে এক অদ্ভুত খেলা। প্রসারমান মহাবিশ্ব চাইবে সবগুলো বস্তুকে একে ওপর থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু বস্তুদের পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। চাইবে আরও কাছে আসতে। এর ফলে কিছু কিছু বস্তু মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ছায়াপথপুঞ্জ ও বহু বছরের কাঠামো বিকৃতির পরেও যে ছায়াপথরা টিকে থাকবে। তবে এরাও এদের আশেপাশের বস্তুগুলো থেকে দূরে সরে যাবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কত দ্রুত কমবে তার ওপর নির্ভর করবে কাছে ঠেলা ও টানা এই যুদ্ধের ফল। মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব যত কম হবে, উপরোক্ত বস্তুগুলো তত সহজে আশেপাশের বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ঘুরতে থাকবে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে।

মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ সিস্টেমের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ ধীরে হলেও তার তীব্র আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মহাকর্ষ তরঙ্গের নির্গমন দুর্বল হলেও ঘাতকের মতো ক্রমশ সিস্টেমের শক্তি শেষ করে দেয়। যার ফল একটি ধীর ও সর্পিল পথের মৃত্যু। এভাবে ধীরে ধীরে এক মৃত তারা অন্য মৃত তারা বা কৃষ্ণগহবরের দিকে অগ্রসর হবে। এক সময় এরা গিলে খাবে একে ওপরকে। সূর্যের কক্ষপথ ধ্বংস করতে মহাকর্ষ তরঙ্গের সময় লাগবে এক হাজার কোটি-কোটি-কোটি বছর। সূর্য তত দিনে

হবে একটি কালো বামন নক্ষত্র। দেখতে অঙ্গারের মতো। ধীরে ধীরে যেতে থাকবে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে। যেখানে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণগহবর হা করে আছে তাকে গিলে খাবার জন্যে।

সূর্যের মৃত্যু এভাবেই হবে এটা নিশ্চিত করে বলার কোনো সুযোগ নেই। সর্পিল পথে এগিয়ে যাবার সময় অন্য নক্ষত্রের সাথেও এর দেখা হবে। অনেক সময় এটি চলে আসবে কোনো বাইনারি সিস্টেমের কাছে। যেখানে দুটো তারকা মহাকর্ষীয় বন্ধনে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর ঘটে এক মজার ঘটনা। যার নাম মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ (g r a v i t a t i o n a l s l i n g s h o t)। দুটো বস্তুর একে ওপরের চারপাশের ঘূর্ণন এর সরলতার জন্য বিখ্যাত। এই বিষয়টিই কেপলার ও নিউটনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। যে ব্যস্ততা থেকেই জন্ম আধুনিক বিজ্ঞানের। তাঁরা এক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন সূর্য ও পৃথিবী বস্তু দুটি নিয়ে। একটি আদর্শ পরিবেশের কথা চিন্তা করলে ও মহাকর্ষীয় বিকিরণের কথা বাদ দিলে গ্রহটির এই গতি নিয়মিত ও পর্যাবৃত্ত। মানে নির্দিষ্ট সময় পরপর গতি একই রকম হয়। আপনি যত সময়ই অপেক্ষা করুন না কেন, গ্রহ একইভাবে কক্ষপথে চলতে থাকে। তবে তৃতীয় একটি বস্তু যুক্ত হলেই অবস্থা আমূল পাল্টে যায়। সেটা এক নক্ষত্র ও দুই কিংবা তিন নক্ষত্র যাই হোক। গতি এখন আর সরল ও পর্যাবৃত্ত হবে না। তিন বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ সবসময় জটিল উপায়ে পাল্টে যেতে থাকবে। এর ফলে এই ব্যবস্থার (s y s t e m) শক্তি উপাদান বস্তুগুলোর মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে না। এমনকি তারা একই রকম বস্তু হলেও না। চলতে থাকে বরং এক জটিল নৃত্য। যেখানে একটি বস্তু ও সাথে অন্য একটি বস্তুই শক্তির প্রধান অংশ দখল করে। দীর্ঘ সময়ের কথা চিন্তা করলে ঐ ব্যবস্থার আচরণ অনিবার্যভাবে দৈব[২] (r a n d o m) । সত্যি বলতে, মহাকর্ষীয় গতিবিদ্যার তিন বস্তুর সমস্যা (t h r e e -b o d y p r o b l e m) বিশৃঙ্খল (c h a o t i c) ব্যবস্থারও একটি ভাল উদাহরণ। এমনও হতে পারে যে দুটি বস্তু মিলে উপস্থিত শক্তির এতটাই নিয়ে ফেলে যে তৃতীয় বস্তুটা ব্যবস্থা থেকেই ছিটকে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো। এ কারণেই এ প্রক্রিয়াকে বলে মহাকর্ষীয় নিক্ষেপণ।

নিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রস্তবক থেকে ছিটকে যেতে পারে নক্ষত্র। এমনকি ছায়াপথ থেকেও ছিটকে যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে মৃত নক্ষত্র, গ্রহ ও কৃষ্ণগহ্বরদের বড় অংশ এভাবে আন্তঃছায়াপথীয় স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। হয়ত এ ঘটনার মাধ্যমে সাক্ষাৎ হবে অন্য কোনো ভাঙনরত ছায়াপথের সাথে। অথবা এটি চিরকাল বিশাল প্রসারণশীল শূন্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তবে এই প্রক্রিয়া ঘটবে খুব ধীরে। এটা ঘটতে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের এক শ কোটি গুণ সময় লাগবে। অবশিষ্ট বস্তুগুলো ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করবে। মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে বিশাল বপুর (g i g a n t i c) কৃষ্ণগহ্বর।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিদরা মোটামুটি নিশ্চিত, বর্তমানেই কিছু কিছু ছায়াপথের কেন্দ্রে বিশাল বিশাল কৃষ্ণগহ্বর আছে। এরা ঘূর্ননশীল গ্যাস গিলে খাচ্ছে। বিনিময়ে বিমুক্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। সময় এলে এমন টালমাটাল ঘটনার শিকার হবে সব ছায়াপথ। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না কৃষ্ণগহ্বরের পার্শ্ববর্তী সব বস্তু হয় দূরে ছিটকে যাবে নয়ত কৃষ্ণগহ্বরের পেটে চলে যাবে। ছিটকে যাওয়া বস্তু আবার ফিরেও আসতে পারে। আবার ক্রমশ হালকা হয়ে আসা আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের সাথেও মিশে যেতে পারে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা কৃষ্ণগহ্বরটি এবার মোটামুটি নিথর হয়ে থাকবে। শুধু থেকে থেকে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন নিউট্রন নক্ষত্র কিংবা কৃষ্ণগহ্বর এসে মিশে যাবে এর সাথে। তবে কৃষ্ণগহ্বরের জীবন এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণগহ্বর ঠিক কৃষ্ণ নয়। তারা বরং একটি দুর্বল তাপের আভা বিকিরণ করে।

এই হকিং বিকিরণ ঠিকভাবে বুঝতে হলে লাগবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তত্ত্বটা সহজ নয়। মহাবিশ্বের স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার সময় আমি এর কথা আলোচনা করেছি। হয়ত মনে আছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি প্রধান বক্তব্য হলো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। নীতিটি বলছে, কোয়ান্টাম কণাদের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের সুসংজ্ঞায়িত মান থাকে না। যেমন ধরুন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফোটন বা ইলেকট্রন কণার শক্তির পরিমাণের নির্দিষ্ট কোনো মান থাকা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে, একটি অতিপারমাণবিক কণা শক্তি 'ধার' করতে পারে। শর্ত হলো খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই শক্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়েই বলেছি, শক্তির এই ধার করা থেকে কিছু আগ্রহোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হলো আপাত দৃষ্টিতে শূন্য স্থানে স্বল্পায়ু বা ভার্চুয়াল কণার উপস্থিতি। এটা থেকে পাওয়া যায় এক অদ্ভুত ধারণা। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম। এটা এমন এক ভ্যাকুয়াম ('ফাঁকা স্থান'), যেটি ফাঁকা থাকার বদলে অস্থির ভার্চুয়াল কণার উপস্থিতিতে মুখর থাকে। এই কার্যক্রম সাধারণত চোখে পড়ে না। তবে এর ভৌত প্রভাব কিন্তু আছে। এমন একটি ফলাফল পাওয়া যায় ভ্যাকুয়ামের এই কার্যক্রম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হলে।

ভার্চুয়াল কণাদের একটি চরম পরিবেশ পাওয়া যায় কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের কাছে। আগেই বলেছি, ধার করা শক্তির সাহায্যে ভার্চুয়াল কণারা অল্প সময়ের জন্য অস্তিত্বমান থাকে। একটু পরেই শক্তিটুকু দিয়ে দিতে হয়। কণাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কোনো কারণে ভার্চুয়াল কণারা বাইরের কোনো উৎস থেকে শক্তির বড় কোনো সরবরাহ পেলে তাদের ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়ে গেল। অতএব, ঋণ পরিশোধের জন্যে এবার আর তাদেরকে বিলীন হয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। এবার এরা কম-বেশি স্থায়ী অস্তিত্ব পাবে।

হকিংয়ের মতে এমন ঋণ নেওয়ার ঘটনাই ঘটে ব্ল্যাক হোলের কাছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেওয়া দাতা হলো ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। কাজটি ঘটে এভাবে: সাধারণত ভার্চুয়াল কণারা তৈরি হয় জোড়ায় জোড়ায়। আর গতি থাকে বিপরীত থাকে। ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে এমন এক জোড়া নতুন কণার কথা চিন্তা করুন। ধরুন, কণাদের গতি এমন যে একটি কণা ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে চলে গেল। যাওয়ার সময় এটি ব্ল্যাক হোলের তীব্র মহাকর্ষ থেকে প্রচুর শক্তি লাভ করবে। হকিং দেখলেন, এই শক্তিটুকু দিয়ে পুরো ঋণটাই শোধ করে ফেলা যায়। এর মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের ভেতরের ও বাইরের দুটি কণাই বাস্তব কণায় পরিণত হয়। দিগন্তের বাইরের বিচ্ছিন্ন কণাটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হতে পারে, এটিও ব্ল্যাক হোলের দিকে চলে আসবে। আবার উচ্চ বেগে ব্ল্যাক হোল থেকে উল্টো দিকেও যেতে পারে। পালিয়ে যেতে পারে ব্ল্যাক হোলের ত্রিসীমানা থেকে। অতএব হকিং বলছেন, ব্ল্যাক হোল থেকে দূরের দিকে এমন ঝাঁক কণা অবিরাম পালাতে থাকবে। এ ঘটনারই নাম হকিং বিকিরণ।

আণুবীক্ষণিক ব্ল্যাক হোলের জন্যেই হকিং বিকিরণ সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। একটি ভার্চুয়াল ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করুন। সাধারণ অবস্থায় এটি ঋণ পরিশোধ করার আগে সর্বোচ্চ $১০^{-১১}$ সেন্টিমিটার পথ যেতে পারে। তার মানে শুধু এর চেয়ে ছোট মাত্রার (প্রায় পরমাণুর কেন্দ্রের সমান) ব্ল্যাক হোলই শুধু সত্যিকার অর্থে ইলেকট্রনের ফোয়ারা তৈরি করতে পারবে। ব্ল্যাক হোল এর চেয়ে বড় হলে বেশিরভাগ ভার্চুয়াল ইলেকট্রনই ঋণ পরিশোধের আগে ঘটনা দিগন্ত থেকে বের হতে পারবে না।

একটি ভার্চুয়াল কণা কতটা পথ যাবে সেটা নির্ভর করে সেটি কত সময় বাঁচবে তার ওপর। এটা আবার নির্ভর করে ধারকৃত শক্তির পরিমাণের ওপর। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে। ঋণ যত বেশি হবে, কণার আয়ু হবে তত কম। শক্তি ধার করার বড় একটি অংশ হলো কণার নিশ্চল ভরশক্তি। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ অন্তত ইলেকট্রনের নিশ্চল ভরের সমান হতে হবে। প্রোটন বা এমন আরও বেশি নিশ্চল ভরের কণার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হবে আরও বড়। তাই মেয়াদকালও হবে কম। তার মানে অতিক্রান্তও পথও হবে অল্প। তাহলে ভাবুন হকিং বিকিরণের মাধ্যমে প্রোটন তৈরি করতে হলে কেমন পরিবেশ লাগবে। লাগবে এমন এক ব্ল্যাক হোল, যা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়েও ছোট। অন্য দিকে নিউট্রিনো বা এমন আরও কম নিশ্চল ভরের কণা তৈরি হবে এমন ব্ল্যাক হোলে যার মাত্রা পরমাণুর কেন্দ্রের মাত্রার চেয়ে বড়। ফোটনের নিশ্চল ভর শূন্য। এটা যে-কোনো আকারের ব্ল্যাক হোলই তৈরি করতে পারবে। এমনকি মাত্র এক সৌর ভরের ব্ল্যাক হোলও হকিং প্রবাহের মাধ্যমে ফোটন, এমনকি সম্ভবত নিউট্রিনোও নির্গত করবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রবাহের তীব্রতা হবে খুব দুর্বল।

এখানে 'দুর্বল' কথাটায় এতটুকুও অত্যুক্তি নেই। হকিং দেখলেন, ব্ল্যাক হোল দিয়ে সৃষ্ট শক্তির বর্ণালি একটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের মতোই হয়। অতএব, হকিং প্রভাবের তীব্রতা পরিমাপ করার একটি উপায় হলো তাপমাত্রা। পরমাণুর কেন্দ্রের আকারের (ব্যাস $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার) একটি ব্ল্যাক হোলের তাপমাত্রা অনেক অনেক বেশি। প্রায় এক

হাজার ডিগ্রি। অন্য দিকে সৌর ভরের একটি ব্ল্যাক হোলের ব্যাস মাত্র এক কিলোমিটার। আর তাপমাত্রা পরম শূন্য[৩] তাপমাত্রার ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম। হকিং বিকিরণের মাধ্যমে পুরো বস্তুটি এক ওয়াটের এক হাজার কোটি-কোটি-কোটি ভাগেরও কম পরিমাণ বিকিরণ উদ্গীরণ করবে।

হকিং প্রভাবের অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এর একটি হলো ব্ল্যাক হোলের ভর যত কম কম হয়, বিকিরণের তাপমাত্রা হয় তত বেশি। তার মানে ছোট ব্ল্যাক হোলরা বেশি উত্তপ্ত হয়। বিকিরণের মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের শক্তি কমতে থাকে। ফলে কমে ভরও। আর এটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ফলে এটি আরও উত্তপ্ত হয়। ফলে বিকিরণ হয় আরও বেশি। তার মানে ছোট হয় আরও দ্রুত গতিতে। স্বভাবগতভাবেই প্রক্রিয়াটি অস্থিতিশীল কিন্তু শক্তিশালী। ব্ল্যাক হোল ক্রমশই আগের চেয়ে দ্রুত শক্তি নির্গত করতে থাকে ও আকারে ছোট হতে থাকে।

হকিং প্রভাব বলছে, বিকিরণ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সব ব্ল্যাক হোল নিঃশেষ হয়ে যাবে। শেষের মুহূর্তগুলো হবে দেখার মতো। মনে হবে যেন এক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। তীব্র তাপ শক্তির এক স্বল্পস্থায়ী ঝলক। তারপর? তারপর আর কিছুই না। তত্ত্ব অন্তত সে কথাই বলছে। তবে কিছু কিছু পদার্থবিদ ব্ল্যাক হোলকে মেনে নিতে পারছেন না। কেন একটি জড় পদার্থ গুটিয়ে গিয়ে ব্ল্যাক হোল হবে? তাও আবার পরে শুধু তাপ বিকিরণ রেখে নিজে মিলিয়ে যাবে শূন্যে!

তাদের উদ্বেগের কারণ হলো, দুটি একদম আলাদা বস্তু অবিকল একই রকম তাপ বিকিরণের জন্ম দিতে পারে। ফলে মূল ব্ল্যাক হোলের আগের কোনো তথ্য সংরক্ষিত থাকছে না। এমন উধাও হওয়ার প্রক্রিয়া সব ধরনের সংরক্ষণশীলতা নীতির বিপক্ষে। তবে বিকল্প একটি ব্যাখ্যাও আছে। হয়ত উধাও হওয়ার আগে ব্ল্যাক হোল একটি সূক্ষ্ম ধ্বংসাবশেষ রেখে যায়। যাতে কোনোভাবে বিপুল পরিমাণ তথ্য রক্ষিত থাকে। সে যাই হোক, ব্ল্যাক হোলের ভরের বিশাল একটি অংশ তাপ ও আলো আকারে বিকিরিত হয়ে যাচ্ছেই।

হকিং প্রক্রিয়া অভাবনীয়রকম ধীরে কাজ করে। এক সৌর ভরের একটি ব্ল্যাক হোলই নিঃশেষ হতে $১০^{৬৬}$ বছর সময় নেবে। অন্য দিকে একটি সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাক হোলের সময় লাগবে $১০^{৯৩}$ বছর। তাও আবার প্রক্রিয়াটি শুরুই হবে না যতক্ষণ না মহাবিশ্বের পটভূমি তাপমাত্রা সেই ব্ল্যাক হোলের তাপমাত্রার নীচে না নামে। অন্যথায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে ব্ল্যাক হোলের দিকে প্রবাহিত তাপের তীব্রতা ব্ল্যাক হোল থেকে হকিং প্রভাবের মাধ্যমে নির্গত তাপের চেয়ে বেশি হবে। বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা পরম শূন্যের তিন ডিগ্রি ওপরে। সৌর ভরের ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে তাপ বিকিরণের নিঃসরণ ও আগমনের ভারসাম্য (সমান-সমান) হওয়ার তাপমাত্রা কমে আসতে সময় লাগবে $১০^{২২}$ বছর। হকিং বিকিরণ এমন কিছু নয় যা আমরা কিছুক্ষণ বসে থেকেই দেখে ফেলতে পারব।

তবে চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। তাই চিরকাল অপেক্ষা করতে পারলে সম্ভবত সব ব্ল্যাক হোল, এমনকি অতিভারীদেরকেও উধাও হতে দেখা যাবে। চিরন্তন মহাজাগতিক অমানিশার আলোর ক্ষণস্থায়ী ঝলক দেখিয়ে ব্ল্যাক হোল তার মৃত্যু-বেদনা প্রকাশ করবে। কোটি কোটি সূর্যের সমান তেজস্বী বস্তুটার বিদায় ঘণ্টা!

বাকি থাকল তাহলে কী?

সব পদার্থ ব্ল্যাক হোলে পতিত হয় না। নিউট্রন নক্ষত্র ও কৃষ্ণবামন নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এছাড়াও আছে নিঃসঙ্গ গ্রহ, যারা একাকী আন্তঃছায়াপথীয় স্থানে ঘুরে বেড়ায়। শুধু কি তাই? আরও আছে গ্যাস ও ধূলিকণার হালকা আবরণ। যেগুলো কখনোও সমবেত হয়ে নক্ষত্রে পরিণত হতে পারেনি। আরও আছে গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও বিভিন্ন সৌরব্যবস্থার পুরনো পাথরখণ্ড। এসব বস্তুরা কি চিরকাল টিকে থাকবে?

এখানে এসে আমরা তাত্ত্বিক সমস্যায় পড়ে যাই। আমাদেরকে জানতে হবে সাধারণ পদার্থ, মানে আমরা মানুষরা এবং

পৃথিবী যেসব বস্তু দিয়ে গড়া তা কি একেবারে স্থিতিশীল? ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওপর। কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া সাধারণত পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তবে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নীতি সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবার কথা। প্রযোজ্য হবার কথা আণুবীক্ষণিক বস্তুর ক্ষেত্রেও। বড় বস্তুদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ফলাফল অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র। তবে দীর্ঘ সময়ে সেটাও বড় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনিশ্চয়তা ও সম্ভবনা। কোয়ান্টাম জগতে কিছুই নিশ্চিত নয়। আছে শুধু সম্ভাবনা। তার মানে কোনো একটি ঘটনা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ সময় পেলে এটি ঘটবেই। তার সম্ভাবনা যতই কম হোক। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটির প্রতিফলন দেখি। ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর নিউক্লিয়াস প্রায় সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তবে এটি থেকেও একটি আলফা কণা নিক্ষিপ্ত হয়ে থোরিয়াম তৈরি হয়ে যাবার ছোট একটি সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। আরও সঠিক করে বললে, প্রতি একক সময়ে একটি নির্দিষ্ট ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভেঙে যাবার একটি খুব ছোট সম্ভাবনা আছে। এটা ঘটতে গড়ে সাড়ে চারশো কোটি বছর সময় লাগে। তবে পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রতি একক সময়েই একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা চায়। ফলে যে-কোনো ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রই একসময় না একসময় ভাঙবেই।

একবার ভাবুন তো, আলফা কণার তেজস্ক্রিয় ক্ষয় কেন ঘটে? কারণ ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থানে একটুখানি অনিশ্চয়তা আছে। ফলে সবসময় ক্ষুদ্র হলেও এক গুচ্ছ কণা অল্প সময়ের জন্য নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করার একটি সম্ভাবনা আছে। এ কারণে নিউক্লিয়াস থেকে তারা দ্রুত দূরে ধাবিত হয়। একইভাবে কঠিন পদার্থের পরমাণুর অবস্থানের ব্যাপারেও একটি আরও ছোট কিন্তু অশূন্য অনিশ্চয়তা আছে। যেমন হীরার মধ্যে একটি কার্বন পরমাণুর কথা ভাবুন। এটি স্ফটিকের ল্যাটিসের মধ্যে খুবই সুসংজ্ঞায়িত জায়গায় অবস্থান করে। দূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের প্রত্যাশিত তাপমাত্রা শূন্যের কাছে পৌঁছলেই এই অবস্থান অস্থিতিশীল হওয়ার কথা। কিন্তু পুরোপুরি নয়। পরমাণুটির অবস্থানে সবসময়ই একটি ক্ষুদ্র অনিশ্চয়তা আছে। এর মানে হলো, ল্যাটিস থেকে পরমাণুটি বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। এমন প্রস্থান প্রক্রিয়ার কারণে কোনো পদার্থই, এমনকি হীরার মতো কঠিন পদার্থও, সত্যিকার অর্থে কঠিন নয়। বরং, যাকে দেখতে কঠিন মনে হয় সেটি আসলে অনেক বেশি আঠালো একটি তরল পদার্থ। এবং অনেক বেশি সময় পেলে এটিও তরলের মতো প্রবাহিত হতে পারবে। কারণ হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রভাব। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন হিসেব করে দেখেছেন, প্রায় $১০^{৬৫}$ বছর পরে যত্নের সাথে কাটা প্রতিটি হীরকখণ্ড গোলাকার গুটিতে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, প্রতি টুকরো পাথরও পরিণত হবে মসৃণ গোলকে।

অবস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে নিউক্লীয় রূপান্তরও ঘটে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে হীরার স্ফটিকের দুটো প্রতিবেশী পরমাণুর কথা ভাবুন। খুব কম ঘটলেও অনেক সময় দেখা যায়, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস স্বতস্ফূর্তভাবেই সামান্য সময়ের জন্য এর প্রতিবেশী পরমাণুর পাশে আবির্ভূত হয়। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণী বল হয়ত তখন দুটো নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে ম্যাগনেসিয়ামের একটি নিউক্লিয়াস বানিয়ে দেবে। তার মানে নিউক্লীয় ফিউশন (সংযোজন) ঘটার জন্যে খুব উচ্চ তাপমাত্রা না হলেও চলে। শীতল সংযোজনও সম্ভব। তবে এর জন্যে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সময়। ডাইসন হিসেব করে দেখেছেন, $১০^{১৫০০}$ বছর (তার মানে ১ এর পরে ১৫০০টি শূন্য) পরে সব পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে সবচেয়ে স্থিতিশীল নিউক্লিয় আকৃতি লাভ করবে। এটা হলো লৌহ।

তবে এটাও পারে যে নিউক্লিয় বস্তুটি এতটা সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে না। এর কারণ হলো খুব ধীরগতির হলেও আরও দ্রুতগতির নিউক্লিয় রূপান্তর প্রক্রিয়া। ডাইসনের পরিমাপে প্রোটনকে (ও নিউক্লিয়াসে থাকা নিউট্রনকে) পুরোপুরি স্থিতিশীল ধরে নেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, একটি প্রোটন ব্ল্যাক হোলে পতিত না হলে বা অন্য কোনোভাবে উত্তেজিত না হলে এটি চিরকাল টিকে থাকবে। কিন্তু বিষয়টা কি আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি? আমার ছাত্রজীবনে এটা নিয়ে কারোই সন্দেহ ছিল না। প্রোটনরা ছিল অবিনশ্বর। তারা ছিল পুরোপুরি স্থিতিশীল। তবে একটুখানি অস্বস্তিকর সন্দেহ সবসময়ই ছিল। সমস্যাটির সাথে জড়িয়ে আছে পজিট্রন নামে একটি কণা। এটি ইলেকট্রনের মতোই। পার্থক্য একটি জায়গায়। প্রোটনের মতোই এর চার্জ ধনাত্মক (যেখানে ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক)। প্রোটনের চেয়ে এরা অনেক হালকা।

ফলে, অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে প্রোটনরা পজিট্রন হয়ে যেতে চাইবে। পদার্থবিদ্যায় ভৌত ব্যবস্থাগুলো (physical system) একটি গূঢ় নীতি মেনে চলে। এই ব্যবস্থাগুলো সবসময় ন্যূনতম শক্তির অবস্থায় যেতে চায়। আর অল্প ভর মানে অল্প শক্তি। এখন, কেউই বলতে পারবেন না কেন প্রোটনরা এই কাজটি করে না। তাই পদার্থবিদরা অনুমান করে নিলেন, প্রকৃতির কোনো সূত্র হয়ত একে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুদিন আগেও বিষয়টি একমদ দূর্বোধ্য ছিল। তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র অনুসারে নিউক্লিয় বলগুলো কীভাবে এক কণাকে অন্য কণায় রূপান্তরিত করে সে সম্পর্কে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হয় ১৯৭০ এর দশকে। সর্বশেষ তত্ত্বগুলো অনুসারে প্রোটনের ক্ষয়ের বিপরীতে কাজ করা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে এমন বেশিরভাগ তত্ত্বই বলছে, সূত্রটি পুরোপুরি ফলপ্রসূ নয়। একটি প্রোটন পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাবার একটি ছোটখাট সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বাকি ভরটুকুর কিছু অংশ বৈদ্যুতিকভাবে আধান নিরপেক্ষ কোনো কণায় পরিণত হতে পারে। যেমন তথাকথিত পাইওন। কিছু অংশ আবার গতি শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে (ক্ষয়ের ফেল সৃষ্ট বস্তুগুলো উচ্চ বেগে চলাচল করবে)।

সবচেয়ে সরল একটি তাত্ত্বিক নমুনা অনুসারে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য গড় সময়ের প্রয়োজন $১০^{২৮}$ বছর। এটা মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের দশ হাজার-কোটি-কোটি গুণ। এ কারণে আপনার কাছে হয়ত মনে হবে প্রোটন ক্ষয়ের বিষয়টি শুধুমাত্র কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিষয়টির সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স জড়িয়ে আছে। ফলে সহজাতভাবেই এটি সম্ভাবনা-নির্ভর। $১০^{২৮}$ বছর হলো পূর্বাভাসকৃত গড় আয়ু। সব প্রোটনের প্রকৃত আয়ু নয়। অনেক বেশি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে আমাদের চোখের সামনেই একটি প্রোটনের ক্ষয় দেখার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। সত্যি বলতে, $১০^{২৮}$ টি প্রোটনের কথা বিবেচনা করলে প্রায় প্রতি বছর একটি করে প্রোটন ক্ষয় হওয়ার কথা। আর মাত্র ১০ কেজি পদার্থেই আছে $১০^{২৮}$টি প্রোটন।

তবে আসলে যেটা ঘটল, তত্ত্বটা জনপ্রিয় হবার আগেই প্রোটনের এই রকম আয়ু থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষামূলকভাবে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্বটির বিভিন্ন রূপভেদে আরও বেশি আয়ুর কথা বলা হয়েছে। $১০^{৩০}$ বা $১০^{৩২}$ বছর। বা আরও বেশি। কিছু কিছু তত্ত্ব তো $১০^{৮০}$ বছর পর্যন্ত অনুমান করে। অল্প মানগুলো পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইযোগ্য। যেমন $১০^{৩২}$ বছর ক্ষয়কালের অর্থ হবে আপনার পুরো আয়ুষ্কালে আপনি শরীর থেকে একটি বা দুটি প্রোটন হারাতে পারেন। কিন্তু এমন দুর্লভ ঘটনা কীভাবে শনাক্ত করা সম্ভব?

এর জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। হাজার হাজার টন পদার্থ জড় করা হয়। এর পর খুব সংবেদনশীল ডিটেক্টর দিয়ে বহু মাস যাবত এগুলোর ওপর নজর রাখা হয়। ডিটেক্টরকে এমনভাবে রাখা ছিল যাতে একটি প্রোটন ক্ষয়ের উৎপাদকও সঙ্কেত দেবে। তবে দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো প্রোটন ক্ষয় খোঁজা খরের গাদায় সুঁই খোঁজার মতোই। কারণ, এমন ক্ষয় মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাবে ঘটা আরও এমন বহু বেশিসংখ্যক ঘটনার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে মহাকাশ থেকে আসা উচ্চশক্তির কণার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। এর ফলে অতিপারমাণবিক কণিকার একটি সর্বদা-উপস্থিত পটভূমি তৈরি হচ্ছে। এই ব্যতিচার কমানোর জন্য পরীক্ষা চালাতে হয় মাটির নীচে।

মাটির আধমাইলের বেশি নীচে এ ধরনের একটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জায়গাটা ওহাইয়োর ক্লিভল্যান্ডের একটি লবণের খনিতে অবস্থিত। ১০ হাজার টন অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিকে ঘনাকার ট্যাংকে রেখে ডিটেক্টর দিয়ে ঘেরাও করে যন্ত্র নির্মাণ করা হয়। পানি ব্যবহারের কারণ এর স্বচ্ছতা। ফলে ডিটেক্টর একবারে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রোটন দেখতে পাবে। বুদ্ধিটা ছিল এমন: যদি ভাল কোনো তত্ত্বের কথা অনুসারে প্রত্যাশিত উপায়ে কোনো প্রোটনের ক্ষয় ঘটে তাহলে এটি একটি পজিট্রনের পাশাপাশি বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি করবে। এটা আমরা আগেও ব্যাখ্যা করেছি। এই পাইওনও আবার দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে। সাধারণত এ ক্ষয় থেকে দুটি খুব তেজস্বী ফোটন বা গামা রশ্মি তৈরি হবে। শেষে এই গামা রশ্মি পানির নিউক্লিয়াসের দেখা পায়। প্রতিটি থেকে তৈরি হয় একটি ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়। এরাও হয় খুব তেজস্বী। সত্যি বলতে, এই গৌণ ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলো এতই তেজস্বী হয় যে এরা আলোর কাছাকাছি গতিতে চলে। এমনকি পানিতেও।

শূন্য মাধ্যমে আলো চলে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে। কোনো কণাই এর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। এখন, পানি আলোর গতিকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। বেগ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার। ফলে পানিতে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলা উচ্চ গতির কোনো অতিপারমাণবিক কণা পানিতে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে চলে। কোনো আকাশযান শব্দের চেয়ে বেশি বেগে চললে তীব্র গুম গুম শব্দ হয়। এর নাম সনিক বুম। একইভাবে কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা কোনো চার্জিত কণা সেই মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র তড়িচ্চুম্বকীয় শকওয়েভ তৈরি করবে। এর নাম চেরেনকোভ বিকিরণ। প্রক্রিয়াটির রুশ আবিষ্কারকের নামেই নামটি দেওয়া। এ কারণে ওহাইওর পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা চেরেনকোভ ঝলকের খোঁজে এক গুচ্ছ আলোকসংবেদী ডিটেক্টর স্থাপন করেন। প্রোটনের ক্ষয়কে মহাজাগতিক নিউট্রিনো ও অন্যান্য ভেজাল অতিপারমাণবিক ধ্বংসাবশেষ থেকে আলাদা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট একটি সঙ্কেতের খোঁজ করেন। একের পর একই একইসাথে আসা চেরেনকোভ আলোক সঙ্কেতের জোড়া। এটা নির্গত হবে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জোড়া ভিন্নদিকে গতিশীল হলে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েক বছরের অনুসন্ধানের পরেও ওহাইওর পরীক্ষা থেকে প্রোটন ক্ষয়ের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, এ পরীক্ষায় সুপারনোভা "১৯৭৪এ" থেকে আসা নিউট্রিনো ধরা পড়ে। (বিজ্ঞানে এমনটা হরমহামেশাই ঘটে। একটি জিনিস খুঁজতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য জিনিস পাওয়া যায়) এই বইটি লেখার সময় পর্যন্ত[৫] আলাদা কৌশলে নির্মিত অন্য পরীক্ষার ফলাফলও নাবোধক। এর অর্থ হতে পারে, প্রোটনরা ক্ষয়ই হয় না। আবার এও হতে পারে, এরা ক্ষয় হয়, তবে এদের আয়ুষ্কাল $১০^{৩২}$ বছরের বেশি। বর্তমান সময়ের পরীক্ষণ উপকরণ দিয়ে এর চেয়ে ধীরগতির ক্ষয় হার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই নিকট ভবিষ্যতে প্রোটন ক্ষয়ের ব্যাপারে কোনো ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনাও দেখা যাচ্ছে না।

অনেকগুলো মহা একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Grand unified theory) বিষয়ক তাত্ত্বিক কাজের মাধ্যমে প্রোটন ক্ষয়ের অনুসন্ধান শুরু। লক্ষ্য ছিল সবল (সবল বলের কাজ হলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনদেরকে গেঁথে রাখা) ও দুর্বল নিউক্লীয় বল (দুর্বল নিউক্লীয় বল বেটা তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী) এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে জোড়া দেওয়া। এই বলগুলোর সূক্ষ্ম মিশ্রণেও প্রোটন ক্ষয় ঘটবে। তবে এই মহাএকভীবন ভুল হয়ে থাকলেও অন্য উপায়েও প্রোটন ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা হতে পারে প্রকৃতির চতুর্থ মৌলিক বল মহাকর্ষের মাধ্যমে।

মহাকর্ষ কীভাবে প্রোটন ক্ষয় ঘটায় সেটা দেখতে হলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রোটন কিন্তু সত্যিকার অর্থে মৌলিক কণা নয়। নেই কোনো বিন্দুসদৃশ আকৃতি। এটি আসলে একটি যৌগিক কণা। কোয়ার্ক নামে আরও তিনটি ছোট কণা দিয়ে এটি তৈরি। বেশিরভাগ সময়েই প্রোটনের ব্যাস হয় এক সেন্টিমিটারের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। এটা হলো কোয়ার্কদের মধ্যকার গড় দূরত্ব। তবে কোয়ার্করা স্থির থাকে না। প্রোটনের মধ্যে অবিরত অবস্থান বদলাতে থাকে। এরও কারণ কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অনিশ্চয়তা। মাঝেমধ্যেই দুটি কোয়ার্ক একে ওপরের খুব কাছে চলে আসে। আরও কম ঘটলেও অনেক সময় তিনটি কোয়ার্কই খুব কাছে চলে আসে। এমনিতে কোয়ার্কদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। তবে এটা অসম্ভব নয় যে কণাগুলো এতটা কাছে আসবে যে তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল অন্য সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী হবে। এটা সত্যি হয়ে থাকলে কোয়ার্করা জড় হয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোল তৈরি করতে পারে। প্রকৃত অর্থে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের প্রভাবে প্রোটন নিজের মহাকর্ষের ভারেই গুটিয়ে যায়। এর ফলে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলটি হয় খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রক্রিয়ার কথা মনে করে দেখুন। প্রোটন ক্ষয় থেকে প্রাপ্ত ব্ল্যাকহোলও সাথেসাথেই আবার উধাও হয়ে যায়। তৈরি হয় একটি পজিট্রন। এই উপায়ে প্রোটন ক্ষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এখনও সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে সময়টা $১০^{৪৫}$ বছর থেকে $১০^{২২০}$ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

দীর্ঘ সময় পর প্রোটন ক্ষয়ই হয়ে গেলে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের ওপর তার বড় প্রভাব থাকবে। সব পদার্থ হয়ে যাবে অস্থিতিশীল। এবং সবশেষে উধাও। গ্রহদের মতো কঠিন বস্তুরা ব্ল্যাকহোলেও পতিত না হলেও চিরকাল থাকবে না। খুব দ্রুতই ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। প্রোটনের আয়ুষ্কাল $১০^{৩২}$ হলে তার অর্থ হবে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ-কোটি প্রোটন হারাচ্ছে। এই হারে চলতে থাকলে মোটামুটি $১০^{৩৩}$ বছর পরে আমাদের পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগেই

অন্য কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

তবে নিউট্রন নক্ষত্র কিন্তু এই পক্রিয়া থেকে মুক্ত। নিউট্রনরাও তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। যে প্রক্রিয়ায় প্রোটন ধ্বংস হয় মোটামুটি সেভাবেই নিউট্রনও আরও হালকা কণায় পরিণত হতে পারে। (বিচ্ছিন নিউট্রন কণা যেকোনো অবস্থাতেই অস্থিতিশীল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যেই ক্ষয় হয়ে যেতে পারে।) শ্বেত বামন নক্ষত্র, পাথর, ধূলা, ধূমকেতু, গ্যাসের হালকা মেঘ এবং অন্যসব মহাকাশ প্রযুক্তিও একইভাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। আমরা বর্তমানে যে $১০^{৪৮}$ টন পদার্থকে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকতে দেখছি সেটাও একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। হয় ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পতিত হবে। নয়তো ধীরে ধীরে নিউক্লীয় ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ হবে।

প্রোটন ও নিউট্রনরাও ক্ষয় হলে অবশ্যই তৈরি হয় ধ্বংসাবশেষ। ফলে মহাবিশ্ব পুরোপুরি পদার্থহীন হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এর একটি উদাহরণ আগেও দেওয়া হয়েছে। প্রোটন ক্ষয়ের সম্ভাব্য একটি উপায় হলো একটি পজিট্রন ও একটি নিরপেক্ষ পাইওন তৈরি হওয়া। পাইওন খুব অস্থিতিশীল। খুব দ্রুত ক্ষয় হয়ে দুটো ফোটনে পরিণত হয়। অথবা ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া। দুই ক্ষেত্রেই প্রোটন ক্ষয়ের ফলে মহাবিশ্ব ক্রমাগত বেশি বেশি পজিট্রন দিয়ে ভরপুর হতে থাকবে। পদার্থবিদিদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বে ধনাত্মক (প্রধানত প্রোটন) ও ঋণাত্মক চার্জধারী (প্রধানত ইলেকট্রন) কণার সংখ্যা সমান। এর অর্থ হলো, সবগুলো প্রোটন ক্ষয় হয়ে গেলে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের পরিমাণ সমান হবে। এখন, পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের প্রতিকণা। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের দেখা হলে একে ওপরকে শেষ করে দেয়। পরীক্ষাগারে এই প্রক্রিয়াটি অনায়াসে করে দেখা হয়। কণা দুটির সাক্ষাতের ফলে ফোটন কণা আকারে প্রচুর পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয়।

দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বে উপস্থিত পজিট্রন ও ইলেকট্রন একে ওপরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে নাকি একটি কণার কিছু অংশ বাকি থেকে যাবে সেটা জানতে অনেক হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে। ধ্বংস হওয়ার ঘটনা হুট করে ঘটে না। বরং একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন প্রথমে নিজেদেরকে পজিট্রোনিয়াম নামে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুতে সজ্জিত করে। এখানে দুজনেই তাদের যৌথ ভরকেন্দ্রকে[৬] প্রদক্ষিণ করে। নিজেদের মধ্যকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের প্রভাবে নাচতে নাচতে বেজে যায় মৃত্যুঘণ্টা। এভাবে কণাগুলো সর্পিল পথ বেয়ে একসময় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। সর্পিল পথে কণাগুলো কত সময় থাকবে তা পজিট্রোনিয়াম 'পরমাণুটি' তৈরি হবার সময় ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মধ্যে প্রাথমিক যে দূরত্ব ছিল তার ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে পজিট্রনিয়াম ক্ষয় হতে এক সেকেন্ডের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ সময় ব্যয় হয়। কিন্তু বাইরের মহাশূন্যে কণাগুলোকে নিয়ে নাক গলানোর মতো তেমন কেউ নেই। ফলে এদের কক্ষপথ হতে পারে অনেক বিশাল। পরিমাপ করে দেখা গেছে, ইলেকট্রন ও পজিট্রন থেকে পজিট্রোনিয়াম তৈরি হতে $১০^{৭১}$ বছর সময় লাগে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের কক্ষপথ বহু ট্রিলিয়ন আলোকবর্ষ চওড়া হয়। কণাগুলো এতটা ধীরে চলবে যে এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগবে বহু মিলিয়ন বছর। ইলেকট্রন ও পজিট্রন এতটাই ধীরগতির হয়ে যাবে যে সর্পিল পথে চলতে $১০^{১১৬}$ বছরের মতো দীর্ঘ সময় লাগবে। তবুও এই পজিট্রোনিয়ামের চূড়ান্ত নিয়তি কিন্তু এটি তৈরি হওয়ার সময়ই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব ইলেকট্রন ও পজিট্রনকে কিন্তু ধ্বংস হতে হয় না। যে সময় ধরে ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা তাদের বিপরীত চিহ্ন খুঁজতে থাকে সে সময়েই তাদের ঘনত্ব নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে। এর পেছনে দুটো কারণ কাজ করে। একটি হলো ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়াটিই। আর আরেকটি হলো মহাবিশ্বের চিরন্তন প্রসারণ। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন পজিট্রোনিয়াম তৈরি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অবশিষ্ট পদার্থের সামান্য ধ্বংসাবশেষ কমতে থাকলে এটি কখনোই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। সবসময়ই কোথাও না কোথাও ইলেকট্রন বা পজিট্রনের বেজোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে। যদিও এমন প্রতিটি কণাই ক্রমাগত বড় হয়ে ওঠা শূন্য স্থানের মধ্যে একা একা অবস্থান করে।

ধীরগতির এতসব মারাত্মক প্রক্রিয়াগুলো শেষে মহাবিশ্ব কেমন হতে পারে তার একটি মোটামুটি চিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমত থাকবে বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। সবসময় উপস্থিত থাকা মহাজাগতিক পটভূমি। এতে রয়েছে ফোটন ও নিউট্রিনো। আবার আমাদের এখনও অচেনা পুরোপুরি স্থিতিশীল কোনো কণাও থাকতে পারে। মহাবিশ্বের

প্রসারণের সাথে সাথে এই কণাগুলোর শক্তি কমতে থাকবে। যতক্ষণ না এদের পটভূমি খুব হালকা হয়ে যায়। মহাবিশ্বের সাধারণ পদার্থগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। সবগুলো ব্ল্যাকহোলও শেষ হয়ে যাবে। ব্ল্যাকহোলের বেশিরভাগ ভর ফোটনে পরিণত হবে। আর কিছু অংশ থাকবে নিউট্রিনো আকারে। আর খুবই সামান্য একটি অংশ থাকবে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও আরও ভারী কণা রূপে। এগুলো নির্গত হয়েছিল ব্ল্যাক হোলের একেবারে অন্তিম বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ভারী কণাগুলোর সবাই খুব দ্রুত ক্ষয় হয়। আর নিউট্রন ও প্রোটন ক্ষয় হয় আরও ধীরে। ফলে এদের সাথে যোগ দেয় কিছু ইলেকট্রন ও পজিট্রন কণারা। আমরা আজকে যে সাধারণ পদার্থ দেখছি এই কণাগুলোই হলো তার সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন।

তার মানে দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব হবে ফোটন, নিউট্রিনো এবং ক্রমাগত কমতে থাকা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের একটি অচিন্তনীয় ধরনের হালকা স্যুপের মতো। এই কণাগুলোর সবাই ধীরে ধীরে আরও দূরে সরতে থাকবে। এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি, এর পরে আর কোনো ভৌত পক্রিয়া সংঘটিত হবে না। এমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটবে না যাতে মহাবিশ্বের বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটতে পারে। যাত্রাপথের শেষে এসেও মহাবিশ্ব যেন পেল চিরন্তন জীবন। অথবা চিরন্তন মৃত্যু বললেই হয়ত সঠিক বলা হবে।

ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিদ্যায় তাপীয় মৃত্যু (h e a t d e a t h) নামে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। আমাদের আলোচনায় আসা শীতল, অন্ধকার, বৈশিষ্ট্যহীন প্রায় শূন্য এই নিরস চিত্রই আধুনিক কসমোলজির তাপীয় মৃত্যুর সবচেয়ে কাছাকাছি বিবরণ। মহাবিশ্ব এই অবস্থায় আসতে এত বেশি সময় লাগবে যে এটা কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও এটি অসীম সময়ের অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র। আগেই বলেছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়।

এটা সত্যি যে মহাবিশ্বের ক্ষয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে যে সময়ের প্রয়োজন সেটি মানবীয় সময়ের মাপকাঠিতে অনেক অনেক বেশি। এতই বেশি যে সে সময়টা আসলে আমাদের কাছে অর্থহীন। তবুও আমরা আগ্রহভরে প্রশ্ন করি, “আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্যে কী ঘটবে? তারা কি অনিবার্যভাবে এমন এক মহাবিশ্বে বন্দি হবে যা খুব ধীরে হলেও অপ্রতিরোধ্যভাবে তাদের চারপাশে অচল হয়ে যাবে? দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানের পূর্বাভাস খুব বেশি প্রতিশ্রুতিশীল নয়। ফলে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের জীবনের জন্যেই অনুকূল কোনো পরিবেশ থাকবে না। তবে মৃত্যু অত সহজও নয়।

অনুবাদকের নোট

১। এক ট্রিলিয়ন = এক লক্ষ কোটি। মানে ১ এর পর ১২টি শূন্য দিতে হবে। অর্থাৎ, ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

২। যে ঘটনার ফলাফল আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না তাকে দৈব বা র‍্যান্ডম ঘটনা বলে।

৩। পরম শূন্য তাপমাত্রা: ০ কেলভিন বা মাইনাস ২৭৩.১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়। তাত্ত্বিকভাবে এটাই মহাবিশ্বের সম্ভাব্য নূন্যতম তাপমাত্রা।

৪। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ৩ লক্ষ কিলোমিটার হলেও পানিতে এই বেগ অনেকটা কম। পানির ঘনত্বের ওপর এটা নির্ভর করলেও বেগটা মোটামুটি সেকেন্ডে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার। কিন্তু ইলেকট্রন ও পজিট্রনরা পানিতেও শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে চলে।

৫। এই বইটির আলোচ্য অংশ অনুবাদের সময়ও (ফেব্রুয়ারি, ২০২০) প্রোটন ক্ষয়ের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৬। কোনো একটি সিস্টেমের সবগুলো অংশের গড় অবস্থানকে ভরকেন্দ্র বলে। যেমন, বৃত্তের ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রই ভরকেন্দ্র। একই কথা প্রযোজ্য গোলকের ক্ষেত্রেও। আমরা অনেক সময় বলি, বাইনারি স্টার বা জোড়াতারারা একে ওপরকে কেন্দ্র

করে ঘোরে। আসলে কিন্তু তারা দুজনের যৌথ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে পাক খায়। সেই ভরকেন্দ্র সাধারণত দুটো তারার মাঝামাঝি কোনো স্থান হয়। আবার আমরা জানি, পৃথিবী,ও বৃহিস্পতির মতো গ্রহরা সূর্যকজে ঘিরে পাক খায়। তবে বাস্তবতা হলো বৃহস্পতি আসলে ঠিক সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। ঘোরে সূর্যের পরিধির বাইরের একটি বিন্দুকে ঘিরে।

অষ্টম অধ্যায়

ধীর গতির জীবন

১৯৭২ সালে *ক্লাব অব রোম* নামে একটি সংগঠন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে *দ্য লিমিটস টু গ্রোথ* একটি নেতিবাচক পূর্বাভাস প্রকাশ করে। তারা আসন্ন বিভিন্ন দূর্যোগ বিষয়ক অনেকগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে এতে। এর মধ্য অন্যতম ছিল জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক। তাদের মতে, অল্প কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর সব জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। মানুষ ভয় পেল। তেলের দাম গেল বেড়ে। বিকল্প জ্বালানি নিয়ে গবেষণা গতি পেল। এখন আমরা ১৯৯০ এর দশকে আছি।[১] কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্মণ এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ফলে ভয়ের বদলে এখন সবার মনে রয়েছে পরিতৃপ্তি। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সরল গাণিতিক হিসাব বলছে, সম্পদের সসীম পরিমাণ চিরকাল যাবত নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি আমাদেরকে হতেই হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পর্কেও একই কথা খাটে। অনির্দিষ্ট সময় ধরে এটা অব্যাহত থাকতে পারে না।

জেরেমিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছু কিছু মানুষ মনে করে, আসন্ন জ্বালানি সঙ্কট ও অতিজনসংখ্যার ফলে মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলেই মানুষেরও অবসান ঘটে যাবে এটা বলা যাবে না। আমাদের চারপাশে জ্বালানির বিপুল উৎস রয়েছে। অবশ্য সেটা কাজে লাগানোর মতো বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আমাদের যতটুকু শক্তি দরকার সূর্যের আলোতে তার চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যাও আছে। হয়ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি আমরা কমানোর আগেই খাদ্যাভাবে সেটা এমনিতেই কমে যাবে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল বেশি প্রয়োজন। তবে আমার বিশ্বাস, জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে শক্তির যে ঘাটতি তৈরি হবে সেটার সমাধান করা গেলে এবং আমাদের গ্রহের বাস্তুগুত ও গ্রহাণুর আঘাতজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনা গেলে মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানবজাতির ভবিষ্যতকে সীমিত করার মতো স্পষ্ট কোনো নিয়ম প্রকৃতিতে চোখে পড়ছে না।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বলেছি কীভাবে অসম্ভব দীর্ঘ সময় পরে মহাবিশ্বের কাঠামো বদলে যাবে। সাধারণত এর মাধ্যমে ধীরগতির ভৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে মহাবিশ্ব নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো হারাবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আছে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর হলো (এটা নির্ভর করে মানুষের সংজ্ঞার ওপর)। আর সভ্যতার সূচনা কয়েক হাজার বছর আগে। এখন থেকে আরও দুই বা তিন শ কোটি বছর পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে। তবে জনসংখ্যা অবশ্যই কমে যাবে। সময়টা এত দীর্ঘ যে সেটা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একে এতই বড় মনে হয় যে সেটাকে বাস্তবে অসীম সময় বলে মনে হয়। তবুও আমরা দেখেছি, মহাবিশ্বের বিবর্তনের জন্যে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় সে তুলনায় এক শ কোটি বছরও খুব নস্যি। আরও বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরেও আমাদের ছায়াপথের অন্য কোথাও পৃথিবীর মতো আবাস থাকতেই পারে।

আমরা কল্পনা করতেই পারি আমাদের বংশধররা এত সময় হাতে পেয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াবে। বানাবে সব ধরনের বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি। সূর্য পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলার আগে আগে পালানোর যথেষ্ট সময় তারা পাবে। খুঁজে নিতে পারবে অন্য এক গ্রহ। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লে জনসংখ্যাও বাড়বে। এটা জেনে কি আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে বিংশ শতকে আমাদের টিকে থাকার লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ নাও হতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি, বার্ট্রান্ড রাসেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ফলাফল নিয়ে হতাশাচ্ছান্ন ছিলেন। যন্ত্রণাভরে তিনি লিখেছিলেন, যেহেতু সৌরগজগৎ এক সময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই মানুষের অস্তিত্বও একসময় নিষ্ফল হবে। রাসেল স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, আমাদের বাসস্থানের স্পষ্ট অনিবার্য মৃত্যু কোনোভাবে মানবজীবনকে অর্থহীন কিংবা প্রহসনে পরিণত করেছে। এটা নিশ্চিত এই বিশ্বাস তাকে নাস্তিক বানানোর পথে অবদান রেখেছে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় শক্তি সূর্যের বহুগুণ বেশি এবং সৌরজগৎ তছনছ হয়ে যাওয়ারও লক্ষ লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে জানলে কি তিনি আরেকটু ভাল অনুভব করতেন? আসলে সময়টা কত দীর্ঘ সেটা মূখ্য নয়। মূল বিষয় হলো, আজ হোক, কাল হোক, মহাবিশ্ব এক সময় বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। হয়ত আমরা ধরে নিতে পারি, আরও কম পরিবর্তনযোগ্য ও বেশি বৈরি পরিবেশ তৈরি হবে না বললেই চলে। তবে আমাদের ভাবনাই যে সঠিক সেটা ধরে নেওয়া যাবে না। আবার হতাশও হওয়া যাবে না। ইলেকট্রন ও পজিট্রন দিয়ে গড়া এক পাতলা স্যুপের মতো মহাবিশ্বে বাস করা মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। তবে আমাদের কথা সেখানে নয়। অবশ্যই মানব প্রজাতি অমর কি না আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের বংশধররা টিকে থাকতে পারবে কি না সেটা বলছি। আর আমাদের বংশধররা যে মানুষই হবে তার সম্ভবনাও কম।

জীবের বিবর্তনের[২] মাধ্যমে পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া খবু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করে ফেলেছি। মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করা দিন দিন সহজ হয়ে যাচ্ছে। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যেম খুব দ্রুতই হয়ত আমরা ইচ্ছেমতো গুণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যেসম্পন্ন মানুষ বানাতে পারব। জৈবপ্রযুক্তির এই সম্ভাবনাগুলো মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। একবার ভাবুন, হাজার হাজার বা লক্ষ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার মাধ্যমে কী সম্ভব হতে পারে।

মাত্র কয়েক দশকেই মানুষ গ্রহ থেকে বের হয়ে নিকট মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগতের আরও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর যাবে ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রে। অনেক সময় মানুষ ভুল করে মনে করে, এ কাজ করতে অসীম সময় লাগবে। আসলে তা নয়। বসতি গড়ার প্রক্রিয়াটি হয়ত হবে বারবার গ্রহান্তরের মাধ্যমে। বসতিস্থাপনকারীরা পৃথিবী ছেড়ে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোনো উপযুক্ত গ্রহে ঠাঁই নেবে। আলোর কাছাকাছি বেগে চলতে পারলে তাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক বছর। আমাদের বংশধররা আলোর এক ভাগের মতো যথেষ্ট গতি অর্জন করতে না পারলেও ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র কয়েক শ বছর। নতুন একটি বসতি পুরোপুরি গড়ে তুলতে হয়ত আরও কয়েক শ বছর লাগবে। ততক্ষণে নতুন কোনো গ্রহের সন্ধানে এক দল অভিযাত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা যাবে। আরও কয়েক শ বছর পরে সেই গ্রহেও বসতি গড়ে ওঠবে। এভাবেই চলতে থাকবে। পলিনেশীয়রা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে এভাবেই বসতি নির্মাণ করেছিল।

ছায়াপথকে অতিক্রম করতে আলোর এক লক্ষ বছর সময় লাগে। আলোর বেগের এক ভাগ বেগে চললে তাতে সময় লাগবে এক কোটি বছর। এই যাত্রাপথে এক লক্ষ গ্রহে বসতিস্থাপন করা গেলে এবং প্রতিটির জন্যে দুই শ বছর লাগলে পুরো ছায়াপথে বসতি গাঁড়তে ছায়াপথ পার হবার সময়ের তিনগুণের বেশি সময় লাগবে না। তবে মহাকাশ বা ভূতাত্ত্বিক মাপকাঠির তুলনায় এক কোটি বছর খুব অল্প সময়। সূর্য পুরো ছায়াপথকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২০ কোটি বছর সময় নেয়। এর অন্তত ১৭ গুণ সময় ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। সূর্যের বার্ধ্যকের কারণে পৃথিবী বিপদে পড়তে মাত্র দুই না দিন শ কোটি বছর লাগবে। ফলে আরও তিন কোটি বছরে খুব অল্প পরিবর্তনই ঘটবে। তার মানে বলতে চাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে প্রযুক্তিগত সভ্যতা গড়ে উঠতে যতটুকু সময় লেগেছে, পুরো ছায়াপথে বসতি গড়তে তার খুব সামান্য ভগ্নাংশের সমান সময় লাগবে।

বসতি গড়ে তোলা আমাদের এই বংশধররা কেমন হবে? কল্পনার ঘোড়াকে ইচ্ছেমতো ছুটতে দিলে আমরা ধারণা করতে পারি, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত গ্রহের পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে। একটি সরল উদাহরণ চিন্তা করি। ধরা যাক, এপসাইলন এরিডানি নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ পাওয়া গেল। দেখা গেল, এর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে মাত্র ১০%। তাহলে অধিবাসীদের দেহকে পরিবর্তন করে লোহিত রক্তকণিকা বাড়াতে হবে। গ্রহটির পৃষ্ঠের মহাকর্ষ বেশি হলে অধিবাসীদের দেহকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। হাড়কেও শক্ত করতে হবে। এভাবেই সবকিছু বদলে নিতে হবে।

এই ভ্রমণের জন্যে যা যা লাগবে তাতে সমস্যাও হওয়ার কথা নয়। যদি তাতে কয়েক শ বছর লাগে তবুও নয়। মহাকাশযানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বানানো যেতে পারে। যা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অভিযাত্রীদেরকে কয়েক প্রজন্ম ধরে আবাসন দিতে সক্ষম হবে। আবার অভিযাত্রীদেরকে ভ্রমণের সময় তীব্র ঠাণ্ডা পরিবেশে জমিয়ে রাখা যেতে পারে।[৩] সত্যি বলতে, ছোট একটি যানে অল্প কিছুসংখ্যক কর্মীসহ লক্ষ লক্ষ হিমায়িত নিষিক্ত কোষ পাঠানোই বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সেগুলো থেকে জন্ম নেবে মানুষ। এতে করে নতুন গ্রহে তাৎক্ষণিকভাবে এক দল অধিবাসী পাওয়া যাবে। বিপুল পরিমাণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবহনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে না।

আরেকটি বিষয়: আমাদেরকে ধরে নিতে হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে বসতি গাঁড়া মানুষগুলো যে চেহারা-সুরত বা মানসিকতায় যে মানুষের মতোই হবে সেটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। যদি মানুষকে প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া নেওয়া যায়, তাহলে প্রতিটি অভিযানেই প্রস্তাবিত নকশা অনুসারে প্রাণী বানিয়ে নেওয়া যায়। যাতে থাকে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শরীর ও মনের সমন্বয়।

বসতিস্থাপনকারীদেরকে সাধারণ সংজ্ঞার জীবিত প্রাণীও হতে হবে না। এখনই মানুষের মধ্যে সিলিকন-চিপের মাইক্রোপ্রসেসর স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে জৈব ও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের মিশ্রণ হতেই পারে। যাতে করে শারীরবৃত্তিক কাজের পাশপাশি মস্তিষ্কও ঠিকভাবে কাজ করবে। যেমন ধরুন, মানুষের মস্তিষ্কের জন্যে বোল্ট-অন স্মৃতি তৈরি করা যেতে পারে। অনেকটা কম্পিউটারের যেভাবে অতিরিক্ত মেমোরি লাগানো হয়। উল্টোভাবে আবার এমনও হতে পারে যে জৈব পদার্থর জন্যে যন্ত্রাংশ তৈরির চেয়ে হিসাব-নিকাশ করার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া বেশি কার্যকরী হবে। তার মানে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে জৈব উপায়ে বিকশিত করা যাবে। ডিজিটাল কম্পিউটারের বদলে নিউরাল নেট চলে আসার সম্ভাবনা আরও বেশি। এমনকি এখনই ডিজিটাল কম্পিউটারের নিউরাল নেট ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করা হচ্ছে। পূর্বানুমান করা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আচরণ। মস্তিষ্কের টিস্যুর একটি অংশ নিয়ে তা দিয়ে শুরু থেকেই জৈব নিউরাল নেট বানানোটাই হয়ত আরও বেশি অর্থপূর্ণ হবে। জৈব ও কৃত্রিম নেতওয়ার্কের একটি বন্ধন তৈরি হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। ন্যানোপ্রযুক্তির আবির্ভাবের সাথে সাথে জীবিত ও মৃত, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের পার্থক্য ক্রমেই ছোট হয়ে আসবে।

বর্তমানে এসব অনুমান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই শুধু পাওয়া যায়। এগুলোকে বৈজ্ঞানিক বাস্তবে পরিণত হতে পারে? আর যাই হোক, আমরা কোনো কিছু অনুমান করতে পারি বলেই যে সেটা সত্যি হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন নীতি প্রয়োগ করেছি সেটা করতে পারি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও। যথেষ্ট বেশি সময় পাওয়া গেলে যা যা ঘটতে পারে তার সবই ঘটবে। যদি মানুষ বা তাদের বংশধররা যথেষ্ট উৎসাহী থাকে (এটা হয়ত অনেক যদি-কিন্তুর ব্যাপার), তাহলে পদার্থবিদ্যার সূত্র ছাড়া আর কিছুই প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য মানব জিনোম প্রকল্প কষ্টসাধ্য এক কাজ। কিন্তু শত শত, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ প্রজন্ম এই কাজ করতে থাকলে কাজটি হয়ে যাবে অনায়াসেই।

আশাবাদীই হওয়া যাক। ধরুন আমরা বেঁচে যাব। আর আমাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন সর্বোচ্চ শিখরে যেতে থাকবে। মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী হবে? ধরুন, উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বুদ্ধিমান জীব বানানো সম্ভব হলো। এর ফলে এখন যেসব বৈরি জায়গায় প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না সেখানেও সেটা করা যাবে। এই প্রাণীগুলো মনুষ্য-নির্মিত প্রযুক্তিরই ফসল হলেও এরা নিজেরা কিন্তু মানুষ হবে না।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কি চিন্তিত হওয়া উচিত? মানুষের বদলে এ ধরনের দানব চলে আসতে পারে ভাবলেই অনেকের মধ্যে বিরক্তি কাজ করে। টিকে থাকার জন্য জিনপ্রকৌশলের মাধ্যমে নির্মিত জৈব রোবটের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হলে হয়ত দেওয়াই উচিত। তবুও মানুষের অবসান যদি আমাদেরকে হতাশ করে, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত আমরা মানুষের ঠিক কোন জিনিসটি সংরক্ষণ করতে চাই। অবশ্যই আমাদের শারীরিক আকৃতি নয়। আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর পরে আমাদের বংশধরদের পায়ের আঙ্গুল নাও থাকতে পারে শুনলে কি আমাদের খারাপ লাগবে? বা পা ছোট হয়ে গেলে? কিংবা মাথা বা মস্তিষ্ক বড় হয়ে গেলে? আমাদের শারীরিক আকৃতি তো গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক পাল্টেছে। এখনও বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে।

আমার মনে হয়, কিছু একটা বলতে বললে বেশিরভাগ মানুষ মানবিক চেতনাকে গুরুত্ব দেবে। আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বতন্ত্র মানসিক গঠন ইত্যাদি। আমাদের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখার মতো। আমরা আমাদের বংশধরদের কাছে মানবিকতা রেখে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারলে শারীরিক আকৃতিতে কী এসে যায়? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা তো অর্জিত হচ্ছেই।

মহাশূন্যময় ঘুরে বেড়ানো মানুষের মতো প্রাণী তৈরি করা সম্ভব কি না সেটা বড়সড় অনুমান না করে বলার উপায় নেই। অন্য কিছু না হলেও এটা হতে পারে যে মানুষ এত বড় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাটুকু হারিয়ে ফেলবে। অথবা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত বা অন্য কোনো দূর্যোগের ফলে এই গ্রহটিকে ছেড়ে যাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়নের আগেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে। আবার এও হতে পারে, পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বাসযোগ্য বেশির ভাগ গ্রহই হয়ত ওরা দখল করে ফেলেছে (তবে অবশ্যই পৃথিবীকে দখল করতে পারেনি)। তবে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে প্রযুক্তির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করার কাজটি কি আমাদের কোনো বংশধর করবে নাকি কোনো ভিনগ্রহের প্রাণীরা করবে সেটা বলা যাচ্ছে না। আবার ধীরগতিতে মহাবিশ্বের বিনাশকে এমন উন্নত প্রজাতি কীভাবে মোকাবেলা করবে সে প্রশ্নও মাথায় আসা স্বাভাবিক।

সপ্তম অধ্যায়েই বলেছি, মহাবিশ্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বহু দূরের ভবিষ্যতের প্রযুক্তি কেমন হবে সেটা অনুমান করা অর্থহীন। এক লক্ষ কোটি বছর একটি প্রযুক্তিগত সমাজের কথা তো চিন্তা করাও কঠিন। মনে হতে

পারে, তারা যেকোনো কিছু অর্জন করতে পারবে। কিন্তু একটি প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তাকে পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলো মানতেই হবে। যেমন ধরুন, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সঠিক। কোনোকিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। ফলে লক্ষ কোটি বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলেও আলোর বেগের এই বাধা পার হওয়া সম্ভব হবে না। আরও গুরত্বপূর্ণ কথা হলো, ভাল কিছু করতে গেলেই কিছু না কিছু শক্তি ব্যয় হয়। ফলে মহাবিশ্বের মুক্ত শক্তির উৎস ক্রমেই খালি হয়ে যাচ্ছে। যা প্রযুক্তি সমাজের জন্য এক বিরাট সমস্যা। সে যত উন্নত সভ্যতাই হোক না কেন।

সর্বোচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান জীবের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রাকৃতিক নীতিগুলো প্রয়োগ করে আমরা যাচাই করতে পারি, মহাবিশ্বের ক্ষয়ের ফলে দূর ভবিষ্যতে প্রাণীদের টিকে থাকতে সত্যিকারের মৌলিক কোনোই সমস্যা হবে কি না। একটি জীবকে বুদ্ধিমান হতে হলে একে অন্তত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারতেই হবে। এর জন্যে মহাবিশ্বের ভৌত অবস্থাকে কেমন হতে হবে তা জানা দরকার।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শক্তি খরচ হয়। এ কারণেই যে ওয়ার্ড প্রসেসরে আমি এই বইটি টাইপ করছি সেটি প্রধান বৈদ্যতিক সরবরাহের সাথে যুক্ত আছে। প্রতি বিট তথ্যের জন্যে কী পরিমাণ শক্তি খরচ হবে সেটা নির্ভর করে তাপগতীয় প্রক্রিয়ার ওপর। প্রসেসরের পরিবেশের তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় কাজ করলে খরচ হয় সবচেয়ে কম। মানুষের মস্তিষ্ক ও বেশিরভাগ কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা খুবই কম। তাপ আকারে বেরিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণ বাড়তি শক্তি।

উদাহরণস্বরূপ, দেহের তাপের বড় একটি অংশ মস্তিষ্কই তৈরি করে। গলে যাওয়া থেকে বাঁচাতে অনেক কম্পিউটারেই শীতলীকরণ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই তাপ অপচয়ের মূল কারণ খুঁজলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কৌশলটাই পাওয়া যাবে। ঠিক এই কারণেই আবার তথ্য হারিয়েও যায়। যেমন ধরুন একটি কম্পিয়টার দিয়ে হিসাব করা হলো ১ +২ = ৩। তাহলে দুই বিট তথ্য (১ ও ২) সরিয়ে এক বিট তথ্য (৩) পাওয়া গেল। হিসাব শেষ হওয়ার পরে কম্পিউটার আগের তথ্য ফেলে দিতে পারে। ফলে দুই বিটের বদলে এক বিট তথ্য থাকল। সত্যি বলতে, কম্পিউটারের মেমোরির চাপ কমাতে এ ধরনের বাড়তি তথ্য সবসময়ই ফেলে দিতে হয়। সংজ্ঞানুসারেই মুছে ফেলার এই প্রক্রিয়া অফেরতযোগ্য। এর ফলে কিন্তু বেড়ে যায় এনট্রপি[৪]। ফলে বোঝা যাচ্ছে, একেবারে মৌলিক কারণে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কারণে অনিবার্য ও অফেরতযোগ্য উপায়ে বিদ্যমান শক্তি কমে যাচ্ছে। আর বাড়ছে মহাবিশ্বের এনট্রপি।

মহাবিশ্ব শীতল হতে হতে তাপীয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলে বুদ্ধিমান জীবরা কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হবে তা নিয়ে ফ্রিম্যান ডাইসন ভেবেছেন। শুধু চিন্তা করার জন্যেও এই জীবদেরকে একটি নির্দিষ্ট হারে শক্তি খরচ করতে হয়। প্রথম অসুবিধা হোল জীবদের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত তাপ তাদের শরীর থেকে বের হতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, একটি ভৌত ব্যবস্থা কী হারে পরিবেশে শক্তি বিকীর্ণ করবে তা পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে চলতে বাধ্য। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, জীবরা যে হারে অতিরিক্ত তাপ থেকে মুক্ত হবে তার চেয়ে বেশি হারে সে ধরনের তাপ শরীরে তৈরি হলে বেশি দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। ফলে কী হারে তাপ খরচ হবে তার একটি নিম্নসীমা নির্ধারিত আছেই। ফলে একটি অনিবার্য প্রয়োজন হলো, শক্তির মুক্ত একটি উৎস থাকতেই হবে। যাতে তাপের এই প্রবাহ অবিরাম চলতে পারে। ডাইসনের মতে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতে এ ধরনের সকল উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার মানে সকল বুদ্ধিমান জীবই একসময় শক্তির সঙ্কটের মুখে পড়বে।

এখন, বুদ্ধিমান জীবরা দুই উপায়ে আয়ু বাড়াতে পারে। একটি হলো, যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকা। আরেকটি হলো, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের হার বাড়ানো। ডাইসন এক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক অনুমান করেছেন। একটি জীবের জন্যে সময় অতিবাহিত হওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ঐ জীবের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের হারের ওপর নির্ভর করে। প্রক্রিয়া যত দ্রুত চলবে, একক সময়ে তত দ্রুত চিন্তা ও অনুভূতি সম্পন্ন হবে। সময়ও তত দ্রুত চলবে বলে মনে হবে। রবার্ট ফোরওয়ার্ডের *ড্রাগন'স এগ* সায়েন্স ফিকশনে এই অনুমান বেশ রসাত্মকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এক দল বুদ্ধিমান জীবের গল্প বলা হয়েছে। এরা বাস করে একটি নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বদলে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এরা তথ্য প্রসেস করে অনেক দ্রুত। মানুষ এক সেকেন্ডে যা করে, তারা সেই সময়ে বহু বছরের কাজ করে ফেলে। মানুষের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তারা বেশ আদিম ছিল। কিন্তু মিনিটের মধ্যে তারা পরিস্থিতি বুঝে ফেলে ও মানুষকে পরাজিত করে।

দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, দূর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার জন্যে এই কৌশল গ্রহণ করলে অসুবিধা আছে। তথ্য যত দ্রুত প্রসেস হবে, শক্তি খরচের হারও তত দ্রুত হবে। শক্তির যোগানও তত দ্রুত খালি হয়ে। হয়ত ভাবছেন, এর ফলে আমাদের বংশধররা তো তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে তাদের দৈহিক আকৃতি যাই হোক না কেন। কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। ডাইসন দেখিয়েছেন, একটি কৌশল করে দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা

যাবে। মহাবিশ্বের ক্ষয়ের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রাণীরা তাদের কর্মকাণ্ডের হার আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে। যেমন ধরুন, ক্রমেই বেশি সময়ের জন্যে তারা শীতনিদ্রায় অবস্থান করবে। প্রতিটি শীতনিদ্রার সময় আগের সক্রিয় মেয়াদের কাজের ফলে সৃষ্ট তাপ বেরিয়ে যাবে। আর জমা হবে প্রয়োজনীয় শক্তি। যা ব্যবহার করা যাবে পরের সক্রিয় মেয়াদে।

এই কৌশল গ্রহণ করা জীবদের অতিবাহিত সময় সত্যিকার সময়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ হতে থাকবে। কারণ এদের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ক্রমেই বড় হতে থাকবে। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরেই বলছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। ফলে বিপরীতমুখী দুটি স্রোতের মাঝে আমরা বাঁধা। সম্পদ ক্রমেই ফুরিয়ে যাবে। আর সময় ক্রমেই বেড়ে চলবে অসীমের দিকে। এই সীমাগুলোকে সরল উপায়ে পরীক্ষা করে ডাইসন দেখেছেন, মোট সম্পদের পরিমাণ সসীম হলেও মোট আপেক্ষিক সময় অসীম হতে পারে। তিনি অসাধারণ একটি তথ্য দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এত সংখ্যক জীব ৬×১০^{৩০} জুল শক্তি দিয়েই আক্ষরিক অর্থে অনন্তকাল বাঁচতে পারবে। সূর্য আট ঘণ্টা জ্বললেই এই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

তবে সত্যিকারের অমরত্ব পেতে হলে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করতে পারলেই চলবে না। একটি জীবের মস্তিষ্কের অবস্থার সংখ্যা সসীম হলে সে শুধু সসীম সংখ্যক আলাদা চিন্তা করতে পারবে। চিরকাল বেঁচে থাকতে হলে একই চিন্তাই অনেকবার করতে হবে। এ ধরনের বেঁচে থাকাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রজাতির মতোই অর্থহীন মনে হয়। এটা থেকে বাঁচতে চাইলে ঐ সম্প্রদায় বা মহাপ্রাণীটাকে ক্রমশ বড় হতে থাকতে হবে। অনেক দূরের ভবিষ্যতে এটা করতে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ হবে। কারণ বস্তুকে যে গতিতে মস্তিষ্কের অংশ বানানো যাবে তার চেয়ে বেশি গতিতে বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়িয়ে নিতে বেপরোয়া ও বিচক্ষণ কোনো জীব হয়ত সবসময় হাতের সামনে পড়ে থাকা দূর্লভ্য মহাজাগতিক নিউট্রিনো থেকে শক্তি আহরণ করবে।

ডাইসনের কথাবার্তার অনেকাংশ জুড়েই ভেতরে ভেতরে ধরে নেওয়া হয়েছে, এই সকল জীবদের মানসিক চিন্তার গতি ডিজিটাল কম্পিউটারের হিসাবের গতির সমান হয়ে যাবে। দূর ভবিষ্যতের জীবদের ভবিষ্যৎ নিয়ে করা বিভিন্ন অনুমানেও আসলে তাই ধরে নেওয়া হয়। ডিজিটাল কম্পিউটার অবশ্যই সসীম অবস্থাসম্পন্ন একটি মেশিন। ফলে এর কাজের সম্ভাব্য পরিধি সীমিত। তবে অ্যানালগ কম্পিউটার নামে অন্য ধরনের যন্ত্রও আছে। ডিজিটাল কম্পিউটারের কিছু সীমাবদ্ধতা অ্যানালগ কম্পিউটারে নেই। ডিজিটাল কম্পিউটার শুধু সসীম পরিমাণ তথ্য জমা ও প্রসেস করতে পারে। ধরুন, অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে তথ্য এনকোড করা হলো। ধরুন যে জড় বস্তুর কোণের অবস্থানের মাধ্যমে সেটা করা হলো। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ধারণক্ষমতাকে অসীম মনে হবে। ফলে, একটি মহাপ্রাণী অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে কাজ করতে পারলে এটি শুধু অসীমসংখ্যক চিন্তাই করতে পারবে না, হয়ত অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তাও করতে পারবে।

কিন্তু সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব অ্যানালগ নাকি ডিজিটাল কম্পিউটারের মতো সেটা আমরা জানি না। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলছে, মহাবিশ্ব নিজেও কোয়ান্টায়িত বা ছিন্নায়িত। মানে অংশে অংশে বিভক্ত। অর্থাৎ, এটি নিরবিচ্ছিন্ন তারতম্যের বদলে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন অংশে সবগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে এটি শুধুই একটি ধারণা। আমরা মানসিক ও জড় মস্তিষ্কের মধ্যকার সম্পর্কও সঠিকভাবে বুঝি না। আমরা তো এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ধারণা নিয়ে কথা বললাম। তার সাথে চিন্তা ও অভিজ্ঞতাগুলোর সম্পর্ক নাও তো থাকতে পারে।

তবে মন যেমনই হোক না কেন, দূর ভবিষ্যতের জীবরা যে শেষ পর্যন্ত জ্বালানির সঙ্কটে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাবিশ্বের সব শক্তি একদিন নিঃশেষ হবেই। তবুও এটাকে মোকাবেলা করে তারা এক ধরনের অমরত্ব লাভ করতে পারে। ডাইসনের তুলে ধরা চিত্রে জীবদের প্রয়োজনের প্রতি মহাবিশ্বের কোনো নজরই থাকবে না। তাদের কর্মকাণ্ডও মহাবিশ্বকে ক্রমাগত কম প্রভাবিত করতে থাকবে। অপরিসীম সময় ধরে জীবরা থাকবে নিষ্ক্রিয়। স্মৃতি থাকবে। কিন্তু স্মৃতিতে নতুন কিছু যুক্ত হবে না। মুমূর্ষু মহাবিশ্বের স্থির অন্ধকারে উঠবে না কোনো আলোড়ন। একটু বুদ্ধি খরচ করে ওরা হয়ত এখনও অসীমসংখ্যক চিন্তা করতে পারবে। অসীমসংখ্যক অভিজ্ঞতার সাধ নিতে পারবে। আর কী ই বা আশা করার আছে?

বর্তমান সময়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা অন্যতম ভুল ধারণা হলো মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যু। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আপাতদৃষ্টিতে মহাবিশ্ব এক সময় এর বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলবে। রাসেল ও আরও কেউ কেউ এই ধারণাকে ব্যবহার করে নাস্তিকতা, নাস্তিবাদ (n i h i l i s m) ও হতাশার দর্শন প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমাদের কসমোলজির জ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে। এখন আমরা একটু ভিন্ন চিত্র দেখছি। মহাবিশ্ব হয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর উপাদান শেষ হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগ ঘটছে। কিন্তু এর কারণে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটবে বলার উপায় নেই।

আসলে ডাইসন যেমন বলেছেন, বাস্তবে পরিস্থিতি এতটা খারাপ নাও হতে পারে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি, প্রসারিত ও শীতল হতে হতেও মহাবিশ্ব কম-বেশি সুষম (একই রকম) থাকে। কিন্তু এটা ভুলও হতে পারে। মহাকর্ষ বহু রকম অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। বর্তমানে বড় স্কেলে চিন্তা করলে আমরা মহাবিশ্বকে সুষম বা সব দিকে একইরকম দেখি। দূর ভবিষ্যতে হয়ত সেটি আরও জটিল কোনোদীকে মোড় নিতে পারে। যেমন ধরুন, আলাদা দিকে প্রসারণের হার সামান্য তারতম্যের ফল বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। বড় বড় ব্ল্যাকহোলরা নিজেদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মাধ্যমে মহাজাগতিক প্রসারণের প্রভাব উপেক্ষা করে একীভূত হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থার কারণে একটি দারুণ লড়াই বাঁধবে। মনে করে দেখুন, একটি ব্ল্যাকহোল যত ছোট হবে, এর তাপমাত্রা তত বেশি। এটি বাষ্পীভূতও হয়ে যায় তত তাড়াতাড়ি। দুটো ব্ল্যাকহোল মিলিত হলে সমন্বিত ব্ল্যাকহোলটি আকারে বড় হবে। তার মানে এর তাপমাত্রা হবে কম। ফলে এর বাষ্পীভবন বড় একটি সমস্যার মুখে পড়বে। তাহলে, দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে মূল প্রশ্ন হলো, ব্ল্যাকহোলদের একীভবন তাদের বষ্পীভবন ঠেকাতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে কি না। যদি পারে, তাহলে সবসময়ই কিছু ব্ল্যাকহোল হকিং বিকিরণের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবে। উন্নত প্রযুক্তির কোনো জাতি সেই জ্বালানি ব্যবহার করে হয়ত শীতনিদ্রার প্রয়োজন থেকে মুক্তি পাবে। পদার্থবিদ ডন পেইজ ও র‍্যান্ডাল ম্যাককির হিসাব অনুসারে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রভাব উনিশ-বিশ হবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কী হারে কমবে সেটার ওপর এই লড়াইয়ের ফলাফল খুব বেশি নির্ভর করছে। কোনো কোনো নমুনা অনুসারে ব্ল্যাকহোলদের একীভবনই জয়ী হয়ই।

ডাইসনের বিবরণে আরও একটি বিষয়ও মাথায় রাখা হয়নি। এমনও তো হতে পারে যে নিজেদের আয়ু বাড়ানো আমাদের বংশধররা মহাবিশ্বের বড় স্কেলের কাঠামো পাল্টে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। জ্যোতির্পদার্থবিদ জন ব্যারো ও ফ্র্যাংক টিপলার এমন কিছু উপায় নিয়ে ভেবেছেন। উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কোনো সম্প্রদায় হয়ত নিজেদের জন্যে অনুকূল কোনো মহাকর্ষীয় বিন্যাস তৈরি করতে নক্ষত্রের চলাচলে সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন ধরুন, নিউক্লীয় অস্ত্র ব্যবহার করে গ্রহাণুর কক্ষপথ পাল্টে ফেলা যাবে। এর মাধ্যমে এটি কোনো গ্রহের মহাকর্ষীয় শক্তি অর্জন করে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা লাগাতে পারবে। এই ধাক্কার ফলে ছায়াপথে সূর্যের কক্ষপথ সামান্য পাল্টে যাবে। এই প্রভাব ছোট। কিন্তু ধীরে ধীরে এর ফলাফল লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠবে। সূর্য যত দূরে সরবে, ততই দ্রুত দূরে সরতে থাকবে। বহু আলোকবর্ষের মতো দূরত্বে এই স্থানচ্যুতির ফলে সূর্য অন্য কোনো নক্ষত্রের কাছাকাছি চলে গেলে বড় ঘটনা দেখা যেতে পারে। হালকা একটি ধাক্কা থেকে হয়ত ছায়াপথে সূর্যের গতিপথে চলে আসবে আমূল পরিবর্তন। অনেকগুলো নক্ষত্রের গতিপথ পাল্টালে নানান রকমের মহাজাগতিক বস্তু তৈরি করা যাবে। ব্যবহার করা যাবে জাতির কল্যাণে। আর ফলাফল ক্রমেই বড় হয়ে যায় বলে এর মাধ্যমে এখানে-সেখানে এক-আধটু পরিবর্তন করে করে যেকোনো আকারে ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যথেষ দীর্ঘ সময় পেলে আমাদের বংশধররা নিজেদের জন্যে প্রচুর সময় হাতে পাবে। পুরো ছায়াপথও এভাবে দখলে আনা যেতে পারে।

বড় আকারের এই মহাজাগতিক কলাকৌশলগুলোকে প্রাকৃতিক ও দৈব ঘটনার সাথে লড়াই করতে হবে। সপ্তম অধ্যায়েই বলা হয়েছে, নক্ষত্র ও ছায়াপথরা মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ গুচ্ছ থেকে ছিটকে পড়তে থাকবে। ব্যারো ও টিপলার দেখেছেন, গ্রহাণুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি ছায়াপথকে পুনর্বিন্যাস করতে $১০^{২২}$ বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা $১০^{১৯}$ বছরের মধ্যেই ঘটে। তার মানে দেখা যাচ্ছে, লড়াইয়ের ফল চলে যাচ্ছে প্রকৃতির পক্ষে। অন্য দিকে, আমাদের বংশধররা হয়ত গ্রহাণুর চেয়ে বড় আকারের জিনিসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এছাড়াও এই প্রক্রিয়াগুলো বস্তুগুলোর কক্ষপথের বেগের ওপরও নির্ভর করে। আমরা পুরো ছায়াপথ নিয়ে ভাবলে দেখব, মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই বেগগুলো কমে আসে। ফলে এগুলোকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেও সময় বেশি লেগে যাবে। তবে দুটো প্রভাব একই হারে কমবে না। দেখে মনে হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার হার মহাবিশ্বকে পুনির্বিন্যাস করার হারের পেছনে পড়ে যাবে। এতে করে দারুণ একটি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ক্রমেই সম্পদ ফুরিয়ে যেতে থাকা মহাবিশ্বের ওপর বুদ্ধিমান জীবদের নিয়ন্ত্রণও ক্রমেই বাড়তে থাকবে। একটা সময় পুরো প্রকৃতি চলে আসবে প্রযুক্তির আওতায়। প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম জিনিসের মধ্যে পার্থক্যই আর থাকবে না।

ডাইসনের বিশ্লেষণের আরেকটি বড় অনুমান হলো, চিন্তা করতে গেলে শক্তি খরচ হবেই। মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি। কয়েকদিন আগ পর্যন্তও ধরে নেওয়া হত, যেকোনো রকম তথ্য প্রসেস করতে গেলেই একটি ন্যূনতম পরিমাণ তাপগতীয় মূল্য দিতেই হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটা সবসময় সত্য নয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানী চার্লস বেনেট ও রোলফ র‍্যানডৌর দেখিয়েছেন, নীতিগতভাবে প্রত্যাগামী (বিপরীত দিকেও কাজ করতে সক্ষম) হিসাবও সম্ভব। এর অর্থ হলো, কিছু কিছু ভৌত ব্যবস্থা অপচয় ছাড়াও তথ্য প্রসেস করতে পারে (বিষয়টি এখনও বাস্তবে করা সম্ভব হয়নি)। এমন একটি সিস্টেমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেটি কোনো ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই অসীমসংখ্যক চিন্তা সম্পন্ন করতে পারবে। এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে এ ধরনের একটি সিস্টেম কি একই সাথে তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেস করতে পারবে কি না। কারণ পরিবেশ থেকে কোনো অশূন্য তথ্য নিতে গেলে কোনো না কোনো ভাবে শক্তি অপচয় হতে দেখা যায়ই। কারণ গোলমেলে শব্দ থেকে বের করে নিতে হয় সঠিক সঙ্কেত। ফলে বাইরের জগত সম্পর্কে এই সরল জীবের কোনো ধারণা থাকবে না। তবে অতীতের মহাবিশ্বের কথা তাদের মনে থাকবে। সেই জীব আবার স্বপ্নও দেখতে পারবে হয়ত।

এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মৃত্যু প্রক্রিয়া নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন। এনট্রপির মাধ্যমে সৃষ্ট অপচয়ের মাধ্যমে

আমাদের বাসস্থান মহাবিশ্ব যে নির্দিষ্ট হারে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটি বিজ্ঞান মহলের একটি সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস কতটা প্রতিষ্ঠিত? আমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারি সব ভৌত প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ের জন্ম দেয়?

জীববিদ্যা কী বলে? যে জোরালোভাবে কিছু জীববিজ্ঞানী ডারউইনীয় বিবর্তনকে সমর্থন করেন সেখান থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ভৌত বলের মাধ্যমে পরিচালিত যে প্রক্রিয়াটি মৌলিকভাবে সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসাত্মক হওয়ার কথা সেটি গঠনমূলক হওয়ার কারণে অস্বস্তিবোধ করার কারণেই তারা এই মতে বিশ্বাসী হয়েছেন। সম্ভবত পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা ঘটেছে আদিম আঠালো কাদা থেকে। বর্তমান প্রাণীজগৎ বিশাল ও জটিল বাস্তুসংস্থানের অংশ। একটি জটিল ও অত্যন্ত বৈচিত্র্যে ভরপুর এক বিশাল জালে অণুজীবরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য বিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষের যেকোনো প্রমাণকে অস্বীকার করেন। হয়ত সেটা করেন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে। তবে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ সবাই ভাল করেই জানেন, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে কম-বেশি একই দিক বরাবর কিছু একটার উন্নতি ঘটেছে। সেই উন্নতিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাই হলো সমস্যার কাজ। ঠিক কোন জিনিসটি উন্নত হয়েছে।

টিকে থাকা সম্পর্কিত এতক্ষণের আলোচনায় তথ্য (বা শৃঙ্খলা) ও এনট্রপির মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, এনট্রপিই সবসময় জয়ী হয়। কিন্তু তথ্যই কি সেই জিনিস যেটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত? আর যাই হোক, সম্ভাব্য সবরকম চিন্তা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করা ফোনবুক পড়ার মতোই রোমাঞ্চকর কাজ। অভিজ্ঞতার মানই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরও সার্বিকভাবে বললে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত তথ্যের মান।

আমরা যত দূর জানি, কম-বেশি বৈশিষ্ট্যহীন অবস্থায় মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এসেছে সমৃদ্ধি ও ভৌত ব্যবস্থার বৈচিত্র্য। তার মানে মহাবিশ্বের ইতিহাস আসলে সংগঠিত জটিলতা তৈরির ইতিহাস। শুনে একে প্যারাডক্স মনে হয়। আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের মৃত্যু হচ্ছে। এটি প্রাথমিক সময়ের নিম্ন এনট্রপির অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ এনট্রপির চূড়ান্ত অবস্থার দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু হচ্ছে সম্ভাবনাগুলোর। তাহলে পরিস্থিতি ভাল হচ্ছে নাকি খারাপ হচ্ছে?

আসলে কিন্তু কোনো প্যারাডক্স নেই। কারণ সংগঠিত জটিলতা এনট্রপি থেকে ভিন্ন জিনিস। এনট্রপি না বিশৃঙ্খলা হলো ঋণাত্মক তথ্য বা শৃঙ্খলা। আপনি যত বেশি তথ্য ব্যবহার করবেন, মানে যত বেশি বিন্যাস তৈরি করবেন, তত বেশি এনট্রপি তৈরি হয়ে যাবে। এক জায়গার শৃঙ্খলা অন্য জায়গার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় সূত্রটা এমনই। এনট্রপি সবসময় জয়ী হয়। তবে সংগঠিত হওয়া ও জটিলতা বলতে সবসময় বিন্যাস আর তথ্যকেই বোঝায় না। এগুলো হলো নির্দিষ্ট ধরনের বিন্যাস ও তথ্য। যেমন ধরুন, একটি ব্যাকটেরিয়া ও একটি স্ফটিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। দুটোই বিন্যস্ত থাকে। তবে বিন্যস্ত থাকে ভিন্ন উপায়ে। একটি স্ফটিকের জাফরিতে থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষমতা। দারুণ সুন্দর হলেও কিন্তু ঠিকই বিরক্তিকর। অন্য দিকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত একটি ব্যাকটেরিয়া দারুণ আকর্ষণীয়।

মনে হবে এই বিষয়গুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হবে। তবে গণিতের মাধ্যমে এগুলোকে শক্ত ভিত্তি দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণার নতুন একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে। সংগঠিত জটিলতার মতো ধারণাগুলোকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। এটি সংগঠিত হওয়ার সাধারণ নীতিমালাও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেগুলোকে স্থান করে দিতে চায় পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়মের পাশে। এই শাখাটি এখনও একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আছে। কিন্তু বিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রথাগত অনেক অনুমানকেই এটি হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।

আমার *দ্য কসমিক জ্যাকপট* বইয়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বে হয়ত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পাশাপাশি এক ধরনের "জটিলতার বর্ধনশীল সূত্র"কাজ করছে। এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাস্তবে একটি ভৌত ব্যবস্থার গঠনগত জটিলতা বাড়লে এনট্রপি বাড়ে। যেমন, জীবের বিবর্তনের ফলে নতুন ও আরও বেশি জটিল প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। তবে তার আগে কিন্তু সংঘটিত হয় ধ্বংসাত্মক ভৌত ও জীববৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যেমন সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে না পারা মিউট্যান্টদের[৫] অকাল মৃত্যু)। এমনকি তুষারফলক তৈরির সময়ও অপ্রয়োজনীয় তাপ তৈরি হয়। আর এভাবেই বেড়ে চলে মহাবিশ্বের এনট্রপি। তবে আগেই ব্যাখ্যা করেছি, সবসময় যে কোনো কিছু সংগঠিত হলেই এনট্রপি বাড়বে তা নয়। কারণ সংগঠিত হওয়া এনট্রপির বিপরীত নয়।

আমি অত্যন্ত খুশি যে আরও অনেক গবেষক একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। জটিলতার "দ্বিতীয় সূত্র"কে প্রতিষ্ঠিত করার একটি চেষ্টাও চলছে। এর

সাথে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের কোনো বিরোধ নেই। তবে জটিলতার সূত্রটি মহাজাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলছে। এটি বলছে, মূলত বৈশিষ্ট্যহীন অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে আরও বিস্তারিত জটিল অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে (এক অর্থে আগে উল্লিখিত গবেষণা অনুসারে সেটি আরও সুকঠিন হবে)।

মহাবিশ্বের শেষ অবস্থার কথা চিন্তা করলে জটিলতার বৃদ্ধি বিষয়ক সূত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। সংগঠিত জটিলতা এনট্রপির বিপরীত না হলে ঋণাত্মক এনট্রপির স্বল্পতার কারণে জটিলতার সীমা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। জটিলতা বাড়লে যে এনট্রপি বাড়ে, সেটা হয়ত নিতান্তই ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। এটা হয়ত বিন্যাস্ত হওয়া বা তথ্য প্রসেস করার ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন মৌলিক কোনো নিয়ম নয়। এটা সত্য হয়ে থাকলে আমাদের বংশধররা হয়ত ফুরিয়ে আসতে থাকা সম্পদের অপচয় ছাড়াই আরও বেশি সংগঠিত জটিল অবস্থা অর্জন করতে পারবে। হয়ত তারা তাদের ইচ্ছেমতো তথ্য প্রসেস করতে পারবে না। কিন্তু তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের সক্ষমতার সমৃদ্ধির অর্জনে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।

এই অধ্যায় ও সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি মহাবিশ্বের গতি ধীর হয়ে যাওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে গতি ধীর হয়ে গেলেও হয়ত কখনোই গতি থামবে না। আরও বলেছি সায়েন্স ফিকশনের অদ্ভুত প্রাণীদের সামান্য উপকরণ দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার গল্প। যেখানে চিরকাল তাদেরকে মুখোমুখি হতে হয় প্রতিকূলতার। তাপগতিবিদ্যার নির্মম দ্বিতীয় সূত্র বিরুদ্ধে তাদেরকে নিজেদের মস্তিষ্কের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। টিকে থাকার জন্য তাদেরকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। সে প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবেই এমনটি বলার জো নেই। তাদের এ অবস্থার কথা ভেবে কোনো কোনো পাঠক হয়ত আনন্দ পাচ্ছেন। কেউবা আবার বিষণ্ণও হচ্ছেন। আমার নিজের প্রতিক্রিয়াটা মিশ্র।

তবে সবকিছুই অনুমান করা হয়েছে এটা ধরে নিয়ে যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। আমরা দেখেছি, এটা আসলে নিছকই মহাবিশ্বের অনেকগুলো সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে একটি। প্রসারণ যথেষ্ট দ্রুত হারে কমে গেলে একদিন হয়ত বন্ধই হয়ে যাবে। শুরু হতে পারে সঙ্কোচন। আর ঘটবে এক মহাসঙ্কোচন। সেক্ষেত্রে আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কেমন?

অনুবাদকের নোট

১। বইটি ১৯৯০ এর দশকে লেখা হয়েছিল। তবে আলোচ্য বক্তব্য এখনও সত্য।

২। বিবর্তন নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে পরিশিষ্ট অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। অনেকটা সাপ বা ব্যাঙয়ের শীতনিদ্রার মতো। এতে করে বেঁচে থাকার জন্যে নিয়মিত খাবার গ্রহণের পয়োজন হয় না। সঞ্চিত চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও বিপাকের হার কমে যায়।

৪। পদার্থবিদ্যায় এনট্রপি বলতে বোঝায় শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা। অন্য অর্থে এলোমেলো অবস্থার একটি পরিমাপ। যেমন কোনো তাকে অনেক বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে বলা যাবে গুছিয়ে রাখা কোনো তাকের চেয়ে এর এনট্রপি বেশি। এলোমেলো বইগুলো গোছানো হলে তাকে এনট্রপি কমবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের এনট্রপি কখনও কমে না। কারণ, ঐ রুম গোছাতে গেলে মানুষ বা যন্ত্র যে কাজ করবে তাতে সামগ্রিকভাবে এনট্রপি বাড়বেই। ফলে কিছু শক্তি অপচয় হবেই। কিছু শক্তি অরূপান্তরযোগ্য হয়ে যাবেই। আর ইনফরমেশন থিওরিতে এনট্রপি বলতে বোঝায় একটি ঘটনাকে প্রকাশ করতে গড়ে যে পরিমাণ বিট তথ্য প্রয়োজন। তবু দুটো আসলেই একই ধারণার ভিন্ন প্রকাশ।

৫। ডিএনএ এর জিনোম সিকুয়েন্স পাল্টে যাওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জীবকে মিউট্যান্ট বলে।

নবম অধ্যায়

দ্রুত গতির জীবন

চিরকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ বা এলিয়েনদের সৃজনশীলতা কখনোই যথেষ্টা হবে না, যদি না "চিরকাল" বলে কিছু একটা থাকে। মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট পর্যন্তই যদি টিকে থাকে, তাহলে তো অ্যারমাগেডন এড়ানোর কোনো উপায় নেই। ষষ্ঠ অধায়্যে আমি দেখিয়েছি, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কীভাবে এর মোট ভরের ওপর নির্ভর করে। মহাবিশ্ব হয় চিরকাল প্রসারিত হবে। অথবা একসময় আবার গুটিয়ে যেতে থাকবে। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্বের ভর এই দুই সঙ্কট সীমারই খুব কাছাকাছি। একসময় মহাবিশ্ব আবার গুটিয়েই যেতে শুরু করলে আগের অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধিমান জীবের যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি সেটা একদম ভিন্ন রকম হয়ে যাবে।

মহাজাগতিক সঙ্কোচনের প্রাথমিক অবস্থায় ভয়ের তেমন কিছুই নেই। একটি বল যেমন এর গতিপথের চূড়ায় ওঠে, তেমনি মহাবিশ্বও খুব ধীরে ভেতরের দিকে পতন শুরু করবে। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি, মহাবিশ্ব দশ হাজার কোটি বছর পরে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছবে। তখনও প্রচুর নক্ষত্র জ্বলতে থাকবে। অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে আমাদের বংশধররা তখনও ছায়াপথের গতিপথ দেখতে পারবে। দেখা যাবে, ছায়াপথগুচ্ছরা ক্রমশ ধীরে দূরে সরছে। একসময় দূরে সরা বন্ধ করে আবার একে অপরের দিকে আসতে থাকবে। আমাদের বর্তমানে দেখা ছায়াপথগুলো সে সময় আরও চারগুণ দূরে থাকবে। মহাবিশ্বের বয়স বাড়ার কারণে সে সময়ের জ্যোতির্বিদরা আমদের চেয়ে দশগুণ বেশি দূরের জিনিস দেখতে পারবে[১]।ফলে আমাদের চেয়ে তাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে।

পুরো মহাবিশ্ব পাড়ি দিতে আলোর বহু বিলিয়ন বছর সময় লেগে যায়। ফলে এখন থেকে ১০০ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) বছর পরের জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের সঙ্কোচন দেখার জন্যে খুব বেশি সময় পাবেন না। প্রথমে তারা দেখবেন, অপেক্ষাকৃত কাছের ছায়াপথরা গড়ের ওপর দূরে না সরে কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু দূরের ছায়াপথের আলো তখনও লোহিত সরণ[২] প্রদর্শন করবে। দুই শ থেকে এক হাজার কোটি বছরের মধ্যের কোনো এক সময়েই শুধু সঙ্কোচন দৃশ্যমান হবে। তবে মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের সূক্ষ্ম পরিবর্তন আরও সহজে বোঝা যাবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই পটভূমি বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এর তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রার তিন ডিগ্রি ওপরে। মানে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই তাপমাত্রা কমছে। দশ হাজার বছর পরে এটি কমে ১ ডিগ্রি কেলভিন হবে। প্রসারণের সর্বোচ্চ বিন্দুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম হবে। সঙ্কোচন শুরু হওয়া মাত্রই তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে। মহাবিশ্বের বর্তমান সময়ের ঘনত্বে পৌঁছলে আবারও তাপমাত্রা হবে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। এতে সময় লাগবে আরও দশ হাজার কোটি বছর। মহাবিশ্বের উত্থান ও পতন সময়ের সাপেক্ষে মোটামুটি প্রতিসম[৩]।

মহাবিশ্ব রাতারাতি গুটিয়ে যাবে না। সত্যি বলতে, দুই শ থেকে এক হাজার কোটি বছর ধরে আমাদের বংশধররা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। সেটা সঙ্কোচন শুরু হলেও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ধরুন সঙ্কোচন শুরু হতে আরও অনেক বেশি সময় লাগল। এই যেমন এক হাজার-কোটি-কোটি-কোটি বছর। এটা হলে কিন্তু পরিস্থিতি এতটা অনুকূলে থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রসারণ সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছার আগেই নক্ষত্ররা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা মহাবিশ্বে বেঁচে থাকা প্রাণীরা যে সমস্যায় পড়ত, সেই একই সমস্যা এখানেও হবে।

এখন থেকে যত বছর পরই সঙ্কোচন শুরু হোক না কেন, একইসংখ্যক বছর পরে মহাবিশ্ব আবার বর্তমান আকারের সমান হবে। তবে দেখতে অনেকটা আলাদা হবে। সঙ্কোচন দশ হাজার বছর পরে হলেও এখনকার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাক হোল থাকবে। নক্ষত্র থাকবে অনেক কম। বাসযোগ্য গ্রহ থাকবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

মহাবিশ্বের আকার পুনরায় বর্তমান আকারের সমান হতে হতে সঙ্কোচন হবে অনেক দ্রুত গতিতে। প্রায় সাড়ে তিন শ কোটি বছরে এর আকার অর্ধেক হয়ে যাবে। ক্রমেই সঙ্কোচন হার আরও বেড়ে যাবে। তবে আসল খেলা শুরু হবে এর প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে। এ সময় মহাজগাতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের তাপমাত্রা বড় হুমকি হয়ে দেখা দেবে। তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি কেলভিন হলে তাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচা পৃথিবীর জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। এটি চরমভাবে গরম হতে থাকবে। প্রথমেই গলে যাবে হিমমুকুট(i c e -c a p) বা তুষারস্রোত। এরপর সমুদ্রের পানি বাষ্প হতে শুরু করবে।

৪ কোটি বছর পরে পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রার সমান হবে। পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো বাসের জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অবশ্য পৃথিবী তার আগেই বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। কারণ সূর্য প্রসারিত হয়ে লোহিত দানব (r e d g i a n t) হবে। এই সময়টায় আমাদের বংশধররা যাওয়ার জন্যে আর কোনো জায়গা খুঁজে পাবে না। কোনো নিরাপদ বাসস্থান থাকবে না। তাপ বিকরণে ভর্তি থাকবে মহাবিশ্ব। সব জায়গার তাপমাত্রা হবে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আরও বাড়তে থাকবে। নিজেকে গরম পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া বা হিমায়িত পরিবেশ তৈরি করে তাপ থেকে রক্ষা করতে পারা কোনো জ্যোতির্বিদ দেখবেন, মহাবিশ্ব পাগলের মতো

গতিতে গুটিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিলিয়ন বছরেই আকার হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক। ততদিন পর্যন্ত টিকে থাকা কোনো ছায়াপথকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। ততদিন তারা একে অপরের সাথে মিশে যাবে। তবে তখনও অনেক ফাঁকা স্থান থাকবে। নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে না বললেই চলে।

অন্তিম মুহূর্ত কাছে চলে এলে মহাবিশ্বের অবস্থা খুব দ্রুত বিগ ব্যাংয়ের সামান্য পরের সময়ের মতো হয়ে যেতে থাকবে। জ্যোতির্বিদ মার্টিন রিজ সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের একটি আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন। পদার্থবিদ্যার কিছু সাধারণ নীতিমালা প্রয়োগ করে তিনি সঙ্কোচনের একটি চূড়ান্ত চিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত মহাজাগতিক তাপীয় বিকিরণ এত তীব্র হবে যে রাতের আকাশ বেরসিক লাল রং বিকিরণ করবে। ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব হয়ে ওঠবে এক সর্বগ্রাসী মহাজাগতিক চুল্লি। যা সব ধরনের ভঙ্গুর প্রাণকে শেষ করে দেবে, সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। এই তাপমাত্রায় গ্রহদের বায়ুমণ্ডলও টিকে থাকবে না। ক্রমেই লাল বিকিরণ হলুদ ও শেষে সাদা হয়ে যাবে। পুরো মহাবিশ্বে উপস্থিত প্রচণ্ড এই তাপীয় বিকিরণ একসময় নক্ষত্রের অস্তিত্বকেই হুমকিতে ফেলবে। বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় করতে না পেরে নক্ষত্ররা নিজেদের অভ্যন্তরে তাপ জমা করবে। একসময় ঘটাবে বিস্ফোরণ। উত্তপ্ত গ্যাস বা প্লাজমা দ্বারা স্থান ভর্তি হবে। এর বিকিরণ হবে প্রচণ্ড তীব্র। সবসময় এর উষ্ণতা আরও বাড়তেই থাকবে।

পরিবর্তনের গতি বাড়তে থাকবে। পরিস্থিতি হয়ে ওঠবে আরও চরম। ক্রমেই অল্প অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে। প্রথমে এক লক্ষ বছর, পরে এক হাজার, পরে এক শ বছরেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। যা শেষে হুট করে মোড় নেবে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের দিকে। তাপমাত্রা বেড়ে প্রথমে মিলিয়ন ও পরে বিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছবে। যে পদার্থ বর্তমানে ব্যাপক জায়গা দখল করে আছে তা গুটিয়ে ছোট্ট জায়গায় স্থান নেবে। একটি ছায়াপথের সব ভর মাত্র কয়েক আলোকবর্ষ চওড়া স্থানে আশ্রয় নেবে। শেষ তিন মিনিট চলে এল বলে।

শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা এত বাড়বে যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসও ভেঙে যাবে। বস্তু ভেঙ্গে গিয়ে মৌলিক কণাদের একটি সুষম স্যুপে পরিণত হবে। আপনি যতক্ষণে এই পৃষ্ঠাটি পড়বেন তার চেয়ে কম সময়ে বিগ ব্যাং ও বহু প্রজন্মের নক্ষত্রের মাধ্যমে ভারী রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টির কাজটি আগের অবস্থায় ফিরে গেল। পরমাণুর যে নিউক্লিয়াসরা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে টিকে ছিল আজ তারা শেষ হয়ে গেল চিরতরে। এক ব্ল্যাক হোলরা ছাড়া আর সব ধরনের কাঠামো অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছে। মহাবিশ্বে বিরাজ করছে এক মার্জিত কিন্তু অশুভ সারল্য। আয়ু আছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ক্রমেই দ্রুত হারে মহাবিশ্বের সঙ্কোচনের সাথে সাথে তাপমাত্রাও বাড়ছে অনেক দ্রুত হারে। ঠিক কতটা বাড়ছে সেটা কারও জানা নেই। বস্তু এত শক্ত হয়ে গুটিয়ে গেছে যে প্রোটন ও নিউট্রনের আর আলাদাভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু কোয়ার্কের স্যুপ। সঙ্কোচনের হার কিন্তু তখনও বাড়ছে।

এবার চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সময় এসেছে। আর মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড বাকি। ব্ল্যাক হোলরা একে অপরের সাথে একীভূত হতে শুরু করবে। গুটিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বের সাধারণ অবস্থা থেকে ব্ল্যাক হোলের ভেতরের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন হবে। এরা এখন নিছকই স্থানকালের এমন অঞ্চল যারা একটু আগেভাগেই শেষ পরিণতিতে চলে এসেছে। যাদের সাথে পরে যোগ দিচ্ছে মহাবিশ্বের বাকি অংশ।

একেবারে শেষ সময়ে মহাকর্ষ সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। এটি নির্মমভাবে স্থান ও কালকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে। স্থানকালের বক্রতা ক্রমেই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ক্রমেই বড় থেকে বড় অঞ্চলের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে ছোট থেকে ছোট আয়তনের স্থানে জায়গা নেয়। প্রচলিত তত্ত্ব বলছে, ভেতরের দিকের এই অন্তঃস্ফোটন অসীম শক্তি অর্জন করে। ফলে সব বস্তু দুমড়ে-মুচড়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। ধ্বংস করে দেয় প্রতিটি ভৌত বস্তুকে। এমনকি স্থান ও কালও রেহাই পায় না। সবকিছুর স্থান হয় স্থানকালের সিংগুলারিটিতে।

এটাই শেষ পরিণতি।

আমরা এখন পর্যন্ত যতটা বুঝি, এই মহাধ্বস শুধু বস্তুরই ইটি ঘটায় না, ইতি ঘটায় সকল কিছুরই। মহাধ্বসের সময় কাল নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। ফলে তার পরে কী ঘটবে সে প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। যেমনিভাবে অর্থহীন বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ঘটেছে জিজ্ঞেস সেটা করা। “পরবর্তী” বলতে আসলে কিছুই নেই। কাজের অভাব হওয়ার মতোও সময় নেই। ফাঁকা থাকার মতোও নেই কোনো স্থান। বিগ ব্যাংয়ের সময় শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসা মহাবিশ্ব মহাধ্বসের মাধ্যমে আবার মিলিয়ে যাবে শূন্যেই। এটি যে এত মহাকাল ধরে বিরাজমান ছিল তার কোনো স্মৃতিচিহ্নও নেই।

এমন একটি সম্ভাবনা দেখে কি আমাদের মন খারাপ করা উচিত? আসলে কোনটি খারাপ: চিরকাল প্রসারিত হতে হতে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে যাওয়া এক অন্ধকার শূন্যতা, নাকি গুটিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলিয়ে যাওয়া এক মহাবিশ্ব? যেখানে মহাবিশ্ব থেকে সময়ই হারিয়ে যাবে সেখানে অমরত্বের সম্ভাবনাই বা কেমন?

চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বের চেয়ে মহাধ্বসের ক্ষেত্রেই তো প্রাণের টিকে থাকা বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। এখানে শক্তির স্বল্পতা কোনো সমস্যা নয়। বরং শক্তির আধিক্যই সমস্যা করছে। তবে বিপর্যয় চলে আসার আগে আমাদের বংশধররা হয়ত প্রস্তুতির জন্যে এক শ কোটি বা এমনকি এক লক্ষ কোটি বছর সময় পাবে। এই সময়ে প্রাণ পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে যেতে পারে। সঙ্কোচনশিল মহাবিশ্বের সবচেয়ে সরল নমুনায় স্থানের মোট আয়তন আসলে সসীম। এর কারণ হলো স্থান বেঁকে থাকে। আর এটি একটি গোলকের পৃষ্ঠের মতো করে ত্রিমাত্রিক জগতে নিজের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে বোঝা কঠিন নয় যে বুদ্ধিমান জীবেরা পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার মানে নিজেদের হাতে থাকা সবরকম রসদ নিয়ে তারা মহাধ্বসকে মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে না কেন তারা টিকে থাকার চিন্তা করবে। মহাধ্বসের পর যদি বেঁচে থাকা অসম্ভবই হয়, তাহলে যন্ত্রণাকে আর বাড়িয়েই বা কী লাভ? ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছরের পুরনো মহাবিশ্বে শেষ ধ্বংসের ১০ লাখ বছর আগের মৃত্যুও যা, ১ কোটি বছর পরের মৃত্যুও তা। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সময় কিন্তু আপেক্ষিক। আমাদের বংশধরদের নিজস্ব সময় কিন্তু তাদের বিপাকক্রিয়া ও তথ্য প্রসেস করার গতির ওপর নির্ভর করবে। তাই আবারও বলতে হচ্ছে, শারীরিক আকৃতিকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচুর সময়ে পাচ্ছে বলে তারা হয়ত কোনোভাবে অমরত্ব অর্জনে সক্ষম হবে।

তাপমাত্রা বাড়ার অর্থ কণাদের চলাচলও বাড়বে। ভৌত প্রক্রিয়াগুলোও চলবে দ্রুত গতিতে। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিমান জীবের জন্যে আবশ্যকীয় প্রয়োজন হলো তথ্য প্রসেস করতে পারা। তাপমাত্রা বাড়তে থাকা মহাবিশ্বে কিন্তু তথ্য প্রসেস করার গতিও বাড়বে। যে জীব এক শ কোটি ডিগ্রির তাপগতীয় প্রক্রিয়াকেও কাজে লাগাতে শিখবে, তার কাছে মহাবিশ্বের আসন্ন মৃত্যুকে মনে হবে বহু বছর পরের ঘটনা। যতটুকু সময় বাকি আছে সেটাকে যদি মনের মধ্যে অসীম মনে হয়, তাহলে সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করার তো দরকারই নেই। সঙ্কোচন বাড়তে বাড়তে মহাধ্বস ক্রমেই দ্রুততার সাথে যতই নিকটবর্তী হবে, তাত্ত্বিকভাবে সময় ক্রমেই তত ধীরে চলবে বলে মনে হবে। চিন্তার গতি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অ্যারমাগেডনের দিকেও নিকটবর্তী হওয়ার বেগ বাড়বে। যথেষ্ট রসদ থাকলে এই জীবগুলো সত্যিকার অর্থেই সময় কিনতে পারবে।

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বে বাস করা কোনো মহাপ্রাণী একদম শেষ মুহূর্তের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করতে পারবে কি না। জন ব্যারো ও ফ্র্যাংক টিপলার এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ দিকের পর্যায়গুলোর ভৌত অবস্থার ওপর প্রশ্নটির উত্তর খুব বেশি নির্ভরশীল। যেমন ধরুন, শেষের সিংগুলারিটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্ব মোটামুটি সুষম থাকল। তাহলে কিন্তু একটি সমস্যা হয়ে যাবে। চিন্তার তই যাই হোক না কেন, আলোর গতি কিন্তু পাল্টাচ্ছে না। আলো কিন্তু সেকেন্ডে এক আলোকসেকেন্ডের[৪] বেশি পথ যেতে পারবে না। কোনো ভৌত প্রতিক্রিয়া সর্বোচ্চ কত দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে তাতে আলোর গতি একটি সীমা বেঁধে দেয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, একদম শেষ সেকেন্ডে মহাবিশ্বের এক আলোকসেকেন্ডের বেশি দূরের দুটি জায়গার মধ্যে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয়। (এটাও ঘটনা দিগন্তের একটি উদাহরণ, যেমনিভাবে ব্ল্যাকহোলে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোনো তথ্য পৌঁছতে পারে না।) মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিকটবর্তী হতে থাকলে যোগাযোগযোগ্য অঞ্চল ও তাতে উপস্থিত কণার সংখ্যা কমে শূন্যতে নেমে আসে। একটি সিস্টেমকে তথ্য প্রসেস করতে হলে সিস্টেমের সব অংশের মধ্যে যোগাযোগ থাকতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আলোর বেগ নির্দিষ্ট হওয়ায় শেষের সময়ের যেকোনো "মস্তিষ্ক"কে ছোট বানিয়ে ফেলবে। এবং এর ফলে হয়ত এমন একটি মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা অবস্থা বা চিন্তার সংখ্যাও কমে যাবে।

এই বাধাকে দূর করতে হলে মহাজাগতিক সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়গুলোকে সুষমতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এবং সত্যি বলতে এটাও একটি সম্ভাব্য ঘটনা। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচন নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের অন্তঃস্ফোটনের সাথে সাথে বিভিন্ন দিকে অন্তঃস্ফোটনের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে। উৎসুকের ব্যাপার হলো, এক দিকে দ্রুত ও আরেক দিকে ধীরে মহাবিশ্বের সঙ্কোচনটাই শুধু বিষয় নয়। ব্যাপার হলো, স্পন্দন শুরু হলে সবচেয়ে দ্রুত অন্তঃস্ফোটনের দিকও পাল্টে যায়। বাস্তবতা হলো, বিলুপ্তির আগের সময়ে ক্রমেই বেড়ে চলা উন্মাদনা ও জটিলতার ফলে মহাবিশ্ব এদিক-ওদিক দোল খেতে থাকে।

ব্যারো ও টিপলার ধারণা করছেন, জটিল এসব স্পন্দনের কারণে প্রথমে এক দিকের ঘটনা দিগন্ত হারিয়ে যাবে। পরে হারাবে অন্য এক দিকের ঘটনা দিগন্ত। ফলে সব দিকের অঞ্চলই হাতের নাগালে থাকবে। মহামস্তিষ্কগুলোতে হতে হবে বুদ্ধিতে ভরপুর। স্পন্দনের কারণে এক

দিকে অন্য দিকের চেয়ে অন্তঃস্ফোটন দ্রুত ঘটতে থাকলে যোগাযোগের দিকও বদলে ফেলতে হবে। প্রাণীরা তাল মিলিয়ে চলতে পারলে স্পন্দন থেকেই চিন্তা প্রসেস করার প্রয়োজনীয় শক্তি মিলবে। এছাড়াও সরল গাণিতিক নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মহাধ্বসের মাধ্যমে সমাপ্তির আগের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক স্পন্দন হবে। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করার সুযোগ হবে। তার মানে মহাপ্রাণীদের হিসাবে সময়ের পরিমাণ হবে অসীম। ফলে তাদের মনের ভেতরে জগতটার কখনও ইতি ঘটবে না। যদিও মহাধ্বসের মাধ্যমে ভৌত জগৎ হঠাৎ করে নেই হয়ে যাবে।

অসীম ক্ষমতার একটি মস্তিষ্ক কী করতে পারে? টিপলারের মতে এটি এর নিজের অস্তিত্বের সবগুলো দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবে না। পুরো মহাবিশ্বকেও বুঝতে পারবে না। কিন্তু তথ্য প্রসেসের ক্ষমতা অসীম হওয়ায় এটি ভার্চুয়াল বাস্তবতায় কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে যেতে পারবে। এভাবে এটি মনোজগতে অসীমসংখ্যক সম্ভাব্য মহাবিশ্বকে ধারণ করতে পারবে। শেষ তিন মিনিট শুধু অসীম পর্যন্তই বিস্তৃত হবে না, এ সময় অসীম রকমের ছদ্ম বাস্তবতাও তৈরি করা যাবে।

তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, (কিছুটা পাগলাটে) এই ধারণাগুলো খুব নির্দিষ্ট ভৌত নমুনার ওপর নির্ভরশীল। হয়ত সেগুলো একেবারেই অবাস্তব। এছাড়া এগুলোতে কোয়ান্টাম প্রভাবকেও উপেক্ষা করা হয়েছে, যে প্রভাব হয়ত শেষ সময়ের মহাকর্ষীয় অন্তঃস্ফোটনকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই প্রভাবের কারণে হয়ত তথ্য প্রসেসের হারেও একটি চূড়ান্ত সীমা বাঁধা থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করব, মহাপ্রাণী বা সুপারকম্পিউটার যেন অন্তত অস্তিত্বকে যথেষ্ট পরিমাণ বুঝতে পেরে হাতে থাকা সময়ে নিজের সমাপ্তিকে সহজে মেনে নিতে পারে।

অনুবাদকের নোট

১। আগেও এর কারণ বলা হয়েছে। আলোর বেগ অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আমরা ইচ্ছেমতো দূরের জিনিস দেখতে পারি না। শুধু যত দূর থেকে আলো আমাদের চোখে এসে আসতে পেরেছে, তত দূরের জিনিসই দেখতে পাই। তবে সময় গড়াবার সাথে সাথে আরও দূর থেকে আলো আসার সুযোগ পাবে বলে ক্রমেই আরও দুরের ও অতীতের বস্তুও আমরা দেখতে পারব।

২। মহাজাগতিক মাপকাঠিতে দূরে সরা বস্তুর আলোর কম্পাঙ্ক কমে যায়। ফলে বেড়ে যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এ কারণে দৃশ্যমান আলোর রং লাল হয়ে যায়। এটাই লোহিত সরণ।

৩। একটি বিন্দু বা অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো জিনিসকে দুই বিপরীত দিক থেকে দেখতে একই রকম দেখা গেলে তাকে প্রতিসম জিনিস বা ঘটনা বলে। যেমন ধরুন, কেউ সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে বের হলেন। ২ মিনিট পরে বাসে উঠলেন। ২০ মিনিট পরে কাছের শহরে গেলেন। ১৬ মিনিট ধরে বাজার করলেন। পরের ২০ মিনিটে বাসে করে এসে নামলেন বাসস্ট্যান্ডে। পরের ২ মিনিটে বাসায় চলে এলেন। খেয়াল করে দেখুন, সাড়ে ১০টার দুই দিকের ঘটনাগুলো একইরকম। তাহলে এই ভদ্রলোকের কাজের খতিয়ান সাড়ে দশটার সাপেক্ষে প্রতিসম। অবশ্য আরও সূক্ষ্মভাবে ভাবলে এই চলাচলকে প্রতিসম করতে হলে আরও কিছু বিষয় চিন্তা করতে হবে। আবার ধরুন, একটি রাস্তাকে একটি জায়গা থেকে দেখলে দুই দিকেই একইরকম দেখা যায়। তাহলে এই রাস্তাও প্রতিসম। আমাদের মানবদেহও কিন্তু প্রতিসম ধরনের। আমাদের দেহের উপর থেকে নীচে একটি রেখা কল্পনা করুন। এই রেখার দুই দিক প্রায় একই রকম। এটাও এক ধরনের প্রতিসাম্য। একটি মার্বেলকে মাঝখান দিয়ে কেটে ফেললে দুই দিক একই রকম হবে। তাই, ব্যাস বরাবর মার্বেলও প্রতিসম।

৪। আলো এক সেকেন্ডে যত দূর যায় তাকে এক আলোকসেকেন্ড বলে। যেমনি এক বছরে অতিক্রান্ত পথকে এক আলোকবর্ষ বলে। তার মানে এক আলোকসেকেন্ড আসলে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার।

দশম অধ্যায়

হঠাৎ মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

এ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ধারিত হবে অনেক অনেক দিন পরে। হয়ত অসীম সময় পরের ভবিষ্যতে। হয়ত সেটা ঘটবে

বিস্ফোরণ কিংবা আর্তনাদের (আরও সঠিক করে বললে কচকচ শব্দ বা তীব্র হিমায়ন) মাধ্যেম। মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হলে সেই আসন্ন ঘটনার বহু বিলিয়ন বছর আগেই আমাদের বংশধররা আগাম সঙ্কেত পাবে। কিন্তু আরও বেশি ভয়াবহ একটি সম্ভাবনাও আছে।

আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের দিকে তাকালে জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার তাৎক্ষণিক কোনো চিত্র দেখেন না। দূরের অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে সময় লাগে বলে আমরা একটি বস্তুর সেই অবস্থা দেখি যখন এটি থেকে আলো বের হয়েছিল। টেলিস্কোপ শুধু দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র নয়, অতীতের জিনিস দেখারও যন্ত্র। একটি বস্তু যত দূরে হবে, এর তত অতীতের চিত্র আজ দেখব আমরা। বাস্তবতা হলো, জ্যোতির্বিদদের কাছে মহাবিশ্ব হলো স্থান ও কালের মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়ে এক ফালি অতীত। কেতাবি নাম অতীতের লাইট কোন (c o n e)। ১০.১ চিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে কোনো তথ্য বা ভৌত ঘটনা আলোর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। অতীতের লাইট কোন (আলোর কোন) আমাদের জ্ঞানকে যেমন সীমিত করছে, তেমনি সীমিত করছে বর্তমানে আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারা ঘটনাকেও। তার মানে যে ভৌত ঘটনা আমাদের দিকে আলোর বেগে আসছে, সেটি আসছে কোনো পূর্বসঙ্কেত ছাড়াই। বিপর্যয় যদি অতীতের লাইট কোন বেয়ে থেকে ধেয়ে আসে, তাহলে সেই বিপদ আগে থেকে বোঝাই যাবে না। আঘাতপ্রাপ্ত হবার পরেই কেবল প্রথম এর কথা জানা যাবে।

চিত্র ১০.১

[স্থান ও কালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু P চিন্তা করুন। এটা হয়ত এখন এবং এখানে। যেমন, মহাবিশ্বের দিকে তাকানো একজন জ্যোতির্বিদ আসলে দেখছেন এর অতীত অবস্থা। বর্তমান অবস্থা নয়। P বিন্দুতে আসা আলো তথ্য P এর মাধ্যমে অতীতের লাইট কোন বেয়ে আসছে, যার গতিপথ তীর্যক রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো তথ্য বা ভৌত প্রভাব চলতে পারে না বলে এই মুহূর্তের একজন পর্যবেক্ষক শুধু ছবির গাঢ় অঞ্চলে ঘটা প্রভাব বা ঘটনা দেখতে পাবেন। অতীতের আলোক কোনের বাইরে ঘটা কোনো দূর্যোগ হয়ত পৃথিবীর দিকে বিপদসঙ্কেত পাঠাতে থাকবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক সেটা না জেনেই আনন্দের মধ্যে সময় পার করবে।]

একটি সরল কাল্পনিক উদাহরণ চিন্তা করি। এই মুহুর্ত সূর্য বিস্ফোরিত হলে আমরা সেটা জানতে পারব সাড়ে আট মিনিট পরে। সূর্য থেকে আমাদের কাছে আসতে এই সময়টুকুই লাগে। একইভাবে হতেই পারে, কাছের কোনো নক্ষত্র এর মধ্যেই সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়েছে। এটা হলে পৃথিবী প্রাণঘাতী বিকিরণে ছেয়ে যাবে। কিন্তু সেটা না জেনেই আরও কয়েক বছর আমরা আনন্দেই সময় কাটাবো। অথচ বিপর্যয়ের খবর কিন্তু আমাদের দিকে আলোর বেগেই ছুটে আসবে। ফলে, এই মুহূর্তে মহাবিশ্বকে দেখতে যথেষ্ট মনে হলেও আমরা নিশ্চিত করতে বলে দিতে পারি না ভয়ঙ্কর কিছু ইতোমধ্যেই ঘটে যায়নি।

সবচেয়ে আকস্মিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি ঘটনার মহাজগাতিক অঞ্চলের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নক্ষত্রের মৃত্যু বা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে বস্তুর পতন গ্রহ ও আশেপাশের নক্ষত্রকে প্রভাবিত করবে। এর প্রভাবই হয়ত কয়েক আলোকবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিস্ফোরণ ঘটবে কিছু কিছু ছায়াপথের অভ্যন্তরে ঘটা ঘটনায়। আগেও বলেছি, মাঝেমাঝে আলোর বেগের বড় এক ভগ্নাংশের মধ্যে বস্তুর বিশাল বিশাল পিচকিরি নির্গত হয়। সেই সাথে বেরিয়েয় আসে বিপুল পরিমাণ বিকিরণ। এই বিশৃঙ্খলার প্রভাব পুরো ছায়াপথজুড়ে থাকে।

কিন্তু পুরো মহাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া ঘটনাগুলো কেমন হবে? এমন কোনো আলোড়ন কি সম্ভব যা এক ধাক্কায় পুরো মহাবিশ্বকেই এর মধ্যবয়সেই শেষ করে দেবে? এমন কি হতে পারে যে সত্যিকারের কোনো মহাজাগতিক বিপর্যয় শুরুই হয়ে গেছে? যার অশুভ প্রভাব হয়ত আমাদের অতীতের লাইট কোন বেয়ে ধেয়ে আসছে? ধ্বংস হতে যাচ্ছে আমাদের স্থানকালের ভঙ্গুর কাঠামো?

১৯৮০ সালে সিডনি কোলম্যান ও ফ্র্যাংক ডি লুসিয়া ফিজিক্যাল রিভিউ জার্নালে একটি ভয়ানক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। শিরোনামটা একেবারেই অক্ষতিকর, "শূন্যস্থান ক্ষয়ের মহাকর্ষীয় প্রভাব।" তাঁরা যে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য স্থানের কথা বলছেন সেটি নিছকই ফাঁকা স্থান নয়। এটা হলো কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ফাঁকা স্থান। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, আমরা যেটাকে ফাঁকা স্থান মনে করি সেখানে আসলে প্রচুর পরিমাণ ক্ষণস্থায়ী কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ড ঘটে চলছে। দৈব উন্মাদনায় ভূতুড়ে ভার্চুয়াল কণারা প্রতি মুহূর্তে আবির্ভূত ও উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই ভ্যাকুয়াম অবস্থা কিন্তু অনন্য নয়। কোয়ান্টাম অবস্থা কয়েকটি হতে পারে। যার সবগুলোই হবে ফাঁকা। কিন্তু সবগুলোর কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ডের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক অবস্থার শক্তিও আলাদা আলাদা।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি নীতি হলো, উচ্চশক্তির অবস্থা নিম্নশক্তির অবস্থায় নেমে আসতে চায়। যেমন ধরুন, একটি পরমাণু

অনেকগুলো উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে পারে। যার সবগুলো অবস্থাই অস্থিতিশীল। এটি সবচেয়ে নিমশক্তির অবস্থায় বা নিম্নতলের অবস্থায় নেমে আসতে চেষ্টা করবে। একইভাবে একটু উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামও নিম্নতম শক্তির বা "সত্যিকারের" ভ্যাকুয়ামে নেমে আসতে চেষ্টা করবে। স্ফীতিময় মহাবিশ্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, খুব প্রারম্ভিক মহাবিশ্ব উত্তেজিত বা "ছদ্ম" ভ্যাকুয়াম অবস্থায় ছিল। এ সময় এটি চরমভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থা সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে চলে আসে। শেষ হয় স্ফীতি।

সাধারণত মনে করা হয়, মহাবিশ্ব বর্তমানে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। তার মানে, আমাদের সময়ের ফাঁকা স্থান হলো সবচেয়ে নিম্নশক্তির ভ্যাকুয়াম। কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত করে সেটা বলতে পারি? কোলম্যান ও ডি লুসিয়া একটি ভয়ানক সম্ভাবনার কথা বলছেন। বর্তমানের ভ্যাকুয়াম হয়ত সত্যিকারে ভ্যাকুয়াম নয়। এটা হয়ত আপাতত দীর্ঘস্থায়ী কোনো নকল ভ্যাকুয়াম। যার কারণে হয়ত ভুল করে আমরা মনে করে নিয়েছি আমরা নিরাপদ আছি। কারণ এই নকল ভ্যাকুয়াম কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে টিকে আছে। আমরা অনেক ধরনের কোয়ান্টাম অবস্থার কথা জানি। যেমন ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস, যার অর্ধায়ু বিলিয়ন বিলিয়ন বছর। একবার মনে করুন যে বর্তমানের ভ্যাকুয়ামও এই ধরনের, তাহলে? কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্রের শিরোনামে উল্লিখিত ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় থেকে একটি ভয়ানক সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত বর্তমান ভ্যাকুয়াম হুট করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্ব চলে যেতে পারে আরও নিম্নশক্তির অবস্থায়। যার পরিণাম আমাদের জন্যে হবে ভয়ানক (এবং বাকি সবার জন্যেও)।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার প্রস্তাবনার পেছনে কাজ করছে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়া। একে সবচেয়ে সহজে ব্যাখ্যা করার জন্যে একটি কোয়ান্টাম কণা একটি বলের বাধায় আটকে আছে–এমন সরল চিত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, ১০.২ চিত্রের মতো কণাটি একটি উপত্যকায় আটকে আছে। দুই পাশে আছে খাড়া পাহাড়। বাস্তবে পাহাড়ই হতে হবে এমন কথা নেই। যেমন, তারা বৈদ্যুতিক বা নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্রও হতে পারে। এই পাহাড় পাড়ি দেওয়ার (বা বলক্ষেত্রকে অতিক্রম করার) শক্তি উপস্থিত না থাকলে মনে হবে কণাটি চিরকাল আটকেই থাকবে। কিন্তু মনে করুন দেখুন, কোয়ান্টাম কণারা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মানতে বাধ্য। যার কারণে এরা অল্প সময়ের জন্যে শক্তি ধার করতে পারে। এর ফলে মজার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। কণাটি পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতো শক্তি ধার করতে পারলে এবং ধার করা শক্তি ফিরিয়ে দেবার আগেই ওপাশে নেমে যেতে পারলেই তো আটকাবস্থা থেকে বেরিয়ে যেতে পারছে। বাস্তবেই এটি বাধা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে গেল।

চিত্র ১০.২

[টানেল ইফেক্ট বা সুড়ঙ্গ প্রভাব। দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় আবদ্ধ কোয়ান্টাম কণারও শক্তি ধার করে পাহাড়ের ওপাশে চলে যাওয়ার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে সুড়ঙ্গ কেটে ওপাশে চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণে দেখাও গেছে। এর একটি পরিচিত উদাহরণ হলো, কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের আলফা কণা নিউক্লীয় বলের বাধাকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম আলফা তেজস্ক্রিয়তা। এই উদাহরণে পাহাড় হলো নিউক্লীয় ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল। আঁকা ছবিটা নিছকই ঘটনাটিকে সহজে বোঝানোর জন্যেই দেওয়া হয়েছে।]

এমন আবদ্ধ জায়গা থেকে কোয়ান্টাম কণার সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে যাওয়া বাধার উচ্চতা ও প্রস্থের ওপর খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি হবে, কণাকে ওপরে ওঠার জন্যে তত বেশি শক্তি ধার করতে হবে। ফলে অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে ঋণও ফিরিয়ে দিতে হবে তত তাড়াতাড়ি। তার মানে উচ্চ বাধা পার হতে হলে বাধাকে হতে হবে চিকন। যাতে খুব দ্রুত ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই বাধা পার হয়ে যাওয়া যায়। এ কারণেই সুড়ঙ্গ প্রভাব নিত্যদিন চোখে পড়ে না। বড় রকমের টানেলিং ঘটতে হলে যে ধরনের উচ্চ ও প্রশস্ত বাধা হওয়া যাবে, বড় জগতের বাধাগুলো তার চেয়ে বেশি বড়। নীতিগতভাবে একজন মানুষ একটি ইটের দেয়াল ভেদ করে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এ অলৌকিক কাজ করতে পারার কোয়ান্টাম সুড়ঙ্গ সম্ভাবনা অনেক অনেক অনেক ক্ষুদ্র। তবে পারমাণবিক জগতে টানেলিং অহরহ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, আলফা তেজস্ক্রিয়তা এ প্রক্রিয়াতেই ঘটে। অর্ধপরিবাহী ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতেও সুড়ঙ্গ প্রভাব কাজে লাগানো হয়। যেমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে টানেলিংয়ের মাধ্যমে স্ক্যান করা।

বর্তমান ভ্যাকুয়ামের সম্ভাব্য ক্ষয়ের সমস্যা সম্পর্কে কোলম্যান ও ডি লুসিয়া অনুমান করছেন, ভ্যাকুয়াম তৈরি করা কোয়ান্টাম ক্ষেত্র হয়ত ১০.৩ চিত্রে দেখানো বলের মতো (রূপক) দৃশ্য তৈরি করে। বর্তমান ভ্যাকুয়াম অবস্থা আছে উপত্যকা A এর ভূমিতে। তবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম আছে উপত্যকা B এর ভূমিতে, যা A এর নীচে। ভ্যাকুয়াম উচ্চ শক্তির A অবস্থা থেকে নিম্ন শক্তির B অবস্থায় নেমে আসতে চাইবে। কিন্তু মাঝখানে "পাহাড়" বা বল ক্ষেত্র থাকায় সেটি করা যাচ্ছে না। পাহাড় এ ক্ষয়কে বাধা দিলেও কোয়ান্টাম টানেলিং প্রভাবের কারণে পুরোপুরি থামিয়ে রাখতে পারছে না। A থেকে B উপত্যকায় সুড়ঙ্গ কেটে চলে আসা সম্ভব। এই তত্ত্ব সঠিক হলে মহাবিশ্ব ধার করা সময়ের মধ্যে অবস্থান করছে। আটকে আছে উপত্যকা A তে। কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়ে যেকোনো সময় B উপত্যকায় চলে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা সবসময় আছে।

চিত্র ১০.৩

[নকল ও সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থা। হতে পারে ফাঁকা স্থান A এর বর্তমান কোয়ান্টাম অবস্থা সবচেয়ে নিম্ন শক্তির অবস্থা নয়। হয়ত এটি উঁচু কোনো উপত্যকার আপাত স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে এটি সুড়ঙ্গ প্রভাবের মাধ্যমে ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকারের স্থিতিশীল গ্রাউন্ড অবস্থা B তে নেমে আসবে। বুদ্বুদের তৈরির মাধ্যমে ঘটা এই অবস্থান্তর থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে।]

কোলম্যান ও ডি লুসিয়া গাণিতিকভাবে ভ্যাকুয়ামের ক্ষয়ের নমুনা বানিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে ঘটে। তাঁরা দেখলেন, স্থানের একটি দৈব (r a n d o m) অবস্থানে ক্ষয় শুরু হবে। এর আকৃতি হবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো। এটি অস্থিতিশীল নকল ভ্যাকুয়াম দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদ তৈরি হওয়া মাত্রই এটি খুব দ্রুত প্রসারিত হতে থাকবে। প্রসারণের হার চলে আসবে আলোর বেগের কাছাকাছি। যা ক্রমেই নকল ভ্যাকুয়ামের বেশি অঞ্চলে ছেয়ে যাবে। তাৎক্ষ্ণিকভাবে সেই অঞ্চলগুলো সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে পরিণত হবে। দুই অবস্থার মধ্যকার শক্তির পার্থক্য বুদ্বুবের দেয়ালে কেন্দ্রীভূত থাকবে। আর অবস্থাগুলো হয়ত হবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বড় বড় মানগুলোর মতো। বুদ্বুদগুলো হয়ত মহাবিশ্বময় ঘুরে বেড়াবে, গতিপথের সবকিছু ধ্বংস করতে করতে।

সত্যিকারের বুদ্বুদের দেয়ালের কথা জানতে জানতে সেটা আমাদের দরজায় হানা দিয়ে ফেলবে। আমাদের জগতের কোয়ান্টাম কাঠামো হুট করে পাল্টে যাবে। আমরা তিন মিনিটের সতর্ক সঙ্কেতও পাব না। মুহূর্তের মধ্যে সব অতিপারমাণবিক কণা ও তাদের মিথস্ক্রিয়া আমূল পাল্টে যাবে। যেমন ধরুন, প্রোটন হয়ত সাথে সাথে ক্ষয় হয়ে যাবে। এটা ঘটলে আকস্মিকভাবে সব বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। যা কিছু বাকি থাকবে, সেটা চলে যাবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের অভ্যন্তরে। আমরা বর্তমানে যেমন দেখছি, সেটা হবে তার থেকে খুবই ভিন্ন। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন চোখে পড়বে। কোলম্যান ও ড লুসিয়া দেখেছেন, সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের শক্তি ও চাপ এত তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে যে বুদ্বুদ প্রসারিত হতে হতে বুদ্বুদ দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ভেঙে পড়বে। এতে সময় লাগবে এক মাইক্রোসেকেন্ডেরও কম। এক্ষেত্রে মহাসঙ্কোচনের দিকে অগ্রযাত্রা কোমল হবে না। বরং হুট করে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বুদ্বুদের ভেতরটা স্থানকালের সিংগুলারিটিতে গিয়ে গুটিয়ে যাবে। এক কথায় তাৎক্ষণিক এক সঙ্কোচন ঘটবে। জোর দিয়ে কিন্তু সংযতভাবে তাঁরা বলছেন, এটা হতাশাজনক। তাঁরা আরও বলছেন,

> আমাদের নকল ভ্যাকুয়ামে বাস করার সম্ভাবনাকে কখনোই আননদচিত্তে গবেষণা করার বিষয় মনে হয়নি। ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় পরিবেশের চূড়ান্ত বিপর্যয়। ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের পরে আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্বই শুধু অসম্ভব নয়, এর গাঠনিক উপাদানও অসম্ভব। তবে সান্ত্বনার একটি জায়গা আছে। সম্ভবত সময়ের সাথে সাথে নতুন ভ্যাকুয়াম স্থিতিশীল হবে। আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে এমন কিছু কাঠামো হয়ত থাকবে যারা আনন্দ উপভোগ করতে জানবে। এ সম্ভাবনাও এখন আর নেই।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদরা ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের ভয়ানক ফলাফল নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় লেগে যান। নেচার জার্নালে এর একটি ফলো-আপ প্রকাশিত হয়। এটা লেখেন কসমোলজিস্ট মাইকেল টার্নার ও পদার্থবিদ ফ্র্যাংক উইলচযেক। তাঁরা একটি ভয়ানক ফলাফল বের করেন, “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনসের আচরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ভ্যাকুয়ামকে বাস্তবে স্থিতিশীল মনে হলেও এটি তা নয়। কোনো আগাম সঙ্কেত ছাড়াই মহাবিশ্বের কোথাও সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের একটি বুদ্বুদ তৈরি হয়ে যেতে পারে। বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে আলোর গতিতে।”

টার্নার ও উইলচযেকের প্রকাশনার পরপরই পিট হাট ও মার্টিন রিজ নেচারেই আরেকটি আতঙ্কের কথা প্রকাশ করেন। মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ভ্যাকুয়াম বুদ্বুদ হয়ত কণাপদার্থবিদরাই মনের অজান্তে তৈরি করে ফেলতে পারেন। ভয়টা হচ্ছে, অতিপারমাণবিক কণাদের খুব উচ্চ শক্তির সংঘর্ষে হয়ত এমন অবস্থা তৈরি হবে যাতে ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে যেতে চাইবে। হয়ত সেটা অল্প সময়ের জন্যে ছোট্ট জায়গায়ই হবে। আণুবীক্ষণিক জগতেও একবার এই অবস্থান্তর ঘটলে নবসৃষ্ট এই বুদ্বুদকে থামানো যাবে না। খুদ দ্রুত এটি ছড়িয়ে বড় হয়ে যাবে। তাহলে পরের প্রজন্মের কণাত্বরকযন্ত্রগুলো কি নিষিদ্ধ করা উচিত? হাট ও রিজ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁরা বলছেন, মহাজাগতিক রশ্মিগুলোতে শক্তি আমাদের কণাত্বরকযন্ত্রগুলোর চেয়ে বেশি হয়। আর মহাজাগতিক রশ্মিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে চলেছে। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্ষয় তো তাতে শুরু হয়নি। তবে ত্বরকযন্ত্রের শক্তি কয়েক শ গুণ বাড়াতে পারলেই এত দিন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীকে যে শক্তিতে আঘাত করেছে তার চেয়ে বেশি তেজস্বী সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কিন্তু পৃথিবীতে বুদ্বুদ তৈরি হতে পারে কি না সেটা আসল বিষয় নয়। বিগ ব্যাংয়ের পরের কোনো এক সময়ে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কোথাও ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে কি না সেটাই হলো আসল কথা। হাট ও রিজ বলেছেন, শক্তি বর্তমান ত্বরকযন্ত্রের চেয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ বেশি এমন দুটি মহাজাগতিক রশ্মির মুখোমুখি ধাক্কার লাগার সম্ভাবনা খুব কম। অতএব, ত্বরকযন্ত্রকে বন্ধ করে দেওয়ার এখনই কোনো দরকার নেই।

অন্য দিকে আবার যে বুদ্বুদের তৈরির কারণে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, সেই বুদ্বুদই একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিশ্বের অধিবাসীদের মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে। মহাবিশ্বের মৃত্যু থেকে বাঁচার একটি নিশ্চিত উপায় হলো আরেকটি মহাবিশ্ব তৈরি করে সেখানে পালিয়ে যাওয়া। এটা হয়ত কল্পনার ঘোড়ায় সবচেয়ে লম্বা লাগাম। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে "শিশু মহাবিশ্ব" নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। আর এদের অস্তিত্বের আলোচনা একেবারেই ছেলেমানুষি নয়।

১৯৮১ সালে বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আনেন জাপানের একদল পদার্থবিদ। তাঁরা সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত একটি নকল ভ্যাকুয়ামের ছোট বুদ্বুদের আচরণের একটি সরল গাণিতিক বিশ্লেষণ চালান। এটা হলো একটু আগে বলা অবস্থার বিপরীত পরিস্থিতি। তাঁদের পূর্বাভাস বলছে, নকল ভ্যাকুয়াম তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে স্ফীত হবে। একটি বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়ে বড় একটি মহাবিশ্বে রূপ লাভ করবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের স্ফীতির কারণে বুদ্বুদের দেয়াল এত প্রসারিত হবে যে নকল ভ্যাকুয়ামের অঞ্চল বড় হয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের অঞ্চলকেও দখল করবে। কিন্তু এতে করে প্রত্যাশিত আচরণের উল্টো ঘটনা ঘটে। নিম্ন শক্তির সত্যিকার ভ্যাকুয়ামই তো উচ্চ শক্তির নকল ভ্যাকুয়ামকে সরিয়ে দেওয়ার কথা। উল্টোটা তো হওয়ার কথা নয়।

আজব ব্যাপার হলো, সত্যিকার ভ্যাকুয়াম থেকে দেখলে নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের দখল করা অঞ্চলকে দেখে স্ফীত হচ্ছে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে এটাকে বরং দেখতে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হয়। (এক্ষেত্রে একে ডক্টর হু এর টাইম মেশিনের টারডিসের মতো লাগে। যাকে বাইরের চেয়ে ভেতরে থেকে দেখলে বড় দেখায়) নকল ভ্যাকুয়াম বুদ্বুদের ভেতরে অবস্থান করা একজন কাল্পনিক পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বকে ব্যাপকভাবে স্ফীত হতে দেখবে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে একে খুব সঙ্কুচিত মনে হবে।

এই অদ্ভুত অবস্থাটু বুঝতে হলে একটি উদাহরণ কাজে লাগতে পারে। ধরুন, একটি রাবারের চাদর একটি জায়গায় ফুলে ওঠে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গেল (১০.৪ চিত্র দেখুন)। এই বেলুন এক ধরনের শিশু মহাবিশ্ব তৈরি করবে। একটি সংযোজক সুতা বা ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে এটি মূল মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত থাকবে। মূল মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের গলাকে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হবে। এই গঠনটা খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রভাবের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলটি খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। মূল মহাবিশ্ব থেকেও খুব দ্রুত পুরোপুরি হারিয়ে যায়। ফলে ওয়ার্মহোলটি আলাদা হয়ে যায়। আর শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে নিজেই হয়ে যায় নতুন ও এক স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব। মূল মহাবিশ্ব থেকে কুঁড়ির জন্মের মাধ্যমে এই শিশু মহাবিশ্বের তৈরির মতো করেই আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে বলে অনুমান করাও যেতেও পারে। হয়ত অল্প সময়ের জন্যে স্ফীতির পরে স্বাভাবিকভাবে প্রসারণ কমে এসেছিল। এই নমুনা স্পষ্ট করেই বলছে, আমাদের মহাবিশ্বও হয়ত এভাবেই এসেছে। এসেছে হয়ত অন্য কোনো মহাবিশ্বের সন্তান হিসেবে।

স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালান গুথ ও তাঁর সহকর্মীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, উপরে বর্ণিত চিত্র থেকে দারুণ একটি সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষাগারেই হয়ত একটি মহাবিশ্ব বানানো যাবে। নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদে পরিণত হওয়ার মতো আতঙ্কের ব্যাপার নয় এটি। সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদ তৈরির ঘটনা মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে না। হ্যাঁ, পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একটি বিগ ব্যাংয়ের সূচনা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর বিস্ফোরণ ক্ষুদ্র একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ব্ল্যাকহোলটি খুব দ্রুতই মিলিয়ে যাবে। নতুন মহাবিশ্ব নিজেই নিজের জায়গা বানিয়ে নেবে। আমাদের কোনো স্থান কেড়ে নেবে না।

চিত্র ১০.৪

মূল মহাবিশ্ব থেকে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গিয়ে একটি শিশু মহাবিশ্বর জন্ম। মূল মহাবিশ্বের সাথে একটি সংযোজক সুতার সাহায্যে যুক্ত থাকে। মূল মহাবিশ্ব থেকে তাকালে ওয়ার্মহোলের মুখকে ব্ল্যাকহোল মনে হবে। ব্ল্যাকহোল মিলিয়ে গেলে ওয়ার্মহোলের গলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব জন্মলাভ করে।

হ্যাঁ, এই ভাবনাটি অনেকখানি অনুমাননির্ভর। এটি পুরোপুরি গাণিতিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে কিছু কিছু গবেষণা বলছে, এই প্রক্রিয়ায় নতুন মহাবিশ্ব জন্মলাভ করতেও পারে। খুব যত্নের সাথে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ঘনীভূত করে রচিত হতে পারে মহাবিশ্ব। খুব দূরের ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব মহাবিশ্ব বাসের অযোগ্য হয়ে গেলে বা মহাধ্বসের সম্মুখীন হলে আমাদের বংশধররা চিরতরে এখান থেকে চলে যেতে পারে। কুঁড়ি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্ব রচনা করে সংযোজক ওয়ার্মহোল দিয়ে সেই মহাবিশ্বে যেতে হবে। সেটাই হয়ত হবে চূড়ান্ত পরিযান বা স্থানান্তর। অবশ্য কেউই ঠিক বলতে পারবেন না কীভাবে নির্ভীক প্রাণীরা এই কাজটি করবে। বা আদৌ পারবে কি না। কম করে বললেও এই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে যাত্রাটা হবে মোটেও আরামদায়ক হবে না। যদি না যে ব্ল্যাকহোলে তারা ঢুকবে সেটি খুব বড় হয়।

এসব বাস্তব বিষয়গুলো বাদ দিলে শিশু মহাবিশ্বের ধারণা কিন্তু সত্যিকারের অম্বরত্বের পথ খুলে দিচ্ছে। শুধু আমাদের বংশধরদের জন্যেই নয়, মহাবিশ্বের জন্যেও। মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর কথা চিন্তা করার বদলে আমাদেরকে এক গুচ্ছ মহাবিশ্ব নিয়ে ভাবতে হবে। চিরকাল যার সংখ্যা শুধু বাড়বে। প্রতিটি থেকে জন্ম হবে নতুন প্রজন্মের আরও অনেক অনেক মহাবিশ্ব। হয়ত অসংখ্য। মহাজাগতিক এই উর্বরতার ফলে এই মহাবিশ্বগুলোর সমাবেশ–যাকে বলা উচিত মেটাভার্স–এর কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি মহাবিশ্বেরই জন্ম থাকবে। বিবর্তন থাকবে। মৃত্যু থাকবে। আগের অধ্যায়গুলোতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে। কিন্তু সার্বিকভাবে তাদের গুচ্ছ টিকে থাকবে চিরকাল।

এই চিত্র থেকে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়: আমাদের মহাবিশ্ব কি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা (স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্মের মতো) নাকি কোনো ইচ্ছার বাস্তবায়ন (টেস্টটিউব শিশুর মতো)? আমরা কল্পনা করতে পারি, মূল মহাবিশ্বের একটি যথেষ্ট উন্নত ও পরোপকারী জাতি হয়ত একটি শিশু মহাবিশ্ব তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেটা নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে পালানোর ব্যবস্থা করতে নয়। বরং নিজদের মহাবিশ্ব শেষ হয়ে গেলেও অন্য জায়গায় প্রাণের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। এটা হলে শিশু মহাবিশ্বে যাওয়ার জন্যে অতিক্রমযোগ্য ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গেলে যে কষ্ট হবে তার আর কোনো দরকার হবে না।

শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্বেরই বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে তা বলা যাচ্ছে না। প্রকৃতির বিভিন্ন বল ও বস্তুকণার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ত প্রকৃতির সূত্রের অংশ হতে পারে। যেগুলো হয়ত সবসময় সব মহাবিশ্বের জন্যে কাজ করবে। অন্য দিকে কিছু বৈশিষ্ট্য আবার বিবর্তনের ফলেও তৈরি হতে পারে। যেমন ধরুন, বেশ কয়েকটি সত্যিকার ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। যার সবগুলোর শক্তি একই রকম বা প্রায় একই রকম। স্ফীতি যুগের শেষে নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হলে হয়তোবা এটি অনেকগুলো সম্ভাব্য ভ্যাকুয়াম অবস্থার একটি দৈবভাবে বেছে নেয়। মহাবিশ্বের পদার্থবিদ্যার সূত্রের কথা বলতে হলে বলতে হয়, কণা ও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের অনেক বৈশিষ্ট্যই নির্দিষ্ট ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থাই ঠিক করে দেয়। একইভাবে নির্দিষ্ট করে স্থানের মাত্রার সংখ্যাও। ফলে শিশু মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য মূল মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। হয়ত এগুলোর অল্প কয়েকটিতেই শুধু প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব হবে। যেখানে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো আমাদের মহাবিশ্বের মতো বা কাছাকাছি হবে। অথবা হয়ত গুণাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো নীতি আছে, যার মাধ্যমে অদ্ভুত মিউটেশন ব্যতীত মূল মহাবিশ্বের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু মহাবিশ্বে ভালোভাবে সঞ্চারিত হওয়া নিশ্চিত হয়। পদার্থবিদ লি স্মোলিন বলেছেনে, মহাবিশ্বগুলোর মধ্যে হয়ত এক ধরনের ডারউইনীয় বিবর্তন কাজ করে থাকতে পারে। যা পরোক্ষভাবে প্রাণ ও সচেতনতার আবির্ভাবের সমর্থন দেয়। এর চেয়ে মজার একটি সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বগুলো হয়ত মূল মহাবিশ্বের কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার ইচ্ছার প্রতিফলন। এগুলোতে হয়ত পরিকল্পনা করেই প্রাণ ও সচেতনতার বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবনাগুলো খামখেয়ালী অনুমান মাত্র। কিন্তু কসমোলজি শাখাটিই তো খুব নতুন একটি বিজ্ঞান। তবুও আগের অধ্যায়গুলোতে যে আবছা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এই কল্পনাপ্রবণ কথাগুলো তার কিছুটা হলেও অন্তত পরিষ্কার করবে।এগুলো থেকে বলা যায়, একদিন আমাদের বংশধররা শেষ তিনি মিনিটের মুখোমুখি হলেও কোথাও না কোথাও হয়ত সচেতন প্রাণীদের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে।

এগারশ অধ্যায়

যে পৃথিবীর শেষ নেই

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আগের অধ্যায়ের শেষে আলোচিত কথাগুলো ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাবনা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই সাধারণত কেউ না কেউ আমাকে চক্রাকার মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনই। মহাবিশ্ব একটি সর্বোচ্চ সাইজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তারপর গুটিয়ে মহাসঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার বদলে এটি কোনোভাবে লাফিয়ে ওঠে। শুরু করে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের আরেকটি চক্র (চিত্র ১১.১ দেখুন)। এই প্রক্রিয়া হয়ত চিরকাল চলতে পারে। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সত্যিকারের কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি আলাদা আলাদা চক্রের স্বতন্ত্র সূচনা ও শেষ থাকবে যদিও। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত মানুষের কাছে এই তত্ত্বটা বিশেষ পছন্দের। ধর্মগুলোতে জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টি-ধ্বংসের চক্র জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের শেষের সময়ের জন্যে দুটো খুব আলাদা চিত্রের বর্ণনা দিয়েছি আমি। এর কোনোটাই আশার আলো দেখায় না। মহাধ্বসের মাধ্যমে মহাবিশ্বের নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব ভয়ঙ্কর কথা। সেটা যত দিন পরেই ঘটুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বমহিমায় সচল থাকা মহাবিশ্বের অসীম সময় পর্যন্ত মলিন অবস্থায় ফাঁকা হয়ে পড়ে থাকার বিষয়টা অবশ্যই মন

খারাপ করে দেবে। কিছু কিছু মডেল থেকে মহাপ্রাণীদের তথ্য প্রসেসের যে অসীম ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যায় সেটা হয়ত আমাদের উষ্ণ রক্তের মানুষের কাছে শীতল স্বান্তনা মনে হবে।

চিত্র ১১.১

[মহাবিশ্বের চক্রাকার মডেল। নিয়মিত বিরতিতে মহাবিশ্বের আকার খুব ঘন ও খুব স্ফীত অবস্থার মধ্যে স্পন্দিত হয়। প্রতিটি চক্রের শুরু হয় একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে। শেষ হয় সঙ্কোচনের মাধ্যমে। সময়ের সাপেক্ষে এটি মোটামুটি প্রতিসম।]

চক্রাকার নমুনা এক দিক থেকে খুব লোভনীয়। এতে মহাবিশ্ব পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর ক্ষয় ঘটছে না। অবিরাম পুনরাবৃত্তিকে ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি চক্রকে কোনোভাবে অন্য চক্রগুলো থেকে আলাদা হতে হবে। তত্ত্বটির একটি জনপ্রিয় রূপ অনুসারে প্রতিটি নতুন চক্র এর পূর্ব রূপের নির্মম মৃত্যু থেকে ফিনিক্সের[১] মতো করে আবির্ভূত হয়। আদিম অবস্থা থেকে এটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলে। পরের মহাসঙ্কোচনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে এটিও নিজের স্বমহিমা প্রদর্শন করে।

তত্ত্বটাকে দেখে কিন্তু আকর্ষণীয়ই মনে হয়। তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এতে মারাত্মক কিছু ভৌত সমস্যা আছে। এর একটি হলো, এমন একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা যা সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তাকে মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে পুনরায় প্রসারিত করাবে। এর জন্য মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করা কোনো ধরনের বল উপস্থিত থাকতে হবে। সঙ্কোচনের শেষের পর্যায়ে যেটি অতিমাত্রায় বড় হয়ে উঠবে। যার ফলে অতঃস্ফোটন প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হবে। প্রতিহত হবে মহাকর্ষের দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়ার অদম্য ক্ষমতা। বর্তমানে এমন কোনো বলের কথা জানা নেই। থাকলেও এর বৈশিষ্ট্য হত খুবই অদ্ভুত।

আপনাদের হয়ত মনে আছে, বিগ ব্যাংয়ের স্ফীতি তত্ত্বে ঠিক এমন শক্তিশালী এক বিকর্ষী বলের কথাই বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, যে উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা থেকে স্ফীতি বল তৈরি হয় সেটা খুবই অস্থিতিশীল। তৈরি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য এটা সহজেই বোঝা যায় যে ক্ষুদ্র, সরল ও অপক্ব মহাবিশ্ব তো এমন অস্থিতিশীল অবস্থায়ই জন্ম নেবে। কিন্তু জটিল এক ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে মহাবিশ্ব সব জায়গায় উত্তেজিত ভ্যাকুয়াম অবস্থা ফিরে পাবে– এমন ধারণা করা একেবারে ভিন্ন কথা। ব্যাপারটা একটা পেন্সিলকে এর অগ্রভাগের ওপর দাঁড় করানোর মতো। পেন্সিলটা খুব দ্রুত কাত হয়ে পড়ে যাবে। পেন্সিলকে আবার আগের মতো মাথার ওপর দাঁড় করানো অনেক কঠিন কাজ হবে।

এ সমস্যাগুলো এড়ানো যাবে ধরে নিলেও চক্রাকার মহাবিশ্বের ধারণায় আরও জটিলতা থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর একটি নিয়ে আলোচনা করেছি। অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় চলা সিস্টেমগুলো সসীম হারে চলতে থাকলে সসীম সময়ের মধ্যেই তাদের শেষ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। এই নীতির মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতকে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যুর পূর্বানুমান করা হয়েছিল। মহাজাগতিক চক্রের ধারণা নিয়ে এলেও এই সমস্যাটি থেকেই যায়। মহাবিশ্বকে ক্রমেই ধীর গতিতে চলা একটি ঘড়ির সাথে তুলনা করা যায়। এক সময় অনিবার্যভাবে এর কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। যদি না এর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু কোন সে কৌশল যে নিজে অপ্রত্যাগামী পরিবর্তন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মহাজাগতিক ঘড়ির পুনরাবৃত্তি করাবে?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে ভৌত প্রক্রিয়াগুলো যেভাবে উল্টোদিকে কাজ করে তেমনিভাবেই মহাবিশ্বের সঙ্কোচন পর্যায় প্রসারণ পর্যায়ের মতোই হবে। বিক্ষিপ্ত হতে থাকা ছায়াপথগুলো কাছে চলে আসতে বাধ্য হবে। শীতল হতে থাকা পটভূমি বিকিরণ আবারও উত্তপ্ত হবে। আর জটিল পদার্থগুলো ভেঙে গিয়ে মৌলিক কণার স্যুপে পরিণত হবে। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে মহাবিশ্বের যে অবস্থা ছিল, মহাসঙ্কোচনের ঠিক আগেও প্রায় একইরকম অবস্থা হবে। তবে দেখে এমনটা মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু এটা হবে না। মহাবিশ্বের পেছনে ঘোরার সময়ের জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ কেমন হবে সেটা থেকে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি। সে সময় প্রসারণ বন্ধ হয়ে সঙ্কোচন চলতে থাকবে। ফলে সে সময়ের জ্যোতির্বিদ কিন্তু তখনও দেখবেন, বহু বিলিয়ন বছর ধরে ছায়াপথরা দূরে সরছে। দেখে মনে হবে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলেছে। যদিও আসলে সঙ্কোচন শুরু হয়ে গেছে। এই ভুলের কারণ আলোর বেগ সসীম হওয়ায় সত্যিকার ঘটনা চোখে আসতে সময় লেগে যাচ্ছে।

১৯৩০ এর দশকে কসমোলজিস্ট রিচার্ড টোলম্যান দেখান, কীভাবে এই কারণে মহাবিশ্বের আপাত প্রতিসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কারণটা খুব সরল। মহাবিশ্বের শুরুর সময় বিগ ব্যাং থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ বিকিরণ ধ্বংসাবশেষ হিসেবে থেকে যায়। সময়ের সাথে সাথে নক্ষত্রের আলোর প্রভাবে এই বিকিরণ আরও বাড়ে। কয়েক বিলিয়ন বছর পরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া নক্ষত্রের আলোর জমাকৃত শক্তি পটভূমি তাপের সমান

হয়। এর অর্থ হলো, সঙ্কোচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বজুড়ে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের সময়ের চেয়ে লক্ষ্যণীয় রকম বেশি পরিমাণ বিকিরণ শক্তি উপস্থিত থাকে। ফলে মহাবিশ্ব আবার যখন সঙ্কুচিত হয়ে আজকের অবস্থায় আসবে তখন এর উত্তাপ আরেকটু বেশি থাকবে।

এই বাড়তি তাপশক্তির যোগান দেয় মহাবিশ্বের ভৌত উপাদানগুলো। এটা কাজ করে আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র দিয়ে। তাপশক্তি তৈরি করা নক্ষত্রের ভেতরে হাইড্রোজেনের মতো হালকা মৌলগুলো প্রসেস হয়ে আয়রন বা লোহার মতো ভারী মৌলে পরিণত হয়। সাধারণত আয়রনের একটি নিউক্লিয়াসে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রন থাকে। আপনার হয়ত মনে হবে, তাহলে তো এমন একটি নিউক্লিয়াসের ভর হবে ২০টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রনের ভরের সমান। কিন্তু না। এভাবে তৈরি নিউক্লিয়াসের ভর আলাদা কণা দুটির মিলিত ভরের ১ ভাগ কম হয়। ভরের এই ঘাটতি হয়েছে সবল নিউক্লিয় বলের বন্ধন শক্তি তৈরি করতে গিয়ে। এই শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকা ভরটুকুই নক্ষত্রের শক্তি হিসেবে নির্গত হয়।

এতসব কিছুর ফল হচ্ছে বস্তু থেকে বিকিরণে শক্তির নিট রূপান্তর। মহাবিশ্বের প্রসারণ প্রক্রিয়ার ওপর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। কারণ বিকিরণে মহাকর্ষীয় টান একই ভর শক্তির পদার্থের টান থেকে একদমই আলাদা। টোলম্যান দেখিয়েছেন, সঙ্কোচন পর্যায়ের বাড়তি বিকিরণের কারণে মহাবিশ্ব গুটিয়ে যায় আরও দ্রুত বেগে। আর কোনোভাবে যদি আরও একবার বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে দেখা যাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে আরও দ্রুত হারে। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি বিগ ব্যাং আগেরটির চেয়ে বড় হবে। ফলে প্রতিটি নতুন চক্রে মহাবিশ্ব আগের চেয়ে বেশি প্রসারিত হবে। ফলে চক্রগুলো একইসাথে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। (দেখুন ১১.২ নিং চিত্র)।

মহাজাগতিক চক্রের বৃদ্ধির অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার রহস্যও জানা। এটাও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনিবার্য পরিণতির একটি উদাহরণ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা বিকিরণের ফলে বাড়ে এনট্রপিও। এর প্রকাশ ঘটে মহাকর্ষীয়ভাবে ক্রমশই বড় থেকে আরও বড় চক্র তৈরির মাধ্যমে। তবে এর মাধ্যমে কিন্তু সত্যিকার অর্থে চক্র বলতে যা বোঝায় তারও অবসান ঘটে। সময়ের সাথে সাথে অবশ্যই মহাবিশ্বে পরিবর্তন ঘটে। অতীতের চক্রগুলো একের পর এক জটিল ও বিশৃঙ্খল সূচনার জন্ম দিয়েছে। আর ভবিষ্যতের চক্র প্রসারিত হবে লাগামহীনভাবে। একসময় এটি এত বড় হবে যে একটি নির্দিষ্ট চক্রের বড় অংশকে চিরপ্রসারমান চিত্রের তাপীয় মৃত্যু থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

টোলম্যানের কাজের পরেও বিজ্ঞানীরা এমন অন্য কিছু প্রক্রিয়াও খুঁজে পেয়েছেন যা প্রতিটি চক্রের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রতিসাম্য নষ্ট করে দেয়। এর একটি উদাহরণ হলো ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি। আদর্শ অবস্থা চিন্তা করলে, মহাবিশ্বের জন্ম হয় ব্ল্যাকহোল ছাড়া। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নক্ষত্ররা সঙ্কুচিত হয়। আর অন্য প্রক্রিয়ায়ও তৈরি হয় ব্ল্যাকহোল। ছায়াপথের বিবর্তনের সাথে সাথে আরও আরও ব্ল্যাকহোল তৈরি হতে থাকে। সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়গুলোতে আরও বেশি ব্ল্যাকহোল তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়। কিছু ব্ল্যাকহোল মিলিত হয়ে বড় ব্ল্যাকহোলও তৈরি হয়। ফলে মহাসঙ্কোচনের কাছাকাছি সময়ের মহাবিশ্বের অবস্থা বিগ ব্যাংয়ের পরের সময় থেকে অনেক বেশি জটিল। এটা পরিষ্কার যে সঙ্কোচনের সময় অনেক বেশি ব্ল্যাকহোল থাকবে। মহাবিশ্বের চক্র নতুন করে শুরু হলে পরের চক্র অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাকহোল নিয়ে যাত্রা শুরু করবে।

চিত্র ১১.২

[অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার কারণে মহাজাগতিক চক্র ক্রমেই বড় হতে থাকে। ফলে একসময় চক্র বলতেই কিছু থাকে না।]

ফলে মনে হচ্ছে যে চক্রীয় মহাবিশ্বে এক চক্র থেকে পরের চক্রে ভৌত কাঠামো স্থানান্তরিত হতে পারে তার জন্যে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের বৈশিষ্ট্যক্ষয়কারী প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এখানেও তাপীয় মৃত্যু ঘটবে। এই হতাশাজনক পরিণতি রোধ করার একটি উপায়ও আছে। সেজন্যে ধরে নিতে হবে, প্রতিটি নতুন চক্রের ভৌত অবস্থা এত চরম যে আগের চক্রের কোনো তথ্য পরের চক্রে পৌঁছতে পারে না। আগের সব ভৌত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। সব প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত, মহাবিশ্ব একেবারে নতুন করে জন্মলাভ করে।

এমন একটি মডেলে আকর্ষণীয় কোনো দিক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি চক্র ভৌতভাবে অন্য চক্র থেকে আলাদা হয়ে থাকলে এক চক্রের পরে আরেক চক্র আসে–এমন কথা বলার কি কোনো অর্থ থাকে? বাস্তব তো প্রতিটি চক্রই আলাদা আলাদা মহাবিশ্ব। এভাবেও তো বলা যায় যে এগুলো একের পর এক না থেকে অবস্থান করে সমান্তরালে। এই অবস্থাটি পুনর্জন্মবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে প্রতিটি মানুষ আগের জন্মের কথা ভুলে যায়। তাহলে কোন অর্থে বলা যাবে যে আগের মানুষটির পুনর্জন্ম হয়েছে?

আরেকটি সম্ভাবনা হলো, কোনোভাবে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে পেছনে ঘোরার সময় নতুন করে ঘড়ি নতুন করে শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় সূত্র যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাবে সেটার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে এটি তাহলে কী বলছে? সূত্রটির একটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক। বোতল থেকে সুগন্ধির উবে যাওয়ার কথাই ধরুন না। সুগন্ধির আচরণ পাল্টে গেলে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটবে। যেখানে ঘরে প্রতিটি কোণায় অবস্থান করা সুগন্ধির অণুগুলো ফিরে আসবে বোতলে। চলচ্চিত্র চলবে উল্টো দিকে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকেই আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য বুঝতে পারি। যার নাম সময়ের তীর। তার মানে এই সূত্রের ব্যত্যয় ঘটলে সময় চলতে শুরু করবে উল্টো দিকে।

বিপর্যয় চলে এলে সময় পেছনে চলতে শুরু করবে মনে করাটা মহাজাগতিক মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার কিছুটা সাদামাটা একটি কৌশল। সময় খারাপ হয়ে গেলে মহাজাতিক চলচ্চিত্রটাকে পেছন দিকে চালিয়ে দাও, ব্যস! তবে এই চিন্তাটাকেও অনেক কসমোলজিস্ট গ্রহণ করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে জ্যোতির্পদার্থবিদ থমাস গোল্ড এমন একটি প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পুনরায় সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের সঙ্কোচন দশায় মহাবিশ্ব হয়ত পেছনে চলতে শুরু করবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, এর ফলে কিন্তু সেই সময় জীবিত থাকা প্রাণীদের মস্তিষ্কও পেছনে চলবে। ফলে তাদের কাছে সময়ের ধারণাও বিপরীত হয়ে যাবে। ফলে সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের প্রাণীরা তাদের চারপাশের সবকিছুকে পেছনে চলতে দেখবে না। বরং আমাদের মতোই সবকিছুকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখবে। যেমন, তারা মনে করবে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত নয়, প্রসারিত হচ্ছে। তাদের চোখে মনে হবে, আমাদের সময়ের মহাবিশ্বই সঙ্কুচিত হচ্ছিল। আর আমাদের মস্তিষ্কই কাজ করছিল বিপরীত দিকে।

১৯৮০'র দশকে স্টিফেন হকিংও সময়ের উল্টো দিকে ঘোরা নিয়ে কিছু মজার কাজ করেন। পরে সেই চিন্তা থেকে সরে আসেন। আর বলেন, সেটা ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথমের হকিংয়ের বিশ্বাস ছিল, চক্রাকার মহাবিশ্বে কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রয়োগ করতে গেলে বিস্তারিত সময় প্রতিসাম্য দরকার হবে। পরে দেখা গেল, বিষয়টা তেমন নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আদর্শ সূত্রায়ন অন্তত এমনি বলে। সম্প্রতি মারে গেল ম্যান ও জেমস হার্টল কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলোকে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এখানে তারা সময় প্রতিসাম্য যুক্ত করেছেন। এরপর প্রশ্ন রেখেছেন, এই অবস্থা আমাদের মহাজাগতিক সময়কালে পর্যবেক্ষণযোগ্য কোনো প্রভাব রাখবে কি না। এখন পর্যন্ত এর উত্তর পরিষ্কার নয়।

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপায় বলেছেন রুশ পদার্থবিদ আন্দ্রেই লিন্ডে। তৃতীয় অর্ধায়ে আলোচিত স্ফীতি তত্ত্বকে বিস্তৃত করে উপায়টি ভাবা হয়েছে। মূল স্ফীতি তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে খুব প্রারম্ভিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা একটি নির্দিষ্ট উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামে সাথে সম্পর্কিত। যার প্রভাবে কিছু সময় ধরে ব্যাপক প্রসারণ ঘটেছিল। ১৯৮৩ সালে লিন্ডে বলেন, একেবারে প্রাথমিক মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা বরং বিশৃঙ্খল উপায়ে জায়গাভেদে আলাদা হতে পারে। কোথাও নিম্ন শক্তি, কোথাও মোটামুটি উত্তেজিত অবস্থা, কোথাও আবার অনেক বেশি উত্তেজিত ইত্যাদি। উত্তেজিত অঞ্চলে স্ফীতি ঘটে। এছাড়াও কোয়ান্টাম অবস্থার আচরণ নিয়ে করা লিন্ডের হিসেবে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, অতি উত্তেজিত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি স্ফীতি ঘটে। আর ক্ষয় ঘটে সবচেয়ে কম। তার মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যত বেশি উত্তেজিত থাকবে সেটি তত বেশি স্ফীত হবে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব অল্প সময় সময় পরেই যে অঞ্চলে ঘটনাক্রমে শক্তি বেশি ও স্ফীতি সবচেয়ে দ্রুত ঘটেছে সেটি খুব তাড়াতাড়ি স্ফীত হয়ে মোট স্থানের বেশিরভাগ অংশ দখল করে ফেলবে। লিন্ডে বিষয়টাকে ডারউইনীয় বিবর্তন বা অর্থনীতির সাথে তুলনা করেন। কোনো স্থানের খুব উত্তেজিত একটি অবস্থার একটি সফল কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে সেই স্থানের আয়তন হুট করে অনেক অনেক বেড়ে যাবে। যদিও সে জন্যে প্রচুর শক্তি ধার করতে হবে। ফলে ধার করা শক্তির এই অতিস্ফীত অঞ্চলগুলোই মহাবিশ্বে বেশি থাকবে।

বিশৃঙ্খল এই স্ফীতির কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্ব অনেকগুলো ছোট ছোট মহাবিশ্বের বা বুদ্বুদের একটি গুচ্ছে পরিণত হবে। কিছু কিছু স্ফীতি হবে পাগলে মতো। কিছু কিছু আবার একটুও স্ফীত হবে না। নিছক এলোমেলো ফ্লাকচুয়েশনের কারণে কিছু কিছু এলাকায় অনেক বেশি উত্তেজিত শক্তি থাকবে। ফলে সেইসব এলাকায় প্রাথমিক সূত্রে যতটা মনে করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি স্ফীতি হবে। আবার এই স্থানগুলোই সবচেয়ে বেশি স্ফীত হবে বলে স্ফীতি-উত্তর মহাবিশ্ব থেকে দৈবভাবে একটি বিন্দু বাছাই করলে সেটি খুব স্ফীত অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব মহাশূন্যে আমরা হয়ত অতিস্ফীত একটি অঞ্চলের গভীরে অবস্থিত আছি। লিন্ডের হিসেব অনুসারে, বড় বুদ্বুদ হয়ত ১০ $^{১০^{৮}}$ গুণ বড় হয়েছে। মানে ১ এর পরে ১০ কোটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় তত গুণ।

অসীম সংখ্যক অতিস্ফীত বুদ্বুদের মধ্যে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। ফলে বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে আমাদের মহাবিশ্বকেও ব্যাপক বিশৃঙ্খল মনে হবে। আমাদের বুদ্বুদটি বর্তমানে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের চেয়ে অনেক অনেক বড়। বুদ্বুদের অভ্যন্তরে পদার্থ ও শক্তি প্রায় সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকবে। কিন্তু বুদ্বুদের বাইরে থাকবে অন্য আরও বুদ্বুদ। এছাড়াও থাকবে এমন অঞ্চল, যেখানে এখনও স্ফীতি চলছে। আসলে লিন্ডের মডেলে স্ফীতি কখনোই থামে না। সবসময়ই কোনো না কোনো স্থানে স্ফীতি চলতেই থাকে। অন্য বুদ্বুদ তৈরি হতে থাকে। যদিও ততক্ষণে অন্য বুদ্বুদরা জীবনকাল শেষ করে মরে যাচ্ছে। ফলে এটাও এক ধরনের চিরন্তন মহাবিশ্ব। আগের অধ্যায়ে আলোচিত শিশু মহাবিশ্বের মতো অনেকটা। যেখানে জীবন, আশা ও মহাবিশ্বরা প্রতিনিয়ত জন্মলাভ করে। স্ফীতির মাধ্যমে নতুন বুদ্বুদ মহাবিশ্ব তৈরি চলতেই

থাকে। এর হয়ত কোনো নির্দিষ্ট সূচনা ছিল না। অবশ্য এটা নিয়ে বর্তমানে কিছু বিতর্ক আছে।

অন্য বুদ্বুদের উপস্থিতির কারণে আমাদের বংশধররা কি টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ পাবে? তারা কি মারা যাবের আগে আগে অন্য নতুন বুদ্বুদে সরে গিয়ে মহাজাগতিক বিপর্যয়, বা আরও সঠিক করে করে বললে বুদ্বুদীয় বিপর্যয়, থেকে রক্ষা পাবে? লাইফ অ্যান্ড ইনফ্লেশন নামে একটি বীরোচিত গবেষণাপত্রে লিন্ডে এই বিষয়টি আলোচনা করেন। এটা প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের ফিজিক্স লেটারস জার্নালে। তিনি বলেন, "এই ফলাফলগুলো বলছে, স্ফীতি মহাবিশ্বে জীবনের অবসান কখনও হবে না। দূর্ভাগ্য হলো, এটা থেকে বলে দেওয়া যাচ্ছে না যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী হতে পারব। যেকোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বুদ্বুদই ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। ফলে টিকে থাকার একমাত্র কৌশল হবে ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এলে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে চলে যাওয়া।"

লিন্ডের স্ফীতি তত্ত্বে একটি হতাশাজনক দিক আছে। সেটা হলো একটি আদর্শ বুদ্বুদ অনেক অনেক বড়। তাঁর হিসাব মতে, আমাদের সবচেয়ে কাছের বুদ্বুদ এত দূরে আছে যে আলোকবর্ষ এককে তা প্রকাশ করতে হলে ১ এর পরে কয়েক মিলিয়ন শূন্য বসাতে হবে। এটা এত বড় সংখ্যা যে একে লিখতে গেলে পুরো একটি বিশ্বকোষের পাতা শেষ হয়ে যাবে। আলোর বেগের কাছকাছি বেগে গেলেও এই দূরত্ব পাড়ি দিতে প্রায় একই পরিমাণ বছর সময় লাগবে। যদি না সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের বুদ্বুদের একেবারে প্রান্তের দিকে অবস্থান করে থাকি। এটাও সম্ভব হবে যদি আমাদের মহাবিশ্ব অনুমিত পদ্ধতিতে প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রকট ভূমিকা রাখা পদার্থ ও বিকিরণ অসীম পরিমাণ হালকা হয়ে গেলে বর্তমানে একেবারেই বোঝা সম্ভব নয় এমন সবচেয়ে সূক্ষ্ম কোনো ভৌত প্রভাবের ওপরই হয়ত শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণে কৌশল নির্ভর করবে। যেমন ধরুন, স্ফীতি বলের খুব দুর্বল একটি ধ্বংসাবশেষ মহাবিশ্বে থেকে গেল। মহাকর্ষের কারণে যেটা এখন একেবারে থমকে আছে। কিন্তু বুদ্বুদ থেকে পালাতে আমাদের যে পরিমাণ সময় লাগবে তাতে হয়ত সেই ধ্বংসাবশেষ আবার লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে হয়ত যথেষ্ট দীর্ঘ সময় পর মহাবিশ্ব আবারও স্ফীত হতে শুরু করবে। বিগ ব্যংয়ের পরের সেই সময়ের মতো এত প্রচণ্ডভাবে নয়। বরং খুব ধীরে। বলা যায় যে বিগ ব্যাংয়ের একটি ক্ষীণ নমুনার মতো। কিন্তু ক্ষীণ এই প্রভাব দুর্বল হলেও এটা চলবে অনন্তকাল। মহাবিশ্বের বৃদ্ধির খুব ধীরে ধীরে বাড়লেও বড় হয়ে যাওয়ার এই হার বেড়ে যাওয়ার ভৌত প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রভাবে বুদ্বুদের মধ্যেই একটি ঘটনা দিগন্তের উদয় হবে। যেটাকে দেখতে অনেকটা ব্ল্যাক হোলের মতো মনে হবে, যার ভেতরটা থাকবে বাইরের দিকে। এটি একটি ফলপ্রসূ ফাঁদ হিসেবে কাজ করবে। তখনও বেঁচে থাকা যেকোনো জীব আমাদের বুদ্বুদের ভেতরের অসহায়ভাবে আটকে থাকবে। কারণ তারা যতই বুদ্বুদের বাইরের দিকে যেতে থাকবে, বুদ্বুদের প্রান্ত স্ফীতির প্রভাবে ততই দ্রুত আরও সরে যেতে থাকবে। লিন্ডের হিসাব-নিকাশ একটু কাল্পনিক। তবে এখানে খুব সুন্দর করে দেখানো আছে যে মানুষের চূড়ান্ত নিয়তি হয়ত খুব ক্ষুদ্র ভৌত প্রভাবের ওপর নির্ভর করবে। সে প্রভাব এত ছোট যে মহাজগাতিক পর্যায়ে সেটির বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ার আগে আমরা তাকে শনাক্তও করতে পারব না।

কিছু দিক থেকে ভাবলে লিন্ডের কসমোলজি পুরাতন স্থিরাবস্থা তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শুরুতে তত্ত্বটি খুব জনপ্রিয় ছিল। মহাবিশ্বের সমাপ্তি এড়ানোর জন্যে এটা এখনও সবচেয়ে সরল ও আকর্ষণীয় তত্ত্ব। এর মূল সংস্করণের প্রস্তাবক হলেন হারম্যান বন্দি ও থমাস গোল্ড। এই তত্ত্বের মতে, বড় কাঠামোতে সবসময় মহাবিশ্ব অপরিবর্তিত থাকে। ফলে এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। প্রসারণের সাথে সাথে এর ফাঁকা স্থানে নতুন নতুন পদার্থ তৈরি হয়। সবসময় একটি নির্দিষ্ট ঘনত্ব বজায় থাকে। ছায়াপথদের নিয়তি আমি আগের অধ্যায়গুলোতে যেমন বলেছি তেমনই: জন্ম, বিবর্তন ও মৃত্যু। কিন্তু অপরিসীম নতুনসৃষ্ট পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ছায়াপথ। ফলে প্রত্যেক যুগেই মহাবিশ্বের সাধারণ চেহারা সার্বিকভাবে একই থাকে। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে ছায়াপথের সংখ্যা সবসময় সমান থাকে, যাদের একেকটির বয়স একেক রকম।

শুরুতে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব কীভাবে এল এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব শেষ হয়ে যায়। এই তত্ত্বে বিবর্তনের মাধ্যমে মহাজাগতিক অবিনশ্বরতার সাথে মজার বৈচিত্র্যের সমন্বয় করা হয়েছে। আসলে এটি আরও এক ধাপ সামনেও যায়। কারণে একেকটি ছায়াপথ ধীরে ধীরে মরে গেলেও সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব কখনও বৃদ্ধ হয় না। আমাদের উত্তরপুরুষদেরকে মাটি খুঁড়ে ক্রমেই ফুরিয়ে আসা জ্বালানির খোঁজ করতে হবে না। এক ছায়াপথ পুরাতন হয়ে গেলে শুধু আরেক ছায়াপথে চলে যেতে হবে এই যা। এটা চলতে পারে অনন্তকাল পর্যন্ত। সবসময় থাকবে একইরকম তেজ, বৈচিত্র্য ও সক্রিয়তা।

তবে এটাকে কাজ করতে হলে কিছু ভৌত শর্ত পূরণ হতে হয়। প্রসারণের কারণে কয়েক শ বছর পরপর মহাবিশ্বের আকার দ্বিগুণ হয়। ঘনত্বকে একই থাকতে হলে এই সময়ের মধ্যে প্রায় $১০^{৫০}$ টন নতুন পদার্থ প্রয়োজন। দেখে একে অনেক বেশি মনে হয়। কিন্তু এর মানে হলো প্রতি শতকে বিমানের গ্যারেজের আকারের স্থানে গড়ে একটি পরমাণু সৃষ্টি। এমন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। এভাবে পদার্থ তৈরি হওয়ার ভৌত প্রক্রিয়ার আরও বড় একটি সমস্যা আছে। একেবারে কম করে হলেও আমাদেরকে তো জানতে হবে বাড়তি ভরের যোগান দেওয়া সেই শক্তি কোত্থেকে আসবে। আর কেনইবা এই শক্তি কখনও ফুরিয়ে যাবে না। ফ্রেড হয়েল ও তাঁর সহকর্মী জয়ন্ত নারলিকার এই সমস্যা নিয়ে কাজ করনে। তাঁরা দুজনই স্থিরাবস্থা তত্ত্বকে বিস্তারিত রূপ দান করেন। শক্তির সরবরাহের জন্যে তাঁরা সৃষ্টি ক্ষেত্র নামে নতুন

ধরনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তাব করেন। ধরে নেওয়া হয়েছিল, শক্তি ক্ষেত্রের নিজের থাকবে ঋণাত্মক শক্তি। m ভরের পদার্থের প্রতিটি নতুন কণার আবির্ভাবের সাথে সাথে শক্তি ক্ষেত্রে $-mc^2$ পরিমাণ শক্তি জমা হবে।

শক্তি ক্ষেত্রের ধারণার সাহায্যে শক্তির যোগান সমস্যার পদ্ধতিগত সমাধান হলো। কিন্তু অনেক প্রশ্ন থেকে গেল অমীমাংসিত। এছাড়াও সমাধানটি নিছক প্রয়োজনের খাতিরেই তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। এই রহস্যময় ক্ষেত্রের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এর চেয়ে বড় কথা হলো, ১৯৬০ এর দশকে পর্যবেক্ষণ চলে যাচ্ছিল তত্ত্বটির বিপক্ষে। বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল মহাজাগতিক পটভূমি তাপীয় বিকিরণের আবিষ্কার। সুষম এই পটভূমিকে সহজেই বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু স্থিরাবস্থা তত্ত্বে এর ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। এছাড়াও দূর আকাশের ছায়াপথ ও বেতার ছায়াপথের[২] জরিপ থেকে বড় কাঠামোতে মহাবিশ্বের পরিবর্তনের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা পরিষ্কার হয়ে গেলে ফ্রেড ও তাঁর সহকর্মীরা স্থিরাবস্থা তত্ত্বের সরল রূপ পরিহার করেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে তত্ত্বটির আরও জটিল রূপের সাময়িক উদয় ঘটে।

ভৌত ও পর্যবেক্ষণমূলক সমস্যা বাদ দিলেও স্থিরাবস্থা তত্ত্ব কিছু আগ্রহোদ্দীপক দার্শনিক সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন ধরুন, আমাদের বংশধররা হাতে অসীম সময় ও সম্পদ পেলে তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতির কোনো সুস্পষ্ট সীমা থাকবে না। পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে তাদের সামনে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। ক্রমেই আরও বড় আয়তনের স্থান হবে তাদের করায়ত্ব। ফলে খুব দূরের ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের বড় একটি অংশ প্রযুক্তির দখলে আসবে। কিন্তু প্রস্তাবনা বলছে, মহাবিশ্বের বড় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে সাথে অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে স্থিরাবস্থা তত্ত্ব বলছে, আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব ইতোমধ্যে প্রযুক্তির করায়ত্বে চলে এসেছে। স্থিরাবস্থার মহাবিশ্বে ভৌত অবস্থাগুলো সব যুগেই সার্বিকভাবে একই রকম যুগেই বুদ্ধিমান প্রাণীদের আবির্ভাব সব যুগেই হওয়ার কথা। আর যেহেতু এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলছে, সে কারণে এমন কিছু সম্প্রদায় থাকা উচিত যারা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে। ফলে তারা প্রযুক্তি খাটিয়ে অনেক বিপুল পরিমাণ আয়তনের স্থান করায়ত্ব করার কথা। যার মধ্যে থাকবে মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চলটাও। বুদ্ধিমান প্রাণীরা মহাবিশ্ব দখল করতে চায় না বলে এই ফলাফল এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। অপরিসীম সময় আগে যেকোনো একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাবই এমন ফলাফলের জন্যে যথেষ্ট। এর সাথে প্রাচীন একটি ধাঁধাঁর মিল আছে: অসীম মহাবিশ্বে যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম সেটিও এক দিন না এক দিন ঘটবে। তাও একবার দুবার নয়। অসীমসংখ্যক বার। যুক্তির ধারা বেয়ে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে যাই সেই তিক্ত উপসংহারে: স্থিরাবস্থা তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো অবিকল এর অধিবাসীদের প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের মতো। আমরা যাকে প্রকৃতি বলি সেটা আসলে একটি বা একদল মহাপ্রাণীর কর্ককাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। একে দেখে মনে হচ্ছে প্লেটোর ডেমিয়ার্জের একটি রূপ। ডেমিয়ার্জ হলো একটি দেবতা যে বেঁধে দেওয়া ভৌত সূত্রের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। মজার ব্যাপার হলো, হয়েল তাঁর শেষের দিকের মহাজাগতিক তত্ত্বগুলোতে এমন মহাপ্রাণীদের কথা সমর্থন করে গেছেন।

মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিয়ে কথা উঠলেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখে বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেছিলেন, মানুষের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ। স্টিভেন উইনবার্গও সম্প্রতি এ মত পোষণ করেছেন। তার দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস বইয়ের শেষের উপসংহার হলো, “মহাবিশ্বকে যতটা বেশি বোঝা যাচ্ছে, ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে।" আমি বলেছি, ধীরে ধীরে মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যুর ভয়কে বড় করে দেখানো হয়েছে। হয়ত ভুলও করা হয়েছে। অবশ্যও মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে মৃত্যু হলেও হতে পারে। আমি মহাপ্রাণীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু অনুমান করেছি। যারা বিস্ময়কর ভৌত ও বুদ্ধিগত অর্জন দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে। এছাড়াও আমি সংক্ষেপে চিন্তার সীমাহীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। যদিও মহাবিশ্বের সীমা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু বিকল্প এই চিত্রগুলো আমাদের হতাশ দূর করতে সক্ষম কি? একবার আমার এক বন্ধু বলল, স্বর্গ সম্পর্কে সে যা শুনেছে তাতে তার আগ্রহবোধ আসেনি। তার মতে, অনন্তকাল ধরে মহিমান্বিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন হবে আকর্ষণহীন। এর চেয়ে দ্রুত মরে গিয়ে অনন্ত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়াই ভাল। অমরত্বের জীবনে যদি একই চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ফিরে ফিরে ভোগ করতে হয় তাহলে তা সত্যিই অর্থহীন। কিন্তু অমরত্বের সাথে যদি উন্নতি যুক্ত হয়, তাহলে আমরা চিরন্তন নতুনত্বে বসবাসের কথা কল্পনা করতে পারি। সবসময় নতুন ও রোমাঞ্চকর কিছু করা ও শেখা যাবে। সমস্যা হলো, তার উদ্দেশ্য কী হবে? মানুষ একটি প্রকল্প হাতে নিলে তার পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে প্রকল্প হয় ব্যর্থ (যদিও লব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য আছে) অন্য দিকে লক্ষ্য অর্জিত হলে প্রকল্প সফল। আর কার্যক্রম হবে সমাপ্ত। যে প্রকল্প কখনও শেষ হবে না তার কি কোনো সত্যিকার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অস্তিত্বের স্বরূপ যদি হয় কখনও পৌঁছতে না পারা এক গন্তব্য, তবে কি তাকে অর্থবহ বলা যাবে?

মহাবিশ্বের কোনো উদ্দেশ্য থাকলে আর সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটতেই হবে। কারণ, তখনও এর অস্তিত্ব অবিরাম থাকা হবে ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। অন্য দিকে মহাবিশ্ব চিরকাল টিকে থাকলে এর কোনো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আছে কল্পনা করা কঠিন। ফলে মাহাজাগতিক সফলতার বিনিময় হয়ত মহাজাগতিক মূল্য দিয়ে দিতে হবে। আমরা সর্বোচ্চ প্রত্যাশা হলো, আমাদের বংশধররা হয়ত শেষ তিন মিনিটের

আগেই মহাবিশ্বের উদ্দেশ্য জানতে পারবে।

অনুবাদকের নোট

১। ফিনিক্স মূলত গ্রিক রূপকথার একটি পাখি, যা চক্রাকারে একের পর এক এর পূর্বপুরুষের ছাই থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

২। বর্ণালীর বেতার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশে যে গ্যালাক্সিগুলো খুব উজ্জ্বল তাদের নাম বেতার ছায়াপথ। ১০ মেগাহার্টজ থেকে ১০০ গিগাহার্টজ কম্পাঙ্কে এদের দীপ্তি $১০^{৩৯}$ ওয়াট পর্যন্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

- Barrow, John D., and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford: Oxford University Press, 1986).
- Burrows, Adam, "The Birth of Neutron Stars and Black Holes," Physics Today, 40 (1987): 28.
- Chapman, Clark R., and David Morrison, Cosmic Catastrophes (New York & London: Plenum Press, 1989).
- Close, Frank, End: Cosmic Catastrophe and the Fate of the Universe (New York: Simon & Schuster, 1988).
- Coleman, Sidney, and Frank De Luccia, "Gravitational Effects on and of Vacuum Decay," Physical Review D, 21 (1980): 3305.
- Davies, Paul, The Cosmic Blueprint (New York: Simon & Schuster, 1989), The Mind of God (New York: Simon & Schuster, 1991).
- Dyson, Freeman J., "Time without End: Physics and Biology in an Open Universe," Reviews of Modern Physics, 51 (1979): 447.
- Gold, Thomas, "The Arrow of Time," American Journal of Physics, 30 (1962): 403.
- Hawking, Stephen W., A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes (New York: Bantam, 1988).
- Hut, Piet, and Martin J. Rees, "How Stable Is Our Vacuum?" Nature, 302 (1983): 508.
- Islam, Jamal N., The Ultimate Fate of the Universe (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
- Linde, Andrei D., Particle Physics and Inflationary Cosmology (New York: Gordon & Breach, 1991).

- Luminet, Jean-Pierre, Black Holes (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
- Misner, Charles W., Kip S. Thorne, and John A. Wheeler, Gravitation (San Francisco: W. H. Freeman, 1970).
- Page, Don, and Randall McKee, “Eternity Matters,” Nature, 291 (1981): 44.
- Rees, Martin J. “The Collapse of the Universe: An Eschatological Study,” The Observatory, 89 (1969): 193.
- Smolin, Lee, “Did the Universe Evolve?” Classical and Quantum Gravity, 9 (1992): 173.
- Tipler, Frank J., The Physics of Immortality (New York: Doubleday, 1994).
- Tolman, Richard C., Relativity, Thermodynamics, and Cosmology (Oxford: Clarendon Press, 1934).
- Turner, Michael S., and Frank Wilczek, “Is Our Vacuum Metastable?” Nature, 298 (1982): 633.
- Waldrop, M. Mitchell, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos (New York: Simon & Schuster, 1992).
- Weinberg, Steven, The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe, updated ed. (New York: Basic Books, 1988).

পরিভাষা

অনেক সময় নিছক দুয়েকটি শব্দ বুঝতে না পারার কারণে কোনো বইয়ের মূল অংশই বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা দূর করতেই বইটিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা যোগ করা হয়েছে। পরিভাষাগুলোকে বাংলা একাডেমির নিয়ম মেনে বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

– অনুবাদক

অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertainty principle): কোনো কণিকার অবস্থান ও বেগ একইসাথে নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। এর একটি যত বেশি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা হবে, অপরটি সম্পর্কে পাওয়া তথ্য ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই নীতিটি হাইজেনবার্গের অবদান।

আকাশগঙ্গা (Milky Way): আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অংশ। পৃথিবী থেকে সর্পিল বাহুর এই ছায়াপথের অরায়ন বাহুটি গ্রীষ্মের রাতের আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বৃত্তচাপের মতো দেখা যায়।

অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া (Irreversible process): যে প্রক্রিয়া শুধু একদিকেই চলে, পেছন দিকে ফিরে আসে না। এর প্রয়োগ দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

আইন্সটাইন- রোজেন সেতু (Einstein-Rosen bridge): স্থান- কালের একটি সরু টিউব, যা দুটি ব্ল্যাক হোলকে যুক্ত করে। আরো দেখুন, ওয়ার্মহোল।

আলোকবর্ষ (l i g h t -y e a r): আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। (* মনে রাখতে এটি, আলোক-সেকেন্ড এবং এই জাতীয় এককগুলো সময়ের নয়, দূরত্বের একক)

আলোক-সেকেন্ড (L i g h t -s e c o n d): আলো এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

ইলেকট্রন (E l e c t r o n): নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুর্ণনরত নেগেটিভ বা ঋণাত্মক চার্জধারী কণিকা।

ইলেকট্রিক চার্জ বা তড়িৎ আধান (E l e c t r i c c h a r g e): কণিকার ধর্ম যার মাধ্যমে এটি বিপরীত চার্জধারী অন্য কণিকাকে আকর্ষণ করে এবং একই রকম চার্জধারী কণিকাকে বিকর্ষণ করে।

ওজোন (We i g h t): মহাকর্ষীয় (বা অভিকর্ষীয়) ক্ষেত্র দ্বারা কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল। এটি ভরের সমানুপাতিক কিন্তু সমান নয়। আমরা সাধারণত যাকে ওজোন বলি, সেটি আসলে ভর। ভরের সাথে অভিকর্ষীয় ত্বরণ গুণ করলে ওজোন পাওয়া যায়।

ওয়ার্মহোল (Wo r mh o l e): মহাবিশ্বের দূরবর্তী দুটি অঞ্চলের সংযোগ প্রদানকারী একটি পাতলা টিউব বা সুড়ঙ্গ। ওয়ার্মহোলের অপর প্রান্তে সমান্তরাল বা শিশু মহাবিশ্ব থাকতে পারে, যার মাধ্যমে সময় ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে।

কণা ত্বরকযন্ত্র (P a r t i c l e a c c e l e r a t o r): যে মেশিনের সাহায্যে ইলেকট্রোম্যাগনেট বা তড়িচ্চুম্বক ব্যবহার করে বেশি শক্তি দিয়ে দিয়ে গতিশীল চার্জধারী কণিকাদের বেগ বৃদ্ধি করা যায়।

কণা- তরঙ্গ দ্বৈততা (Wa v e -p a r t i c l e d u a l i t y): কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই নীতি যে, কণিকা ও তরঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো সময় কণিকা আচরণ করে তরঙ্গের মতো, আবার কখনো তরঙ্গ কণিকার মতো আচরণ করে।

কসমোলজি বা মহাবিশ্বতত্ত্ব (C o s mo l o g y): সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়ে যে শাস্ত্রে।

কোয়ান্টাম (Qu a n t u m): কোনো পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেওয়া বস্তুর সর্বনিম্ন পরিমাণ।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Qu a n t u m me c h a n i c s): প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি ও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে প্রস্তুত করা থিওরি।

কোয়ার্ক (Qu a r k): একটি চার্জধারী মৌলিক কণিকা, যা সবল নিউক্লিয়ার বল অনুভব করে। প্রোটন ও নিউট্রন দুটি কণিকাই তিনটি করে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত।

কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি (F r e q u e n c y): কোনো তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো চক্র বা কম্পন সম্পন্ন করে।

কৃষগহ্বর (Blackhole): স্থান-কালের এমন অঞ্চল যেখান থেকে কোনোকিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি আলোও না।

ক্ষেত্র (F i e l d): এমন কিছু যা স্থান- কালের উল্লেখযোগ্য অংশে বিস্তৃত । এটি কণিকার বিপরীত, যা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে শুধু একটি বিন্দুতেই অবস্থান করে।

গামা রশ্মি (Ga mma r a y s): খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা মৌলিক কণিকাদের সংঘর্ষের ফলে এটি উৎপন্ন হয়। আরো দেখুন, তেজস্ক্রিয়তা।

গ্যালাক্সি: দেখুন *ছায়াপথ*

ঘটনা (E v e n t): নির্দিষ্ট স্থান ও সময়বিশিষ্ট স্থান- কালের উপরস্থ কোনো বিন্দু।

ঘটনা দিগন্ত (E v e n t h o r i z o n): ব্ল্যাক হোলের সীমানা। ব্ল্যাক হোলের চারপাশের যে অঞ্চলের বাইরে আলো আসতে পারে না।

চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic field): চৌম্বক বলের জন্যে দায়ী ক্ষেত্র। তড়িৎ ক্ষেত্রের (electric field) সাথে সমন্বিত হয়ে এটি এখন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অংশ।

ছায়াপথ (Galaxy): মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ বহু নক্ষত্র, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধূলির ও ডার্ক ম্যাটারের সমাবেশ।

ডার্ক ম্যাটার (Dark matter): গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিপুঞ্জ ও এদের মাঝে অবস্থিত সেসব বস্তু যাদেরকে এখনো সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রভাবের কারণে এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের অন্তত ৯০ ভাগ ভরই ডার্ক ম্যাটার।

তড়িচ্চুম্বকীয় বল (Electromagnetic force): ইলেকট্রিক চার্জধারী কণিকাদের মধ্যে যে বল কাজ করে। চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে শক্তিতে দ্বিতীয়।

তত্ত্ব (Theory): তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারা ও ভবিষত্যে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অনুমান করতে পারা কোনো একটি মডেল।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength): কোনো তরঙ্গের পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চূড়া বা খাঁজের মধ্যে দূরত্ব। [চিত্র দেখুন]

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics): একটি আবদ্ধ সিস্টেমের এনট্রপি কখনও কমে না। এনট্রপি মানে শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা। যেমন, ফ্যান চালালে বিদ্যুৎ শক্তি ঘূর্ণশক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাপ শক্তি আকারে কিছু শক্তি অপচয় হয়, যেটাকে কাজে লাগানো যায় না। এভাবে প্রতিনিয়ত কিছু শক্তি অব্যবহারযোগ্য হয়ে যায়। সাধারণত এনট্রপি সবসময় বাড়ে। এনট্রপি পরিবর্তন হবে না যদি প্রক্রিয়া প্রত্যাগামী হয়। আরও দেখুন, *প্রত্যাগামী।*

তারামণ্ডলী (Constellation): আকাশের ৮৮ টি অঞ্চলের আলাদা আলাদা নাম। মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তুর আকাশের কোন দিকে অবস্থিত তা সহজে চেনার জন্য তারামণ্ডলী কাজে আসে। এমনিতে একই তারামণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র বা ছায়াপথরা বাস্তবে সাধারণত বহু দূরে দূরে থাকে। শুধু দেখতেই একই দিকে। কেউ দূরে, কেউ কাছে।

তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity): কিছু কিছু পরমাণু নিজেই নিজেই অন্য পরমাণুতে পরিণত হবার যে প্রক্রিয়া।

দশা (Phase): নির্দিষ্ট সময়ে কোনো তরঙ্গের অবস্থান। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে তরঙ্গের অবস্থান কি খাঁজে, চূড়ায় নাকি এই দুইয়ের মাঝে অন্য কোথাও আছে।

দুর্বল নিউক্লিয়ার বল (Weak force): চার প্রকার মৌলিক বলের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্বল বল। এটি মহাকর্ষের চেয়ে শক্তিশালী। এরও পাল্লা খুব ছোট। এটি যে কোনো বস্তু কণাকে আকর্ষণ করে, তবে বলবাহী কণিকাকে আকর্ষণ করে না। (*একে সংক্ষেপে বলা হয় দুর্বল বল।)

নক্ষত্র (Star): মহাকর্ষ বন্ধনে আবদ্ধ গোলাকৃতির প্লাজমা পদার্থ। গ্রহ নক্ষত্রের পার্থক্য হলো, বেশিরভাগ নক্ষত্রর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় জুড়ে ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো ও তাপ উৎপন্ন করে।

নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear fusion): যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস সংঘর্ষের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus): পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ। এতে সবল বলের মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত থাকে।

নিউট্রন (Neutron): অনেকটা প্রোটনের মতোই একটি কণিকা, তবে এতে কোনো চার্জ নেই। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অর্ধেক কণিকা এই নিউট্রন দিয়ে পূরণ হয়।

নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron star): সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে অনেক সময় যে শীতল অংশ বাকি থেকে যায়। এটি ঘটে যখন কোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রভাগের বস্তু গুটিয়ে নিউট্রনের ঘন ভরের বস্তুতে পরিণত হয়। (*এর মহাকর্ষ এতটা শক্তিশালী যে ইলেকট্রন ও প্রোটন এক হয়ে গিয়ে পুরোটা চার্জহীন নিউট্রনে পরিণত হয়।) আরো দেখুন, নিউট্রন।

নিউট্রিনো (Neutrino): একটি অসম্ভব হালকা কণিকা, যা শুধু মহাকর্ষ এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নিশ্চল ভর (Rest Mass): সিস্টেমের সার্বিক গতি থেকে স্বাধীন মোট ভরকে নিশ্চল ভর বলে। অন্য নাম: প্রকৃত (proper) ভর, অভ্যন্তরীণ (intrinsic) ভর।

ত্বরণ (Acceleration): যে হারে (সময়ের পরিবর্তনের সাথে) কোনো বস্তুর বেগ পরিবর্তন হয়।

দ্বৈততা (duality): আপাত দৃষ্টিতে আলাদা হলেও একই ফলাফল প্রদান করা দুটো থিওরির মধ্যে সম্পর্ক। আরো দেখুন, *কণা/তরঙ্গ দ্বৈততা।*

পজিট্রন (Positron): ইলেকট্রনের ধনাত্মক চার্জধারী প্রতিকণিকা। আরো দেখুনঃ *প্রতিকণিকা।*

পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute zero temperature): সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সেই তাপমাত্রা, যাতে বস্তুর কোনো তাপ শক্তি থাকে না। এর মান ০ কেলভিন বা -২৭৩.১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পরমাণু (Atom): সাধারণ বস্তুর মৌলিক একক। এতে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের (প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি) চারপাশে ইলেকট্রনরা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে।

প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম নীতি (Planck's quantum principle): আলো (বা অন্য যে কোনো প্রচলিত তরঙ্গ) শুধু বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টা আকারে নির্গত হয়, যার শক্তি এর কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। আরো দেখুনঃ *সমানুপাতিক* ও *ব্যস্তানুপাতিক*।

প্রতিকণিকা (Antiparticle): বস্তুর প্রতেকটি কণিকার বিপরীতে একটি প্রতিকণিকা আছে (যার চার্জ ছাড়া আর সব ধর্ম কণিকার মতোই। যেমন ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা পজিট্রন, যার চার্জ +১।)। কণিকা ও প্রতিকণিকার মধ্যে সংঘর্ষ হলে দুটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বিনিময়ে পাওয়া যায় শক্তি।

প্রতিসাম্য (Symmetry): একটি বিন্দু বা অবস্থানের সাপেক্ষে কোনো জিনিসকে দুই বিপরীত দিক থেকে দেখতে একই রকম দেখা গেলে তাকে প্রতিসম জিনিস বা ঘটনা বলে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, নবম অধ্যায়ের অনুবাদকের নোট।

প্রোটন (Proton): প্রায় নিউট্রনের মতোই একটি কণিকা। কিন্তু এর রয়েছে ধনাত্মক চার্জ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কণিকাদের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক এরা।

ফোটন (Photon): আলোর একটি কোয়ান্টাম। আরো দেখুন *কোয়ান্টাম*।

ফিউশন: দেখুন *নিউক্লিয়ার ফিউশন*

বর্ণালী (Spectrum): একটি তরঙ্গের উপাদান কম্পাঙ্কগুলো। সৌরবর্ণালীর দৃশ্যমান অংশ রংধনুতে দেখা যায়। আমরা খালি চোখে যে আলো দেখি এর বাইরেও নানান আলো আছে জগতে। সবগুলো আলোকে একসাথে বলা হয় বর্ণালী।

বিগ ব্যাং (Big bang): মহাবিশ্বের শুরুতে যে সিঙ্গুলারিটি ছিল। আরো দেখুন, *সিঙ্গুলারিটি।*

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Special relativity): মহাকর্ষের অনুপস্থিতিতে যে কোনো বেগে গতিশীল সকল পর্যেবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে- এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। কাল দীর্ঘায়ন, দৈর্ঘ সঙ্কোচন, ভর-শক্তি সমতুল্যতা ইত্যাদি এই থিওরির ফসল। আরো দেখুন, *সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব*।

ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional): X, Y এর ব্যস্তানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে Y কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে X কে সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হচ্ছে। অর্থ্যাৎ, Y যত গুণ বাড়বে, X তত গুণ কমে যাবে। যেমন Y দ্বিগুণ হলে X হয়ে যাবে অর্ধেক। Y তিন গুণ হলে X হবে তিন ভাগের এক ভাগ। তবে যদি বলা হয় X, Y এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক,

তাহলে Y দ্বিগুণ হলে X হবে চার ভাগের এক ভাগ। আরো দেখুন, *সমানুপাতিক*।

ব্ল্যাক হোল (Black hole): দেখুন *কৃষ্ণগহ্বর*।

ভর (Mass): কোনো বস্তুতে উপস্থিত পদার্থের পরিমাণ; বস্তুর জড়তা বা ত্বরণের প্রতি বাধা।

ভার্চুয়াল কণিকা (Virtual particle): যে কণবিকাদেরকে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পরিমাপযোগ্য প্রতিক্রিয়া থাকে। এরা খুব ক্ষণস্থায়ী। অনিশ্চয়তা নীতির মাধ্যমে তৈরি হয় ও আবার দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়।

মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant): স্থান- কালের সহজাত ধর্মই হচ্ছে প্রসারিত হওয়া- এমন ব্যাখ্যা দেবার জন্যে আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত গাণিতিক ধ্রুবক। পরে দেখা গিয়েছিল এই ধ্রুবক আনা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন আবার এর প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (Microwave background radiation): আদি উত্তপ্ত মহাবিশ্ব থেকে নির্গত বিকিরণ। বর্তমানে এর এত বেশি লাল সরণ হয়েছে যে একে আর আলো হিসেবে দেখা যায় না, পাওয়া যায় মাইক্রোওয়েভ হিসেবে। মাইক্রোওয়েভ হল কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। আরো দেখুন, লাল সরণ।

মিল্কিওয়ে: দেখুন *আকাশগঙ্গা*।

মৌলিক কণিকা (Elementary particle): এমন কণিকা যাকে আর ভাঙা যায় না বলে বিশ্বাস করা হয়।

রেডার (Radar): বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র। যন্ত্র থেকে প্রেরিত সঙ্কেত বস্তুতে পৌঁছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা কাজে লাগিয়ে দূরত্ব বের করা হয়।

লাল বা লোহিত সরণ (Red shift): ডপলার ক্রিয়ার কারণে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নক্ষত্রের আলোকে লাল দেখা।

সবল নিউক্লিয়ার বল (Strong force): চার প্রকারের মৌলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বল। তবে এর পাল্লা সবচেয়ে ছোট। মানে এর প্রভাব বেশি দূর পর্যন্ত কাজ করে না। এটি কোয়ার্কদেরকে যুক্ত করে প্রোটন ও নিউট্রন এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে যুক্ত করে পরমাণু গঠন করে। সংক্ষেপে সবল বলও বলা হয়।

সমানুপাতিক (Proportional): X, Y এর সমানুপাতিক হলে এর অর্থ হচ্ছে Y কে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে X কেও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হবে। এর অর্থ হবে Y যে হারে বাড়বে X ও সেই হারে বাড়বে। তবে যদি বলা হয় X, Y এর বর্গের সমানুপাতিক, তবে Y দ্বিগুণ হলে X চার গুণ হবে; Y তিন গুণ হলে X নয় গুণ হবে ইত্যাদি।) আরো দেখুন, *ব্যস্তানুপাতিক*।

সাধারণ বা সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (General relativity): যে কোনো গতিতে চলা পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই হবে- এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি আইনস্টাইনের থিওরি। এই থিওরি মহাকর্ষকে চতুর্মাত্রিক স্থান- কালের সাহায্যে প্রকাশ করে। বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বকে এই তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়।

স্থান- কাল (Space-time): চতুর্মাত্রিক স্থান, যার বিন্দুগুলোকে ঘটনা বলা হয়।

সিঙ্গুলারিটি (Singularity): স্থান- কালের এমন বিন্দু যেখানে স্থান- কালের বক্রতা (অথবা অন্য কোনো বস্তুগত রাশি) অসীম হয়।

স্ট্রিং থিওরি (String theory): পদার্থবিদ্যার সেই থিওরি যাতে বিভিন্ন কণিকাকে স্ট্রিং (সুতা, দড়ি ইত্যাদি) এর কম্পন মনে করা হয়। স্ট্রিং এর শুধু দৈর্ঘ্য আছে, অন্য কোনো মাত্রা (উচ্চতা বা প্রস্থ) নেই।

সিমুলেশন (simulation): বাস্তবে করা অসম্ভব বা কঠিন এমন ক্ষেত্রে বিশেষত কম্পিউটারে সাহায্যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার নাম

সিমুলেশন। বিস্তারিত দেখুন পঞ্চম অধ্যায়ের নোটে।

পরিশিষ্ট-ক (অনুবাদক)

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি

গত শতকে আমরা জানতে পারি, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট অতীত আছে। তার আগে স্থির অবস্থা তত্ত্ব জনপ্রিয় ছিল। ধারণা করা হত, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে উপস্থিত আছে। বয়স অনন্ত হলে ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কবির কথা, "জন্মিলে মরিতে হবে।" তাই ভবিষ্যতে কী হবে সেটা বড় এক প্রশ্ন।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৫০। এই বিশ বছর ধরে বিজ্ঞানী এডউইন হাবলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা গেল, ছায়াপথরা একে অপর থেকে দূরে সরছে। এ থেকেই তৈরি হয় বিগ ব্যাং তত্ত্ব। ১৯২৭ সালে জর্জ লেমেইত্র বলেন, প্রসারণশীল মহাবিশ্ব থেকে বলা যায়, অতীতে মহাবিশ্ব ছিল নিবিড় এক বিন্দুর মতো। এর আগে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধান করে আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানও একই কথা বলেছিলেন। আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান অনুসারে দেখা যায়, একটি প্রাথমিক সিংগুলারিটি থেকে জন্ম মহাবিশ্বের। ১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয় মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ। বিগ ব্যাং এর পক্ষে একটি বড় প্রমাণ একটি।

১৯৯৮ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়ছে। এর জন্য দায়ী শক্তিকে নাম দেওয়া হয় ডার্ক এনার্জি। আইনস্টাইনের সমীকরণ বলছিল, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বিশ্বাস করতেন না। সমীকরণ অসম্পূর্ণ মনে করে তিনি তাই বাড়তি একটি ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। পরে স্বীকার করেন, এটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু এখন আবার মনে হচ্ছে এই ধ্রুবক দরকার আছে। এই ধ্রুবক আসলে ডার্ক এনার্জির বিপরীতে কাজ করে।

ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে মোটা দাগে বললে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে। হয় এটি চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। মহাকর্ষ প্রসারণের গতি কমানোর চেষ্টা করবে। তবে ডার্ক এনার্জির কারণে প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়বে। আরেকটি হতে পারে, মহাবিশ্বের প্রসারণ এক সময় থেমে যাবে। শুরু হবে সঙ্কোচন। আরেকটি সম্ভাবনা হলো, প্রসারণ চলতে থাকবে। তবে প্রসারণের গতি ক্রমশ কমতে থাকবে। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না।

ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী ঘটবে তার বড় একটি প্রভাবক হলো মহাবিশ্বের ঘনত্ব পরামিতি (density parameter)। একে গ্রিক বর্ণ ওমেগা (Ω) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মান পেতে মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বকে ঘনত্বের একটি ক্রান্তি মান দ্বারা ভাগ করা হয়। ঘনত্বের যে মান খুব অল্পের জন্য মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামাতে বন্ধ হবে তার নাম ক্রান্তি (critical) ঘনত্ব।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের সাথে এর আকৃতিরও সম্পর্ক আছে। ওমেগার মান ১-এর বেশি হলে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে আবদ্ধ গোলকের পৃষ্ঠের মতো। কারণ এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের চেয়ে বেশি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো এমন মহাবিশ্বের ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির বেশি হবে। তবে বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে উপবৃত্তের মতো। মহাকর্ষের প্রভাবে এক সময় প্রসারণ থেমে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে বিগ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) বা মহাসঙ্কোচন। বিন্দু থেকে আসা মহাবিশ্ব বিন্দুতে গিয়েই আবার মিশে যাবে।

তবে কিছু কিছু আধুনিক তত্ত্ব বলছে, ওমেগার মান ১-এর বেশি হলেও ডার্ক এনার্জির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। এ কারণে মহাসঙ্কোচন ঘটার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কম। তবে ঘটবেই না সেটা বলার জো নেই।

ওমেগার মান ১-এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির কম হবে। মহাকর্ষ প্রসারণকে কিছুটা কমাবে। কিন্তু ডার্ক এনার্জির প্রভাবে সে বাধা উপেক্ষা করে প্রসারণের গতি বরং আরও বেড়ে যেতে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় মহাকর্ষ, তড়িচ্চুমকত্ব ও সবল নিউক্লীয় বলের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় বিগ রিপ (Big Rip) বা মহাভাঙন।

একই রকম পরিস্থিতিতে আরেকটি সম্ভাব্য পরিণতির নাম বিগ ফ্রিজ (Big Freeze) বা মহাহিমায়ন। এ অবস্থায় সর্বত্র বিরাজ করবে হিমশীতল অবস্থা। হবে না কোনোরকম তাপ বিনিময়। থেমে যাব বস্তুকণার চলাচল। এ কারণে এর অপর নাম তাপীর মৃত্যু। এটা ঘটে গেলে

বস্তুর মধ্যে আর কোনো প্রকার তাপ বিনিময় সম্ভব হবে না। সব যন্ত্র অচল হয়ে যাবে। এনট্রপি (শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা) হবে সর্বোচ্চ।

তবে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের সমানও হয়ে যেতে পারে। সত্যি বলতে, বর্তমান পর্যবেক্ষণ এর পক্ষেই কথা বলছে। এমন মহাবিশ্বেই ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি হয়। এক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হবে সমতল। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্ব এমনই। এই ফলাফলের ত্রুটির মাত্রা মাত্র ০.৪%। এই মহাবিশ্বও চিরকাল প্রসারিত হবে, তবে প্রসারণের হার ক্রমশ কমবে। তবে কখনোই একেবারে থেমে যাবে না। তবে ডার্ক এনার্জি ভূমিকা রাখলে প্রসারণ শুরুতে থামলেও আবার বেড়ে যাবে। পরিণতি হবে সেই উন্মুক্ত মহাবিশ্বের মতোই।

আরও কিছু কমসম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে মহজাবিশ্বের ভাগ্যে। এর একটি হলো বিগ বাউন্স। এটা আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে চক্রাকার মডেলের একটি অংশ। এটি অনুসারে, মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল সঙ্কুচিত অবস্থা থেকে। আর সেই সঙ্কুচিত অবস্থাটা এসেছিল তার পূর্ববর্তী একটি প্রসারণ থেমে গিয়ে গুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এভাবেই মহাবিশ্ব একের পর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। একের পর ঘটছে বিগ ব্যাং ও বিগ ক্রাঞ্চ। এ জন্যেই এই মডেলের নাম চক্রাকার মডেল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন আরও একটি সম্ভাবনার কথা। এর নাম বিগ স্লার্প (Big Slurp)। স্লার্প অর্থ গ্রাস করা বা গ্রাস করার সময় সৃষ্ট শব্দ। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব এখন নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। যেকোনো সময় চলে যেতে পারে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে। প্রকৃতির যেকোনো ভৌত প্রক্রিয়া সবসময় সর্বিনিম্নের শক্তির অবস্থানে থাকতে চায়। আর মহাবিশ্ব সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকলেই কেবল প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে থাকবে। এখন সেটা নাও হতে পারে। হয়ত মহাবিশ্ব এখন উচ্চতর শক্তির অবস্থানে আছে। তার মানে আছে নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায়। সেক্ষেত্রে যেকোনো সময় এটি আসল ভ্যাকুয়ামে চলে যাবে। তার সাথে সাথে আমূল পাল্টে যাবে আমাদের চিরচেনা মহাবিশ্ব। ভৌত ধ্রুবকদের মান বদলে যেতে পারে। পাল্টে যেতে পারে আলোর বেগের মান কিংবা অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবক। ফলে স্থান, কাল, বস্তু ও শক্তির ধারণা একদম বদলে যেতে পারে। হয়ত আগাম কোনো সঙ্কেত না দিয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে মহাবিশ্ব।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এগারশ ও তৃতীয় অধ্যায়ে।

পরিশিষ্ট-খ (অনুবাদক)

বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে?

বিজ্ঞান কী, কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আমাদের সমাজের খুব কম মানুষেরই ধারণা আছে বলে মনে হয়। বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্কের কারণও সম্ভবত এটাই। বিজ্ঞান কী ও কীভাবে কাজ করে এ বিষয়ে অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে স্টিফেন হকিং যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এই বইয়ের অনুবাদক অনুবাদ করেছেন সে বইটিও। এখানে তার আলোকেই সংক্ষেপে বলছি।

বিজ্ঞান মূলত অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাবেশ। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো একটি মডেল, যা পর্যবেক্ষণে পাওয়া ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সেটা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অনুমান বা পূর্বাভাস দিতে পারবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কখনোই সঠিক বলা যায় না। তত্ত্বের পূর্বাভাস পরিবর্তী পর্যবেক্ষণের সাথে হাজারবার মিলেও গেলেও আপনি বলতে পারবেন না তত্ত্বটা সঠিক বা নিঁখুত। হতে পারে, পরেরবারই পূর্বাভাস ভুল হয়ে যাবে।

পরিসংখ্যানবিদ জর্জ বক্সের কথাটি তাই যথার্থ, “সব মডেলই ভুল, তবে কিছু মডেল কার্যকর।“

পরিসংখ্যানের ছাত্র ও শিক্ষক হওয়ার সুবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কটা আরেকটু গভীর আমার। পরিসংখ্যানে আমরা ডেটা বা উপাত্ত নিয়ে কাজ করি। তারপর সেটা থেকে সবচেয়ে ভাল ভাল মডেল দিয়ে প্রেডিকশন বা পূর্বানুমান করি। যে মডেল সবচেয়ে ভালোভাবে পূর্বানুমান দিতে পার, সেটা নিয়ে আরও কাজ করি। জর্জ বক্সের কথা অনুসারেই, কোনো মডেলই বাস্তব জগতকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যতটুকু পারে সেটা বাস্তব কাজকর্মের জন্যে যথেষ্ট। কার্যকর।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোও পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এভাবেই কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের কথা। অনেক সুন্দর তত্ত্ব। কিন্তু আমরা জানি, এটা আসলে একটি ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব। বুধ গ্রহের কক্ষপথের সঠিক ব্যাখ্যা তত্ত্বটি দিতে পারেনি। যেটা পেরেছে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব। কিন্তু আমরা আরও জানি, নিউটনের তত্ত্ব ভুল হলেও কার্যকর। এই তত্ত্ব দিয়েই মহাকাশে যান পাঠানো হয়। যদিও বড় ভরের বস্তুর ক্ষেত্রে তত্ত্বটি ভুল ফল দেয়। নিউটনের গতিবিদ্যাও সব রকম গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ব্যর্থ অতিপারমাণবিক জগতের কণার গতির ব্যখ্যা দিতে। বা আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে চলার বস্তুর গতির সঠিক বিবরণ দিতে। চিরায়ত গতিবিদ্যা কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। পারে না আলোকতড়িৎ ক্রিয়া কিংবা হাইড্রোজেনের মতো সরল পরমাণুর ব্যাখ্যা দিতে।

নিউটনের তত্ত্বের বদলে আসা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষ তত্ত্বও কি নিখুঁত? বিজ্ঞানীরা এখনই জানেন, তত্ত্বটায় ভুল আছে। যদিও ২০১৫ সালের মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের মাধ্যমে তত্ত্বটি নিজের শক্তির জানান দিয়েছে। কিন্তু ঐ যে একই কথা। তত্ত্বটা কার্যকর। কিন্তু সঠিক দাবি করা যাবে না।

আকাশে গ্রহদের এলোমেলো চলাচল দেখে প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি বলেছিলেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র। সবাই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ঘুরছে গ্রহরাও পৃথিবীর চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে। তবে গ্রহরা আবার নিজের কক্ষপথের মধ্যেই আরেকটি ছোট বৃত্তাকার কক্ষপথেও ঘুরছে। এর মাধ্যমে গ্রহদের এলোমেলো চলাচলের দারুণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তত্ত্বটি দারুণ প্রশংসা কুড়াল। কিন্তু তত্ত্বটি অনুসারে চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব মাঝেমাঝে অর্ধেক সাধারণ দূরত্বের অর্ধেক হয়ে যাওয়ার কথা। যা ভুল। এভাবে ভাল এই তত্ত্বও ভুল প্রমাণিত হয়।

চিত্র: টলেমির মডেল

[টলেমির মডেলে পৃথিবীর অবস্থান ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে, এবং একে ঘিরে রাখা আটটি গোলক মহাকাশের সবগুলো বস্তুকে ধারণ করে রেখেছিল।]

এক কথায়, কোনো তত্ত্বই সঠিক নয়। নিছক কার্যকর। কাজে লাগিয়ে দারুণ কিছু কাজ করা যায় এই যা।

তাই বিজ্ঞান বা কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায় না, আমি একে সত্য বলে মানছি। আবার এটাও বলা যায় না যে একে আমি পরিত্যাগ করব। বরং যতদিন কাজে লাগে ব্যবহার করব। তাই ধর্ম ও কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটাকে আরেকটার বিপক্ষে ব্যবহার করার চর্চা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আরও দরকার সহনশীলতার চর্চা। জিনিসটার অনেক অভাব বর্তমান সময়ে।

ফ্ল্যাপ

লেখক পরিচিতি

পল ডেভিস

ইংরেজ পদার্থবিদ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। যুক্ত আছেন ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যাপম্যান ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম স্টাডিজ প্রতিষ্ঠানের সাথেও। এর আগে অন্যান্যের মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনেও অধ্যাপনা করেছেন। গবেষণার বিষয় কসমোলজি (মহাবিশ্বতত্ত্ব), কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব ও অ্যাস্ট্রোবায়োলজি।

তিনিই প্রথম যৌথ একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, হকিং বিকিরণের মাধ্যমে ব্ল্যাক হোল বাষ্পীভূত হওয়ার জন্যে আশেপাশের এলাকা থেকে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঋণাত্মক শক্তির প্রবেশ দায়ী। এছাড়াও দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সময় নিয়ে।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে তাঁর অবদান অসামান্য। অনেকগুলো টেকনিকেল ও জনপ্রিয় বইয়ের লেখক তিনি। টেকনিকেল বইয়ের মধ্যে অন্যতম *দ্য ফিজিক্স অব টাইম অ্যাসিমেট্রি* (১৯৭৪)। এছাড়াও লিখেছেন জনপ্রিয় বই *দ্য এজ অব ইনফিনিটি*, *দ্য রানওয়ে ইউনিভার্স*, *দ্য কসমিক ব্লুপ্রিন্ট*, *অ্যাবাউট টাইম: আইনস্টাইন'স আনফিনিশড বিজনেস*, *কোয়ান্টাম অ্যাসপেক্টস অব লাইফ* ইত্যাদি।

ভূষিত হয়েছেন অনেকগুলো পুরস্কারে। যার মধ্যে অন্যতম ইউরেকা প্রাইজ, কেলভিন পদক, ফ্যারাডে প্রাইজ ও টেম্পেলটন প্রাইজ।

অনুবাদক পরিচিতি

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ।

পাবনা ক্যাডেট কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। এর আগে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড অ্যাডভাইজরস লিমিটেড (EAL) প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

লেখালেখির সূচনা গণিত ম্যাগাজিন পাই জিরো টু ইনফিনিটির মাধ্যমে। কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেছেন প্রথম আলো পরিবারের মাসিক বিজ্ঞান ম্যাগাজিন *বিজ্ঞানচিন্তায়*। *কিশোরআলো*, *ব্যাপন*সহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখছেন গণিত, পরিসংখ্যান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে অনলাইনেও সক্রিয়ভাবে লেখালেখি করছেন।

বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ ও সহজে উপস্থাপন করার জন্যে তৈরি করেছেন অনলাইন পোর্টাল বিশ্ব ডট কম (sky.bishwo.com)। একই উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স নিয়ে তৈরি করেছেন Stat Mania (www.*statmania.info*)।

প্রিয় শখ: নতুন কিছু শেখা (বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান), প্রোগ্রামিং, ভ্রমণ ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ।

পৈত্রিক নিবাস: লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ঝাউডগী গ্রাম।

লেখকের অন্য বই

- *অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম (২০১৭)* (অনুবাদ, মূল স্টিফেক হকিং ও লিওনার্দ ম্লোডিনো)
- *মহাবিশ্বের সীমানা (২০১৯)*
- *অসীম সমীকরণ (২০১৯)*

ইমেইল: almahmud.sbi@gmail.com

ওয়েবসাইট: mahmud.bishwo.com

ফেসবুক: fb.com/mahmud.sbi

ছবি: সালমা সিদ্দিকা